মুসলিম স্পেনের আরবী সাহিত্য: প্রকরণ ও শৈলী

(Arabic Literature in Muslim Spain: Subjects and Styles)

(এম.ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ)

গবেষক

খোন্দকার নূরুল একা উম্মে হানী

এম.ফিল গবেষক

রেজি নং-৪, শিক্ষাবর্ষ- ২০১৪-১৫

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড.মুহা: মিজানুর রহমান

সহযোগী অধ্যাপক

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মে, ২০১৯

(Arabic Literature in Muslim Spain: Subjects and Styles)

মুসলিম স্পেনের আরবী সাহিত্য: প্রকরণ ও শৈলী

(Thesis submitted for the award of the Degree of Master of Philosophy)

By
Khondakar Nurul Eka Ummay Hany
Researcher
Reg. No- 4, Session- 2014-15
Department of Arabic
University of Dhaka

Supervisor
Dr. Md. Mizanur Rahman
Associate Professor
Department of Arabic
University of Dhaka

May, 2019

ভূমিকাঃ

দক্ষিণ- পশ্চিম ইউরোপের আইবেরীয় দ্বীপে অবস্থিত অন্যতম আলোচিত দেশ স্পেন। দেশটি ৭১২-১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পরিচিত ছিল মুসলিম স্পেন বা আনদালুস নামে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে এখানে আইবেরীয় জাতির লোকেরা বাস করত। পর্যায়ক্রমে এখানে ফিনিশীয়রা এসে বসতি স্থাপন করে এবং একে স্পান নামে নাম করণ করে। ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে তারিক বিন যিয়াদ কর্তৃক রডারিককে পরাজিত করার মাধ্যমে সেখানে ইসলামের আগমন ঘটে। মুসলমানরা তখন এর নামকরণ করে " আল আনদালুস"। আলমেরিয়া, মালাগা, সেভিল, হালব, কর্ডোভা, জায়েন ও গ্রানাডা নিয়ে ছিল আনদালুস তথা মুসলিম স্পেনের বিস্তৃতি। মুসলিম স্পেন উত্তরে খ্রিষ্টান সাম্রাজ্য গ্যালিসিয়া, ক্যাস্টিল এবং পাম্পলোনা, দক্ষিণ ও পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর ও পূর্বে বলেয়ারিকস দ্বীপ দ্বারা বেষ্টিত ছিল।

স্পেনে ইসলামের আগমন ছিল ইউরোপের জন্যে আশীর্বাদ স্বরূপ। সেখানে ইসলামের আগমনে এক সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। স্পেনীয়রা আরবদের সংস্কৃতি, ধর্ম, ভাষা ও সাহিত্য গ্রহণ করে। এর ফলে তাদের ধর্ম ও সাহিত্য- সংস্কৃতিতে এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়।

প্রাচীনকাল থেকেই আরবী সাহিত্য পৃথিবীর অন্যতম সাহিত্য। ভাষা, মাধুর্য, অলংকার সকল দিক থেকেই এর স্থান ছিল সর্বাগ্রে। তখন সাহিত্য চর্চা বলতে কাব্য চর্চাকেই বুঝানো হতো। আরবদের জীবনের বিভিন্ন দিকই ছিল কবিতার বিষয়বস্তু। ইসলাম আগমনের পরও আরবদের কাব্য চর্চা অব্যাহত থাকে। সাথে যুক্ত হয় ইসলামী সাহিত্য চর্চা।

স্পেনে আরব মুসলমানদের মাধ্যমে ইসলামের আগমনের সাথে সাথে তাদের সাহিত্য- সংস্কৃতিরও অনুপ্রবেশ ঘটে।অনগ্রসর তমসাচ্ছন্ন স্পেনের উন্নয়নে আরবরা অতুলনীয় অবদান রাখেন। সাহিত্য, শিল্প, জ্ঞান- বিজ্ঞানের চর্চা, বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থাপনা নির্মাণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য।

মুসলিম স্পেনে আরবদের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল সাহিত্য ক্ষেত্রে। স্পেনীয়রা একদিকে যেমন আরবদের সাহিত্য রেঁনেসার দিকে ঝুঁকেছিল অন্যদিকে আরব কবিরাও সেখানে কবিতা চর্চার জন্যে যথেষ্ট উপকরণ পেয়েছিল। সাহিত্যের গতানুগতিক দুই ধারা তথা গদ্য ও পদ্যের চর্চাই সেখানে বিদ্যমান ছিল। স্পেনের গদ্য সাহিত্যের যাত্রা আরবদের গদ্য সাহিত্যের ধারাতেই শুরু হয়। মুসলিম স্পেনে মূলত দুই ধরণের গদ্য সাহিত্য বিদ্যমান ছিল। একটি ছিল বিশুদ্ধ আরবী গদ্য সাহিত্য। বক্তৃতা, বিতর্ক, পত্র লিখন এবং মাকামা ছিল এ ধরণের গদ্যের মূল বিষয়। আরেকটি ছিল সাধারণ আরবী গদ্য। এর বিষয়বস্তু ছিল ব্যকরণ, অভিধান, অনুবাদ, তাফসীর, হাদিস, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি। তবে স্পেনীয় আরবী সাহিত্যের

Dhaka University Institutional Repository

সিংহভাগ জায়গা দখল করে ছিল কবিতা। প্রশংসা, প্রণয়, বর্ণনা, নিন্দা, শোকগাঁথা, বীরত্বগাঁথা ইত্যাদি বিষয়ে কবিতা রচনা করা হতো । আনদালুসে মুওয়াশশাহাত নামে এক বিশেষ ধরণের আরবী গীতিকবিতার উদ্ভব হয়।

স্পেনের আমীর- ওমরাহ থেকে শুরু করে সবাই কম বেশি কবিতার অনুরাগী ছিলেন। যাদের হাতে স্পেনীয় কবিতা পূর্ণতা লাভ করে তাদের মধ্যে ইবনু আবদি রাব্বিহ, ইবন যায়দুন, ইবন হানী, মু'তামাদ ইবন আব্বাদ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। উক্ত সময়ে বেশ কিছু মহিলা কবিও জনপ্রিয়তা লাভ করেন। তন্মধ্যে ওয়াল্লাদা, হাফসা রুকুনিয়া, আল জারিয়া আল আজফা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

স্পেনীয় আরবী সাহিত্য সমগ্র ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়েছে। ইউরোপ তার সাহিত্য-সংস্কৃতি সহ সকল ক্ষেত্রেই আরবদের অনুকরণ ও তাদের থেকে গ্রহণ করেছে। আরবদের হাতেই মূলত ইউরোপের সর্বাত্মক রেনেঁসার সূচনা হয়েছে। যার ফলে এক কালে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইউরোপ পরিণত হয়েছে বর্তমান ইউরোপে।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভটিতে মুসলিম স্পেনের আরবী সাহিত্যের সামগ্রিক অবস্থার উপরে আলোকপাত করা হয়েছে। এটি মোট ছয়টি অধ্যায়ে পেশ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে মুসলিম স্পেনের নামকরণ, ভৌগলিক অবস্থান, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের উপরে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে মুসলিম স্পেনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, আরবী গদ্য ও পদ্য সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, আনদালুসীয় সাহিত্যে আল কুরআনের প্রভাব, ইউরোপীয় সাহিত্যে আরবী সাহিত্যের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আনদালুসীয় আরবী গদ্যের বিভিন্ন প্রকরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে আনদালুসীয় আরবী কবিতার বিভিন্ন প্রকরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে আনদালুসীয় সাহিত্যের গদ্য ও পদ্যের গঠন শৈলী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আনদালুসের আরবী কবি সাহিত্যিকের জীবনী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উপসংহারে গবেষণার সার নির্যাস সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করা হয়েছে।
আলোচ্য অভিসন্দর্ভে গবেষণার স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এতে উপস্থাপিত সমস্ত তথ্য মৌলিক ও প্রামাণ্য গ্রন্থ, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যান্য গবেষকের অভিসন্দর্ভ, বিভিন্ন জার্নাল ও ইন্টারনেটের বিভিন্ন প্রামাণ্য উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যগুলো প্রামাণ্য উৎস থেকে যাচাই বাছাই করা হয়েছে।

এতদসত্ত্বেও গবেষণার কাজে প্রাসঙ্গিক সীমাবদ্ধতা ছাড়াও প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদির অপ্রতুলতা ও সকল বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্যের অভাব গবেষণা কাজে আমার জন্যে একটি অন্তরায় ছিল। এছাড়া পরিধির ব্যাপকতার দরুণ **"মুসলিম স্পেনের আরবী সাহিত্যঃ প্রকরণ ও শৈলী"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভে সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য সংযোজন করা সম্ভব হয়নি। তথাপি আলোচ্য অভিসন্দর্ভটি বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে উপস্থাপন করার জন্যে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মাধ্যমে যে ধারার সূচনা হয়েছে তা পরবর্তী যোগ্য গবেষকদের মাধ্যমে আরো প্রসারিত হবে আশা করি।

মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন। আমীন।

গবেষক
খোন্দকার নূরুল একা উম্মে হানী

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

স্পেন ও মুসলিম স্পেন

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

নামকরণ

রোমান শব্দ "হিসপানিয়া" থেকে স্পেনের নামকরণ করা হয়।Renaissance scholar Antonio de Nebrija এর ভাষ্যমতে রোমান শব্দ হিসপানিয়া আইবেরীয় শব্দ হিসপালিস (Hispalis) থেকে উৎপন্ন যার অর্থ " পশ্চিমা বিশ্বের শহর"।

জেসুস লুইস cunchillos এর মতে, স্পেন শব্দটি ফিনিশীয় শব্দ স্পান থেকে আগত যার অর্থ গুপ্তচর বা লুকায়িত বস্তু। আরেক ভাষ্যমতে বাস্ক (Basque) শব্দ Ezpanna থেকে উৎপত্তি যার অর্থ কিনারা বা প্রান্ত। কারণ আইবেরীয় উপদ্বীপ ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত।[১] আবার প্রাচীন ইতিহাসবিদগণ বলে থাকেন, রোমানরা যখন এই এলাকা শাসন করে তখন তাদের রাজা ছিল ইসবান ইবনু ত্বাইত্বাস। তার নামেই এই এলাকাকে স্পেন নামে নামকরণ করা হয়।[২]

স্পেনকে বিশেষত আল-আনদালুস নমে অভিহিত করা হয়। তবে ইসলামী ও আরবী পরিভাষায় একে মুসলিম স্পেন ও বলা হয়। আনদালুস শব্দটি বার্বার ভাষার "ওয়ানদাল" শব্দ থেকে "ভানদালুসিয়া" তে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে।[৩]

কারো কারো মতে, আনদালুস স্পেনের দক্ষিণে অবস্থিত একটি দেশ, ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে আরবরা এই এলাকা বিজয় করার পরে এই নামে নামকরণ করে। এর প্রধান শহরগুলো ছিল গ্রানাডা, সেভিল, কর্ডোভা, আলমেরিয়া, মালাগা ইত্যাদি।[৪] আবার বলা হয়, আল-আনদালুস শব্দটি ইসকানদানাভিয়ার উত্তর থেকে আগত "ওয়ানদাল" বা "ভানদাল" নামক এক জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত। কেউ কেউ বলেন, এই গোষ্ঠীটি জার্মানী থেকে আগত ছিল।

এই গোষ্ঠীর নামানুসারে এই দেশের নাম "ভানদালিসিয়া(فاندالیسیا)" নামে নামকরণ করা হয়। কালের বিবর্তনে আনদুলিসিয়া নামে পরিবর্তিত হয়ে পরে আনদালুস এ রূপ নেয়।[৫]

---

[১] www.wikipedia.com

[২] আল মাক্বার্‌রী : *নাফহুত ত্বীব মিন গুসনিল আনদালুস আর রতীব*, (বৈরুত: দারু সাদির, ১৯৬৪) ১ম খন্ড, পৃ. ৬৮

[৩] *ক্বামূসুল মা'আনী* ; মা'না ইসমিল আনদালুস ফী ক্বামূসিল মাআনীল আসমা

[৪] *ক্বামূসুল মা'আনী*; মা'নাল আনদালুস ফী মু'জামিল মাআনীল জামি'

[৫] দুযী, রাইনহার্ট (অনুবাদ: হাসান হাবশী), *আল মুসলিমুনা ফী আসবানিয়া* (কায়রো: আল হাইআতুল মিসরিয়্যাতুল 'আম্মাতু লিল কিতাব, ১৯৯৪), ১ম খন্ড, পৃ. ৩৪

তবে মুসলমানদের আগমনের পূর্বে স্পেন আল-আনদালুস নামে পরিচিত ছিল না। প্রাচীনকালে এ এলাকাটি আইবেরিয়া নামে পরিচিত ছিল। এখানে আইবেরীয়রা বসবাস করত। তাদের সাথে সম্পৃক্ততা থাকার কারণেই অত্র এলাকাকে এ নামে নামকরণ করা হয়েছিল।[৬]

রোমানরা যখন এই এলাকার শাসনক্ষমতায় বসে তখন তারা স্পেন (Hespania) নামে নামকরণ করে। এ নামটি মূলত ফিনিশীয় ভাবধারার শব্দ i-schephan-im থেকে আগত যার অর্থ: খরগোশের উপকুল। বলা হয়ে থাকে, ফিনিশীয়রা আইবেরীয় উপকুলে অনেক খরগোশের দেখা পেয়েছিল তাই এ নামে নামকরণ করে।[৭]

রোমান সাম্রাজ্যের অধীনস্থ থাকাকালীন সময়ে স্পেনের দক্ষিণাংশ Betika নামে পরিচিত ছিল। এরপর "ওয়ানদাল" নামক গোষ্ঠীর আগমনের পরে উক্ত স্থানের নাম হয় ভানদালিসিয়া। এরপর যখন মুসলমানরা আগমন করেন তখন সমগ্র এলাকাকে আল-আনদালুস নামে নামকরণ করেন। আর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মত হলো, তারা এই নামটি উত্তর ইউরোপের "ওয়ানদালুস" নামক জনগোষ্ঠীর নামে নামকরণ করেছেন।[৮] এরপর নামটি ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে আল-আনদালুস এ রূপ নেয়।

প্রাচীন ইতিহাসবিদগণ এই নামকরণ নিয়ে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইবনু সাঈদ এর মতে, আল-আনদালুস ইবনু তূবাল ইবনু ইয়াফেস ইবনু নূহ অত্র এলাকায় আগমন করেন বিধায় এই এলাকার নাম আল-আনদালুস হয়েছে।[৯] আবার আহমদ ইবনু রাযী এর মতে, প্রথম প্রাচীন জাতি আল-আনদালুস নামে পরিচিত ছিল। এদের নামানুসারে এই এলাকার নামকরণ করা হয়েছে।[১০]

[৬] ড. আহমদ হাইকাল, *আল আদাবুল আনদালুসী মিনাল ফাতহি ইলা সুকূতিল খিলাফাহ* (কায়রো: দারুল মা'আরেফ, ১৯৮৫ খ্রি) পৃ.১৩

[৭] Aguado Bleye, *Historia de Espana,* P-53

[৮] Levi Provoncal, *Espana mueulmana* pg-44

[৯] আল মাক্কারী, *নাফহুত ত্বীব মিন গুসনিল আনদালুস আর রতীব*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৩

[১০] প্রাগুক্ত, পৃ ৬৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভৌগোলিক অবস্থান

আল-আনদালুস তথা স্পেন ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিন-পশ্চিম পাশে আইবেরীয় উপদ্বীপে অবস্থিত । দেশটি আইবেরীয় উপদ্বীপের প্রায় ৮৫ ভাগ স্থান দখল করে আছে।[১১] এর তিনদিকে জলরাশি দ্বারা বেষ্টিত এবং একদিকে স্থলভাগ বিদ্যমান। দেশটি অনেকটা ত্রিভুজাকৃতির। স্পেনের উত্তর-পূর্ব দিকে পিরেনিজ পর্বত অবস্থিত। এই পর্বত ফ্রান্স ও স্পেনকে আলাদা করেছে। এর পূর্ব দিকে ভূ-মধ্য সাগর, দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর- পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর, পশ্চিমে পর্তুগাল, দক্ষিণে জিব্রাল্টার প্রণালী অবস্থিত যাতে সাগর এবং মহাসাগরের সংমিশ্রণ ঘটেছে। এই প্রণালী স্পেনের দক্ষিণ ও আফ্রিকার উত্তর সীমান্তকে আলাদা করেছে।

স্পেনের ভূ-পৃষ্ঠ বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। এর একপাশে পর্বত ও তিনদিকে জলরাশি হওয়ায় এর ভূ-তাত্বিক গঠনেও বিভিন্নতা এসেছে। দেশটির একটি সুবিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে মালভূমি। দেশটির সবচেয়ে বড় মালভূমির নাম meseta central । এটা স্পেনের এক বড় অংশ জুড়ে বিস্তৃত। দেশটির আরেকটি অংশ পর্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত। এসব পর্বত উপত্যকার মাধ্যমে একটা আরেকটা থেকে বিচ্ছিন্ন। এসব পর্বতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দক্ষিণের Sierra morena পাহাড়। এটা মালভূমি ও দক্ষিণ পাশের সমতল ভূমির মাঝে অবস্থিত। মালভূমির পূর্বেও Sistema ibreco নামক এমন একটি পর্বত রয়েছে। এই পর্বতমালা মালভূমি ও পূর্বদিকের সমতল ভূমির মাঝে ভূ-মধ্য সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বিশাল বিস্তীর্ণ মালভূমির উত্তরেও ক্যান্টাব্রিয়া নামক একটি পর্বত রয়েছে।[১২]

দেশটির দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে সমতল ভূমি বিদ্যমান। এসব এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমান আবাদ, প্রবাহমান নদ-নদী বিদ্যমান। অন্যদিকে মালভূমি প্রধান এলাকা গুলো তুলনামূলক ভাবে কম উর্বর ও কৃষিকাজের অনুপযোগী।

স্পেনের নদ- নদীগুলোর মধ্যে বিখ্যাত কর্ডোভা ও সেভিলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত "নাহরুল ওয়াদী আল-কাবীর"। এটা আরবগণ কর্তৃক প্রদত্ত নাম। তবে বর্তমানে নামটি পরিবর্তিত হয়ে Guadalquivir (গুয়াদালকুইভির) হয়েছে। দেশটির দক্ষিণের অধিকাংশ সমতল ভূমি এই নদী-বিধৌত। এছাড়াও

[১১] www.wikipedia.com

[১২] ড. আহমদ হাইকাল, *আল আদাবুল আনদালুসী মিনাল ফাতহি ইলা সুকুতিল খিলাফাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ:১৭-১৮

মালভূমির মধ্যে দিয়ে Guadaiana নামক নদী প্রবাহিত।[১৩] এ নদীগুলো ছাড়াও স্পেনে বেশ কিছু ছোট-বড় নদী রয়েছে যা দেশটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

ভূ-তাত্বিক গঠনে বিভিন্নতার কারণে স্পেনের জলবায়ুও বিভিন্ন ধরণের। এ এলাকার জলবায়ু সাধারণত তিন ধরণের দেখা যায়:

ক) ভূ-মধ্য সাগরীয় জলবায়ু, এটা অত্যন্ত শুষ্ক ও উষ্ম গ্রীষ্মপ্রধান জলবায়ু।

খ) দক্ষিণ-পূর্ব এলাকাকেন্দ্রিক জলবায়ু, এটাও শুষ্ক এবং অর্ধ-অনুর্বর।

গ) সামুদ্রিক জলবায়ু, এই ধরণের জলবায়ু স্পেনের উত্তর অংশে তথা বাস্ক, ক্যান্টাব্রিয়া, গ্যালিসিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে বিদ্যমান। এই এলাকাগুলোর শীত-গ্রীষ্ম সামুদ্রিক বায়ু দ্বারা প্রভাবিত।

প্রাচীন কাল থেকেই স্পেনে বিভিন্ন ধরণের জন-গোষ্ঠীর বসবাস ছিল। আইবেরীয়রা উক্ত এলাকার আদি জনগোষ্ঠী বলে বিবেচিত। এরা গল ও বাস্ক গোত্রীভূত ছিল। এদের পরে তৎকালীন স্পেনে বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীরা আগমন করতে থাকে। এদের মধ্যে সর্বপ্রথম আগমন করে ফিনিশীয়রা। তারা খ্রিষ্টপূর্ব ১০ম শতকে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে স্পেনে আগমন করে। তারা দক্ষিণে ভূ-মধ্য সাগরের তীরবর্তী মালাগা শহর ও আটলান্টিক মহাসাগরের পাড়ে কাদেস নামক শহর গড়ে ও বসতি স্থাপন করে।

এরপর খ্রিষ্টপূর্ব ৫ম শতকে গ্রীকরা আগমন করে ও উত্তর- পূর্ব তীরে বসতি স্থাপন করে। এরাই এই ভূ-খন্ডকে আইবেরিয়া নামে নামকরণ এবং ভূ-মধ্য সাগরের তীরে বার্সেলোনা শহরের গোড়াপত্তন করে।

খ্রিষ্টপূর্ব ২য় শতকের মাঝামাঝিতে রোমানরা স্পেনে আগমন করে এবং এই এলাকাকে রোমান ভাষায় স্পেন নামে নামকরণ করে। এমনকি দেশটির ভাষা ও সংস্কৃতির বিস্তারেও তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটে।

খ্রিষ্টীয় ৫ম শতকে জার্মানীর "ওয়ানদাল" অথবা "ভানদাল" নামক গোষ্ঠীর সাথে রোমানদের সংঘর্ষ বেঁধে যায় এবং তারা প্রভাব বিস্তার করে। তাদের নাম থেকেই "ভানদালুসিয়া" নামকরণ হয়। পরবর্তীতে আরব মুসলিম বিজেতাগণ এই নামকে পরিবর্তন করে আল-আনদালুস রাখেন।[১৪]

এর ফলে স্পেনে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ ঘটেছে। তিন মহাদেশীয় তথা এশীয়, আফ্রিকান ও ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণের ফলে স্পেনের জনগোষ্ঠীর মাঝে তিন ধরণের ধারা প্রবাহিত হয়েছে।

---

[১৩] প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮

[১৪] ড. শাওক্বী দ্বাইফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী 'আসরুদ দুওয়ালি ওয়াল ইমারাতিল আনদালুস* (কায়রো :দারুল মা'আরিফ, ১৯৬০) ৮ম খন্ড, পৃ. ১৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

প্রাগৈতিহাসিক যুগে স্পেনে কোন মানব বসতির অস্তিত্ব ছিল না। আজ থেকে প্রায় ৩৫০০০ বছর পূর্বে স্পেনে মানব বসতির সূচনা হয়। তার পূর্বে এই ভূ-খন্ডে হোমিনিড গোত্রীয় প্রাণীর বসবাস ছিল। এখানে প্রায় ১.৪ মিলিয়ন বছর পূর্বের শিলাপাথর ও ১.২ মিলিয়ন বছর পূর্বের মানব জীবাশ্ম পাওয়া যায় যা এ দিকেই ইঙ্গিত করে।[১৫] এরপর প্রায় ৩৫০০০ বছর পূর্বে পিরেনিজ পর্বতের উত্তর দিক থেকে প্রথম মানব গোত্রের আগমন ঘটে। এরা Cro-Magnon নামক হোমো সেপিয়ান গোত্রিভূত ছিল। উত্তর স্পেনের আলতামিরা পর্বতের গুহার গায়ে তাদের অস্তিত্বের নিদর্শন স্বরূপ খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০০ বছর পূর্বের একটি প্রসিদ্ধ চিত্রকলা খুঁজে পাওয়া যায়। এটাকে গুহা-শিল্পের প্রধানতম দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য করা হয়।[১৬]

প্রাচীন ইতিহাসবিদগণ বলে থাকেন, স্পেনে যিনি সর্বপ্রথম আগমন করেন এবং নগর প্রতিষ্ঠা করেন তিনি ছিলেন হযরত নূহ (আ:) এর বংশধর আনদালুস ইবনু নাকরাশ ইবনু ইয়াফেস ইবনু নূহ। প্রায় শত বছরের বন্যা- কবলিত প্রানহীন স্পেনে তিনি বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রাণের সঞ্চার করেন। তাঁর বংশধরেরা প্রায় ৬০০ বছর এখানে রাজত্ব করে। তাদেরকে আনদালুস বলা হত এবং বলা হয়ে থাকে, তাদের নামানুসারে পরবর্তীতে স্পেনকে আনদালুস নামে নামকরণ করা হতে পারে।

তবে এই শাসক গোষ্ঠী ৬০০ বছরের বেশি ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেনি। তাদের অনেকেই ছিল অবাধ্য প্রকৃতির। মারামারি, রক্তপাত, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ইত্যাদি ছিল তাদের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দীর্ঘ ২০ বছরের অনাবৃষ্টির মাধ্যমে নদী-নালাকে শুষ্ক করে পশু-পাখি ও ফসলাদির বিনাশের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দেন।

এরপরে প্রায় একশ বছর স্পেন জন- মানবহীন অবস্থায় পড়ে থাকে। একশ বছর পরে সেখানে আফ্রিকা থেকে এক জনগোষ্ঠী আগমন করে বসতি স্থাপন করে। এই গোষ্ঠী অত্র ভূ-খন্ডে আগমনের পূর্বে তাদের অবস্থা অনেক শোচনীয় ছিল। তৎকালীন আফ্রিকাতে অনেক বড় আকারের দূর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অনেক মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করতে থাকে। অতি অনাহারে তাদের অবস্থা এমন হয় যে তারা একজন আরেকজনকে খেয়ে ফেলতে শুরু করে। তখন দেশটির রাজা, মন্ত্রী সহ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা একত্রিত হয়ে অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তাদের ধন-সম্পদ অবশিষ্ট অর্ধাংশের জন্যে ব্যয় করে। আফ্রিকার এই চরম দূর্ভিক্ষের সময় একদল লোক এই দূর্ভিক্ষ থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্যে

[১৫] *"Spain"*. Encarta Online Encyclopedia. 2007. Archived from *the original* on 2009-10-31
[১৬] *"Spain - History - Pre-Roman Spain - Prehistory"*. Britannica Online Encyclopedia. 2008

চাষাবাদযোগ্য ভূমির সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে এবং স্পেন নামক এই ভূ- খন্ডে এসে উপনীত হয়। তারা সর্বপ্রথম কাদেস নামক শহরে আগমন করে, এরপর দেশের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তারা এখানে শহর, নগর, বাড়ি-ঘর প্রতিষ্ঠা করে এবং এই এলাকার উপরে রাজত্ব কায়েম করে। তাদের ১১ জন রাজা এই এলাকা শাসন করে। এই জনগোষ্ঠী প্রায় ১৫০ বছর স্পেন শাসন করে। তাদের শাসনামল ছিল প্রাচুর্যময়। তারা স্পেনে সমসাময়িক অন্যান্য শহরের চেয়ে অনেক কিছু নির্মাণ করে। এই সময়ে স্পেন আইবেরীয় উপদ্বীপ নামেই পরিচিত ছিল এবং এদের অধিবাসীদেরকে আইবেরীয় নামে অভিহিত করা হত।

এই আফ্রিকীয় গোষ্ঠীর সর্বশেষ রাজা হুসিল এর সময়ে রোমানদের সাথে এক যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই যুদ্ধে রোমানরা বিজয় লাভ করে স্পেনের আধিপত্য লাভ করে এবং রাজাকে হত্যা করে।[১৭]

খ্রিষ্টপূর্ব ২য় শতক থেকে রোমান শাসনের অধীনে অত্র এলাকাকে হিসপানিয়া নামে নামকরণ করা হয়। ক্রমান্বয়ে দেশটির জনগণ রোমান সভ্যতাকে গ্রহণ করে। তারা শহর, নগর, বন্দর প্রতিষ্ঠা করে। এদের সময়ে আইবেরীয় উপদ্বীপ প্রভূত উন্নতি লাভ করে। এরা প্রায় ২৫০ বছর স্পেন শাসন করে। ৫ম শতকে যখন পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয় তখন স্পেনেও রোমান শাসনের ভিত দূর্বল হয়ে পড়ে এবং ক্রমান্বয়ে ভানদাল, ভিজিগথ ও সুয়েবী নামক জার্মান গোত্র গুলো স্পেনের উপর আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ লাভ করে। "ভানদাল" গোত্রের নামানুসারেই স্পেনের নাম হিসপানিয়া থেকে আনদালুস এ পরিবর্তিত হয়। এরা পিরেনিজ পর্বত অতিক্রম করে এই ভূ-খন্ডে আগমন করে। ভানদাল গোত্র স্পেন অতিক্রম করে আফ্রিকায় গিয়ে বসতি স্থাপন করে এবং ভিজিগথরা স্পেনে থেকে যায়। তারা ৪১৫ খ্রিষ্টাব্দে আগমন করে টলেডোতে ভিজিগথ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এই গোষ্ঠী ৮ম শতকে মুসলিম বিজয়ের আগ পর্যন্ত স্পেন শাসন করে।[১৮] তাদের অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে তাদের শাসন ব্যবস্থার ভিত দূর্বল হয়ে পড়ে এবং ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম বাহিনী কর্তৃক আক্রমণের শিকার হয়।

মুসলিম শাসনের পূর্বে স্পেনের সামগ্রিক অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় দুই ধরণের শ্রেণী বিদ্যমান ছিল। রাজা, ধর্মজাযক, অভিজাতশ্রেণী ছিল এক গোত্রীভূত। এদেরকে শাসক শ্রেণী নামে অভিহিত করা হত। আরেক শ্রেণী ছিল বর্গাদার, ভূমিদাস, ক্রীতদাস ও ইহুদীদের সমন্বয়ে গঠিত। এদেরকে শাসিত শ্রেণী নামে অভিহিত করা হত। শাসক শ্রেণীর হাতেই দেশের সবকিছু অর্পিত ছিল। তারাই ছিল দেশের ভূ-সম্পত্তির প্রকৃত মালিক। শাসিত শ্রেণীর উপর তারা তাদের প্রভাব- প্রতিপত্তি প্রয়োগ করত।

[১৭] ড. আব্দুল কাদির বুবায়া (সম্পাদনা), *তারীখু আনদালুস*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ২০০৭), পৃ:১৪২

[১৮] www.wikipedia.com

শাসিত শ্রেণীকেও আবার দুই ভাগে ভাগ করা হত। যাজক ও বর্গাদারদের কে বলা হত মধ্যবর্তী শ্রেণী। তাদের নিজেদের সহায়-সম্পত্তি ছিল কিন্তু তারা শুধু ফসল উৎপাদনের জন্যে বর্গা পেত, মালিকানা হস্তান্তরের ক্ষমতা তাদের ছিলনা।কোন সময় ফসল উপাদিত না হলেও নিজেদের পকেট থেকে খাজনা শোধ করতে হত। নিরূপায় হয়ে অনেকে বর্গাদারী ছেড়ে দিয়ে সেনাবাহিনী বা অন্য কোন পেশায় যোগদান করত।

আরেকটি শ্রেণী ছিল সর্বনিম্ন পেশার লোকদেরকে নিয়ে গঠিত। এদের মধ্যে ভূমিদাস, ক্রীতদাস ইত্যাদি শ্রেণীর লোক অন্তভূক্ত ছিল। এরা ছিল সবচেয়ে শোষিত ও নিপীড়িত গোষ্ঠী। ভূমিদাসরা জমি চাষ করত। জমি বিক্রি হয়ে গেলে জমির সাথে সাথে তারাও বিক্রি হয়ে যেত। আবার কোন কাজে সামান্য ভূল-ত্রুটি হলে তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার নেমে আসত। আর ক্রীতদাসরা পণ্যের ন্যায় হাটে- বাজারে বিক্রি হত। এক একজন ব্যক্তির অধীনে ৪০০০ থেকে ৮০০০ পর্যন্ত ক্রীতদাস থাকত।[১৯]

রোমান শাসনের অধীনে কৃষকেরা ছিল স্বাধীন, তারা সুখে শান্তিতে বসবাস করত। তাদের উপর কোন রকম অত্যাচার, অবিচার বা জবরদস্তি করা হত না। কিন্তু ভিজিগথিক শাসনামলে এসে তারা ভূমিদাস, ক্রীতদাসে পরিনত হয়।তাদের জীবনে সীমাহীন দূর্যোগ নেমে আসে। উচ্চ শ্রেণী তথা শাসক ও অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা কোন কর প্রদান করত না। এই করের বোঝা বহন করতে হত এই সমস্ত নিম্ন আয়ের লোকদের। করের বোঝা বহন করতে করতে তারা সর্বস্বান্ত হয়ে বনে জঙ্গলে আশ্রয় নেয় অথবা দস্যুবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়ে।[২০]

স্পেনে বেশ কিছু সংখ্যক ইহুদিদের বসবাস ছিল। তারা বুদ্ধিজীবী শ্রেণী হিসেবে সমাজে পরিচিত ছিল। গথিক রাজা রিকার্ডও ক্যাথলিক ধর্মমত গ্রহণ করে এবং অনেককে বিশেষ করে ইহুদিদেরকে এই ধর্মমত গ্রহণ করতে বাধ্য করে। ৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে রাজা সিসেবুত কর্তৃক একটি আইন জারির মাধ্যমে প্রায় ৯০০০০ ইহুদিকে জোরপূর্বক খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করানো হয়।

৭০৯ খ্রিষ্টাব্দের দিকে স্পেনের রাজা ছিল উইতিজা। ৭০৯ মতান্তরে ৭১০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে রডারিক উইতিজাকে পরাজিত করে হত্যা করে ও সিংহাসন দখল করে।[২১] সে ছিল উচ্চাভিলাসী ও অত্যাচারী। সে আশে পাশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের প্রতি দৃষ্টি দেয়। এর মধ্যে সিউটা ছিল অন্যতম। সিউটার গভর্নর ছিল নিহত রাজা উইতিজার জামাতা কাউন্ট জুলিয়ান। সে তার মেয়ে ফ্লোরিন্ডাকে রাজপরিবারের প্রথা অনুযায়ী রাজকীয় আচার, প্রথা শিক্ষালাভের জন্যে রডারিকের রাজপ্রাসাদে প্রেরণ করে। কিন্তু সে রডারিক কর্তৃক অপমানিত ও শ্লীলতাহানীর শিকার হয়। তখন জুলিয়ান প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্তে দেশকে মুক্ত

[১৯] ডোজি, *স্প্যানিস ইসলাম* (লন্ডন: ১৯১৩), পৃ. ২১৭

[২০] ইমাম উদ্দিন, এস, এম, *পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অফ মুসলিম স্পেন* (ঢাকা: ১৯৬৯) পৃ. ১২

[২১] প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩

করার লক্ষ্যে শপথ গ্রহণ করেন এবং মুসলিম নেতা মুসা বিন নুসাইরকে স্পেন আক্রমণের জন্যে অনুরোধ জানান।

এই ঘটনা ছাড়াও আরো অনেক কারণে জুলিয়ান মুসাকে স্পেন আক্রমণের অনুরোধ জানান। রডারিকের পূর্বে স্পেনের রাজা ছিলেন উইটিজা । তার উত্তরাধিকারীরাই ছিল সিংহাসনের দাবিদার। কিন্তু খ্রিষ্টান বিশপদের মাধ্যমে রডারিক যখন জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল করে তখন উইটিজার বংশধরেরা জুলিয়ানের নিকট গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং তার সাহায্য কামনা করে।

মুসা বিন নুসাইর প্রথম দিকে তার কথাকে বিশ্বাস করতে পারেননি। কারণ রডারিক ও জুলিয়ান উভয়েই খ্রিষ্টান ছিল। আর জুলিয়ানের সাথে মুসলিম সেনাবাহিনীর বেশ কয়েকবার সংঘর্ষও হয়েছে। তাই তিনি এটিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র মনে করেছিলেন। তখন জুলিয়ান তার রাজকীয় তরবারী মুসার পায়ের কাছে অর্পন করে বন্ধুত্বের আহবান জানান। তাতেও যখন কাজ হলো না তখন তিনি তার কন্যার শ্লীলতাহানীর কথা বললে মুসা মজলুমের পক্ষে তরবারী ধারণ করার জন্যে প্রস্তুত হলেন।

মুসা প্রথমে উমাইয়া খলিফা ওয়ালীদ ইবন আব্দুল মালিকের নিকট স্পেন আক্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। খলিফা তাঁকে সতর্ক থাকার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে স্পেন আক্রমণের অনুমতি প্রদান করেন।

মুসা বিন নুসাইর জুলিয়ানের বিশ্বস্ততা যাচাই ও সার্বিক পরিস্থিতি অনুধাবনের জন্যে প্রথমে ছোট ছোট অভিযান প্রেরণ করেন। এসব অভিযান সফল হলে তিনি তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর তারিক বিন যিয়াদের নেতৃত্বে স্পেনে বড় অভিযান প্রেরণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
স্পেনে ইসলামের আগমন

স্পেনে যখন রডারিকের অত্যাচার যজ্ঞ চলছিল তখন মুসলিম বিশ্ব উমাইয়া খিলাফতের অধীনে ছিল। জুলিয়ানের অনুরোধে মূসা বিন নুসাইর অভিযানের জন্যে খলিফা ওয়ালিদের অনুমতি প্রার্থনা করেন। খলিফার অনুমতি পেলে তিনি এলাকা পর্যবেক্ষণের জন্যে ভৃত্য তারীফকে দিয়ে ৭১০ খ্রিষ্টাব্দে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করেন। জরিপ সফল করে তিনি প্রত্যাবর্তন করলে মুসা ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে তারিক ইবনে যিয়াদের সেনাপতিত্বে ৩০০ আরব ও ৭০০০ বার্বার সৈন্যের সমন্বয়ে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে তার সৈন্যবাহিনীতে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১০৩০০ বা ১২০০০ তে উপনীত হয়।

তারিক বিন যিয়াদ ছিলেন তাঞ্জিয়ারের গভর্নর। তারিক বিন যিয়াদের পরিচয় নিয়ে বেশ কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন, তিনি কিন্দাহ গোত্রের একজন মুক্ত আরব সদস্য।[২২] কারো মতে, তিনি আফ্রিকীয় বার্বার বংশোদ্ভুত। তবে অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে, তিনি মুসা বিন নুসাইরের একজন দাস ছিলেন। মুসা তাঁকে মুক্ত করে স্বীয় সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করেন।[২৩] তিনি তাঁর বিচক্ষণতা, যুদ্ধ-বিগ্রহ সংক্রান্ত জ্ঞানসহ বিভিন্ন গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সেনাপতির পদে আসীন করেন। এবং তাঁরই সেনাপতিত্বে স্পেনে অভিযান প্রেরণ করেন।

জুলিয়ান তাঁদের সাহায্যার্থে চারটি বাণিজ্য-জাহাজ প্রেরণ করেন। তারিক তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে উক্ত জাহাজগুলোতে করে জিব্রালটার প্রণালী অতিক্রম করে একটি পাহাড়ের পাদদেশে এসে পৌঁছেন। তাঁর নামানুসারে এই পাহাড়কে " জাবালুত তারিক" নামে নামকরণ করা হয় । এ নাম থেকেই পরে জিব্রালটার নামকরণ করা হয়। তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে জিব্রালটার প্রণালী থেকে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে আশে পাশের নগরগুলো অধিকার করতে থাকেন। তখন স্পেনের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের গভর্নর থিওডোমি রাজা রডারিককে মুসলিম বাহিনীর আগমনের সংবাদ প্রদান করেন।[২৪]

কথিত আছে, তারিক বিন যিয়াদ জাহাজে ওঠার কিছুক্ষন পরেই ঘুমিয়ে পড়েন এবং স্বপ্নে রাসূল (সা) এর যিয়ারত লাভ করেন। তিনি তাঁকে স্পেন বিজয়ের সুসংবাদ দেন। যখন তিনি ঘুম থেকে উঠে মুজাহিদদের এই সুসংবাদ প্রদান করেন তখন তাদের সাহস বহু গুণে বৃদ্ধি পায়।

---

[২২] *Ibn Taghribirdi,* p. 278 of French translation, and *Ibn Khallikan,* vol. 3 p. 476 of English translation

[২৩] *Ibn Khallikan,* vol. 3 p. 81 of English translation

[২৪] ইমাম উদ্দিন, এস, এম, *পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অফ মুসলিম স্পেন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

তিনি জাহাজ থেকে অবতরণের পরে সবগুলো জাহাজ পুড়িয়ে ফেলতে নির্দেশ দেন। সৈন্যরা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, এখন আমরা কিভাবে ফিরব? তিনি উত্তর দেন, আমরা ফিরে যাওয়ার জন্যে এখানে আসিনি। হয় বিজয়, নতুবা ধ্বংস।

রডারিকের সাথে যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে তারিক এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। তার কিছু অংশ নিম্নরূপ:

" হে আমার যোদ্ধাগণ, তোমরা পালাবে কোথায়? তোমাদের পেছনে সাগর আর সামনে শত্রু। তোমাদের আছে শুধুমাত্র সাহস, মেধা ও বিচক্ষণ শক্তি। তোমাদের সামনে শত্রু, যাদের সংখ্যা অগন্য। কিন্তু তোমাদের তলোয়ার ব্যতীত আর কোন সম্বল নেই। তোমরা বেঁচে থাকতে পারবে যদি শত্রুর হাত থেকে নিজেদের জীবনকে ছিনিয়ে আনতে পার। ভেবো না আমি তোমাদের সাথে থাকব না। আমিই সবার সামনে থাকব এবং আমার বাঁচার সম্ভাবনা সবচেয়ে ক্ষীণ।"

এই বক্তৃতায় মুসলিম সেনাবাহিনী উজ্জীবিত হয়।

রাজা রডারিক মুসলিম বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে তার সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ সেনাদের নিয়ে একটি সুসজ্জিত সেনাবহিনী গঠন করেন। মুসলিম বাহিনী অগ্রসর হয়ে রডারিক-বাহিনীর সম্মুখীন হয়। অবশেষে ৭১১ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ মে (২৭ রমযান, ৯২ হিঃ) তে ওয়াদী লাক্কোর উপত্যকায় লাগুন দে জান্দা নদীর উপকূলে মেদিনা সিনদিয়ার শহর ও হ্রদের মাঝখানে একটি স্থানে দুই পক্ষের মাঝে এক তুমুল যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় এবং তা সাতদিন স্থায়ী হয়। তাঁর তেজস্বী আক্রমণের মুখে রডারিকের গথিক বাহিনী ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায় এবং হাজার হাজার সৈন্য মৃত্যুবরন করে। রাজা রডারিক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করতে গিয়ে নদীতে নিমজ্জিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তারিক বিন যিয়াদ এই বিজয়ের সংবাদ মূসা বিন নুসাইর কে প্রেরণ করেন। তিনি তাঁকে অভিযান স্থগিত করতে নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু তারিক একজন বিচক্ষণ সেনাপতি ছিলেন। তিনি মনে করলেন, ভিজিগথিকরা আবার একজোট হয়ে আক্রমণ করতে পারে। ফলে তিনি মূসার আদেশ অমান্য করে তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে একের পর এক শহর দখল করতে থাকেন। এ তথ্য মূসার নিকট পৌছালে তিনি ১৮০০০ সৈন্য নিয়ে স্পেন অভিমুখে ৭১২ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে অগ্রসর হন। কাউন্ট জুলিয়ান ও তাঁর সঙ্গে যোগ দেন।[২৫] তবে তিনি তারিকের সঙ্গে মিলিত না হয়ে ভিন্ন পথ ধরেন এবং একের পর এক শহর যেমন মেদিনা , সেভিল, কারমোনা ইত্যাদি শহর জয় করতে থাকেন। এরপর তিনি টলেডোর নিকটবর্তী হলে তারিকের সাথে মিলিত হন।

[২৫] প্রাগুক্ত,পৃ.২২

তারিক মূসার আদেশ অমান্য করে বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখায় তিনি তাঁর উপর মনক্ষুন্ন ছিলেন। ফলে তিনি তারিক যখন তাঁকে স্পেনে অভ্যর্থনা জানাতে গমন করেন তখন তিনি তাঁকে বেত্রাঘাত ও করেন।[২৬] কিন্তু তিনি এর প্রতিবাদ না করে বরং নিরবে সহ্য করেন। পরে তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়।

দুই বছরের মধ্যেই স্পেনে প্রায় সব এলাকা মুসলমানদের হস্তগত হয় এবং ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে। তাঁদের এই বিজিত এলাকার সীমানা পিরেনিজ পর্বত পর্যন্ত প্রসারিত হয়। মূসা পিরেনিজ পর্বতের ওপারে ফ্রান্সেও অভিযান পরিচালনার জন্যে প্রস্তুতি নিতে থাকেন। কিন্তু খলিফা ওয়ালিদ সম্মতি না দেওয়ায় তিনি এ অভিযান আর পরিচালনা করেন নি। বলা হয়ে থাকে যে, মুসলিম বাহিনী ফ্রান্স উপকূলবর্তী রোন নদীর তীরে একটি আরবীতে লিখিত শিলালিপি দেখতে পান। এই শিলালিপি খলিফা ওয়ালিদের দূত অথবা ফ্রান্সের শাসক পেপিন মুসলিম সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে স্থাপন করেন বলে মনে করা হয়। এতে লেখা ছিল," হে ইসমাঈলের বংশধরেরা, তোমরা আর অগ্রসর হয়ো না, ফিরে যাও"। খলিফার আদেশ এবং এই শিলালিপি দেখে মুসলিম বাহিনী ফ্রান্স অভিযান থেকে বিরত থাকে। এরপর মূসা খলিফার এক জরুরী তলবে দামেস্কে ফিরে যান এবং যাওয়ার পূর্বে স্পেনে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং নিজ পুত্র আব্দুল আযীযকে আফ্রিকার ভাইসরয়ের অধীনে স্পেনের গভর্নর পদে নিয়োগ দান করেন। স্পেন উমাইয়া খিলাফতের অধীনে একটি প্রদেশে পরিণত হয়।

অষ্ট্রিয়া রাজ্য ব্যতীত আইবেরীয় উপদ্বীপের সব এলাকা আল-আনদালুস নামে অধিষ্ঠিত হয়ে উমাইয়া খেলাফতের অধীনস্থ হয়। বলা হয়ে থাকে, এই নামে স্পেনে একটি স্বর্ণমুদ্রাও চালু হয় যার এক পিঠে আরবীতে আল-আনদালুস এবং আরেক পাশে ল্যাটিন ভাষায় স্পান লিখিত ছিল।

স্পেন বিজয়ের মধ্য দিয়ে স্পেনে ইসলামের আগমন ঘটে। তবে স্পেনের অধিবাসী খ্রিষ্টান, ইহুদী ও ভিজিগথিকদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হয়নি। তাদেরকে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালনের অনুমতি দেয়া হয়। অনেকে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং ইসলামী ও আরব নামে নিজেদের নামকরণ করে। স্পেনের মাটিতে অনেক মসজিদ, ধর্মীয় শিক্ষালয়, ধর্মীয় স্থাপনা ইত্যাদি স্থাপিত হয়। এক সময় তারা মুসলিম চুক্তির উপর অসম্মান প্রদর্শন করলে ৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তাদের অনেক গীর্জাকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়। স্পেনে ইসলামের এক মজবুত ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হয়। প্রায় ৮০০ বছরের গৌরবজ্জ্বাল শাসনামলে মুসলিম স্পেন জ্ঞান- বিজ্ঞান, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদিতে সাফল্যের চরম শিখরে আরোহন করে।

[২৬] ডোজি, *স্প্যানিস ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ:২৩৩

তারিক বিন যিয়াদ কর্তৃক স্পেন বিজয়ের পরে অত্র এলাকা মুসলিম শাসনাধীন হয়ে যায়। মুসলিম বিশ্ব তখন উমাইয়া খেলাফতের একচ্ছত্র শাসনাধীনে। স্পেন ও প্রথম দিকে উমাইয়া খেলাফতের অধীনস্থ থাকে। পরবর্তীতে এখানে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের ফলে স্বাধীন শাসকদের আবির্ভাব ঘটে। ফলে মুসলিম স্পেনের শাসন-যুগকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। তা হলো: দামেস্ক কেন্দ্রিক উমাইয়া শাসকদের অধীনে মুসলিম স্পেনের শাসন-কাল ও তৎপরবর্তী আব্বাসী আমলে স্পেনে বসবাসরত উমাইয়াদের অধীনে স্বাধীন শাসন-কাল।

স্পেন বিজয়ের পরে মুসা নিজ পুত্র আব্দুল আযীযকে গভর্নর নিযুক্ত করে দামেস্কে প্রত্যাবর্তন করেন।তাঁরই শাসনাধীনে মুসলিম স্পেন উমাইয়া খেলাফতের অঙ্গরাজ্য হিসেবে পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে আব্বাসীয়রা ক্ষমতায় আসীন হলে মুসলিম স্পেনে বসবাসরত উমাইয়াগণ সেখানে স্বাধীন উমাইয়া শাসনের যাত্রা শুরু করেন।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দামেস্কের অধীনস্থ আমীরদের শাসনে স্পেন

যখন স্পেন বিজিত হয় তখন সমগ্র মুসলিম বিশ্ব উমাইয়া খেলাফতের অধীনে ছিল। আর সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক ছিল উমাইয়া শাসনের কেন্দ্র। ফলে সেসময়ের বিজিত রাজ্যগুলো উমাইয়া খেলাফতের অঙ্গরাজ্য হিসেবে পরিগনিত হত। কিন্তু দামেস্ক থেকে মুসলিম স্পেনের দূরত্ব ছিল প্রায় ২৫০০ মাইল। শাসনকার্যের প্রয়োজনে যে কোন জরুরী মুহূর্তে এই দূরত্বই বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। স্পেন বিজিত হওয়ার পর থেকে সেখানে উমাইয়া খেলাফতের অধীনে গভর্নর নিয়োগ দেওয়া হত। তাদেরকে আমীর বলা হত। তারপরও দূরত্ব থাকার ফলে খলিফার কোন ফরমান স্পেনে পৌঁছতে অনেক সময় লেগে যেত। আবার রাজ্যে কোন সমস্যা দেখা দিলে তা খলিফার দরবারে পৌঁছতেও অনেক সময় লাগত। আর এই ব্যবধানের ফলে সেখানে বিভিন্ন ধরণের সমস্যা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। জনগণ ইচ্ছামত একজন আমীরকে অপসারণ করে আরেকজনকে আমীর হিসেবে ক্ষমতায় বসাত এবং খলিফার অনুমোদন নিয়ে নিত। এর ফলে আমীরগন ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যে আরব অথবা সিরীয় যেকোন এক শক্তিশালী দলের সমর্থন অর্জন করত। আর এসব নিয়েই সেখানে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।[২৭] এই কারনে তাদের কোন শাসকই দীর্ঘদিন ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেননি।

দামেস্কের অধীনে মুসলিম স্পেনের প্রথম আমীর ছিলেন মূসা বিন নুসাইরের পুত্র আব্দুল আযীয। তাঁকে আফ্রিকার ভাইসরয়ের অধীনে নিয়োগ দেয়া হয় এবং সেভিল মুসলিম স্পেনের রাজধানী হিসেবে পরিগণিত হয়। তাঁর পরে একে একে আমীরগন স্পেনের দায়িত্বভার নিতে থাকেন। তাঁরা কখনো কখনো দামেস্কের খলিফা কর্তৃক আবার কখনো কায়রোয়ানে অবস্থিত আল-মাগরিবের গভর্নরের কাছ থেকে নিয়োগপত্র পেতেন। এভাবে প্রায় ৪১ বছর তাঁরা শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

যে সমস্ত আমীর দামেস্কের অধীনে স্পেন শাসন করেন তাঁরা হলেন যথাক্রমে[২৮]:

১. তারিক ইবন যিয়াদ (৭১১-৭১২ খৃ.)
২. মূসা ইবন নুসাইর (৭১২-৭১৪ খৃ.)
৩. আব্দুল আযীয ইবন মূসা (৭১৪-৭১৬ খৃ.)
৪. আইয়ুব ইবন হাবীব আল লাখমী (জুলাই-আগস্ট ৭১৬ খৃ.)
৫. আল-হুর ইবন আব্দুর রহমান আছ-ছাকাফী (৭১৬-৭১৮ খৃ.)

[২৭] ইমাম উদ্দিন, এস, এম, *এ পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অব মুসলিম স্পেন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
[২৮] ড. আব্দুল কাদির বুবায়া (সম্পাদনা), *তারীখু আনদালুস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

৬. আস সামাহ ইবন মালিক আল-খাওলানী (৭১৯-৭২১ খৃ.)
৭. আনবাসা ইবন সুহাইম আল কালবী (৭২১-৭২৫ খৃ.)
৮. ইয়াহইয়া ইবন সালমা আল কালবী (৭২৫-৭২৬ খৃ.)
৯. উসমান ইবন আলী উবাইদা (৭২৬-৭২৭ খৃ.)
১০.উসমান ইবন আবী নাস আল কাছিমী (৭২৭-৭২৮ খৃ.)
১১.হুযাইফা ইবন আল আহওয়াস আল আবাসী(৭২৮-৭২৯ খৃ.)
১২.আল হায়সাম ইবন উবাইদ আল কেনানী (৭২৯-৭৩০ খৃ.)
১৩.আব্দুর রহমান আল গাফিকী (৭৩০-৭৩২ খৃ.)
১৪.আব্দুল মালিক ইবন কাতান আল ফিহরী (৭৩২-৭৩৪ খৃ.)
১৫.'উকবা ইবনুল হাজ্জাজ আস সালাবী (৭৩৪-৭৪১ খৃ.)
১৬.আব্দুল মালিক ইবন কাতান আল ফিহরী (৭৪১ খৃ. দ্বিতীয়বারের মত ক্ষমতায় আসীন হন।)
১৭.বালজ ইবন বিশর আল কুশায়রী (৭৪১-৭৪২ খৃ.)
১৮.সা'লাবা ইবন সালামা (৭৪২-৭৪৩ খৃ.)
১৯.আব্দুল খাত্তার হুস্সাম ইবন দিরার আল কালবী (৭৪৩-৭৪৫ খৃ.)
২০.ইউসুফ ইবন আব্দুর রহমান আল ফিহরী (৭৪৫-৭৫৬ খৃ.)

এ সমস্ত গভর্নর কখনো দামেস্কের উমাইয়া খলিফাগন কর্তৃক আবার কখনো আল-মাগরিবের প্রশাসক কর্তৃক নিয়োগ পেতেন। তবে উমাইয়া খলিফা উমর ইবন আব্দুল আযীযের শাসনামলে মুসলিম স্পেনের শাসনব্যবস্থা আল-মাগরিবের শাসন-বলয়ের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়। তখন স্পেনের গভর্নর ছিলেন আস সামাহ ইবন মালিক আল-খাওলানী।[২৯]

স্পেন বিজয়ের পরে মুসলিম গভর্নরগন মুসলিম শক্তি সম্প্রসারনের জন্যে বেশ কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করেন। আসসামাহ ও তা অব্যাহত রাখেন। তিনি আমীর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই সেপ্টিমানিয়ার খৃষ্টানদের বিদ্রোহ দমনের লক্ষ্যে তুলুস অভিমুখে যাত্রা ও তা অবরোধ করেন। তুলুস ছিল একুইটনের রাজধানী।
সেখানে মুসলিম শক্তি বিজিত হয়, তবে আস সামাহ শহীদ হন।[৩০]

আস সামাহ এর শাহাদতের পূর্বেই উমর ইবন আব্দুল আযীয মৃত্যুবরণ করেন এবং স্পেনের শাসন-ব্যবস্থা আগের মতই আল-মাগরিব দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। এরপর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন আনবাসা ইবন সুহাইম আল কালবী। তিনি উমাইয়া খলিফা ইয়াযিদ ইবন আব্দুল মালিকের শাসনামলে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।

---

[২৯] শাওকী দ্বাইফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী 'আসরুদ দুওয়ালি ওয়াল ইমারাতিল আনদালুস* , প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
[৩০] হিট্টি, পি.কে. *হিস্ট্রি অব দ্যা অ্যারাবস*, (নিউইয়র্ক: ম্যাকমিলান,) পৃ. ৪৯৯

তাঁর শাসনামলে মুসলিম সেনাবাহিনী উত্তর দিকে অবস্থিত রোন উপত্যকা অতিক্রম করে আউতুনে উপস্থিত হয় এবং ফ্রান্সের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বারগুইন্ডি প্রদেশ অধিকার করে।আনবাসার বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার ফলে দক্ষিণ ফ্রান্সে মুসলমানদের অবস্থান শক্তিশালী হয়।[৩১]

উমাইয়া খেলাফতের অধীনে মুসলিম স্পেনের অন্যতম প্রভাবশালী এবং সুদক্ষ শাসক ছিলেন আব্দুর রহমান আল গাফিকী। তাঁর শাসনামলে মুসলিম স্পেনে শান্তি ও সুশৃঙ্খলা পুন: প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি একাধারে গভর্নর ও সেনাপতি ছিলেন। পীরেনীজ পর্বতের অন্য পাশে অবস্থিত ফ্রান্সে মুসলিম শক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তিনি বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি ৭৩২ খ্রিষ্টাব্দে পীরেনীজের পশ্চিমে অবস্থিত একটি পথ দিয়ে প্রায় এক লক্ষ সেনাবাহিনী নিয়ে ফ্রান্সে প্রবেশ করেন। সেখানে গ্যারোন নদীর তীরে ডিউক ইউডিসকে পরাজিত করেন ও টুরসের কাছে এসে উপস্থিত হন। গলের ধর্মপ্রচারক সেইন্ট মার্টিনের দেহ সমাহিত থাকায় এ স্থান তাদের কাছে তীর্থস্থানের ন্যায় ছিল।[৩২] ফলে যখন মুসলিম সেনাবহিনী টুরসের কাছাকাছি এসে উপস্থিত হল তখন ইউডিস উক্ত স্থানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে মেরিভেঞ্জিয়ান রাজদরবারের মেয়র চার্লস মার্টেলের সাথে মিত্রতা স্থাপন করে ও বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করে। দুই সেনাবাহিনী লোয়াইর নদীর তীরে সমতল ভূমিতে মুখোমুখি হয়। প্রায় সপ্তাহব্যাপী এ সংঘর্ষ স্থায়ী হয়। যখন ফ্রাঙ্কদের পরাজয় নিশ্চিত তখন মুসলিম বাহিনীর একাংশ বিশেষ করে বার্বাররা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। আব্দুর রহমান আল গাফিকী তাদের মাঝে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। এক পর্যায়ে তিনি শাহাদত বরণ করেন। এর ফলে মুসলিম সেনাবাহিনী আরো বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং চার্লস মার্টেল এক নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ চালায়।[৩৩] এ যুদ্ধ মুসলমানদের কাছে বালাতুশ শুহাদা নামে পরিচিত।

এরপর থেকে স্পেনে বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজমান থাকে। আব্দুর রহমান আল গাফিকীর পরে আব্দুল মালিক ইবন কাতান আল ফিহরী গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনি বিশৃঙ্খলা দমন করতে তৎপর হন। এছাড়াও তিনি বেশ কয়েকটি স্থানে খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর উত্তরসুরী হিসেবে ক্ষমতায় আসেন উকবা ইবন হাজ্জাজ। তিনি তাঁর শাসনামলে ফ্রান্সের বিশাল এলাকা মুসলিম শাসনের আওতায় নিয়ে আসেন।

উমাইয়া শাসনের অধীনে স্পেনের সর্বশেষ গভর্নর ছিলেন ইউসুফ ইবন আব্দুর রহমান আল ফিহরী। তাঁর শাসনামলে মুসলিম স্পেনের অভ্যন্তরীন বিবাদ ও বিশৃঙ্খলা দূর হয় এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩৪]

---

[৩১] ইমাম উদ্দিন, এস, এম, *এ পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অব মুসলিম স্পেন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

[৩২] হিট্টি, পি.কে. *হিস্ট্রি অব দ্যা অ্যারাবস*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫০০

[৩৩] ইমাম উদ্দিন, এস, এম, *এ পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অব মুসলিম স্পেন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

[৩৪] শাওকী দ্বাইফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী 'আসরুদ দুওয়ালি ওয়াল ইমারাতিল আনদালুস*, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৩

তবে এ সময় ছিল সার্বিকভাবে বিবাদ-বিশৃঙ্খলার সময়। স্পেনে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও অনেকে নামেমাত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ছদ্মবেশী খ্রিষ্টানরূপে থেকে যায়। তারা একধরনের বিশেষ শ্রেণীর উদ্ভব ঘটায়। আরবরা তাদেরকে মুয়াল্লাদ বলত। স্থানীয়রা তাদেরকে মুদালিস নামে আখ্যায়িত করত। এদের মধ্যে একধরণের হীনমন্যতাবোধ কাজ করত। ফলে তারা আরব অভিজাত শ্রেণীকে ঈর্ষার চোখে দেখত এবং প্রায়শই আরব শাসকদের বিরূদ্ধে বিদ্রোহে জড়িয়ে পড়ত। ফলে যখন দামেস্কে উমাইয়া খেলাফতের পতন হয় তখন এখানেও এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে ও নতুন শাসন-ব্যবস্থা শুরু হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

স্বাধীন উমাইয়া আমীরদের শাসনে স্পেন

প্রথম আব্দুর রহমানঃ

বনু উমাইয়ার সাথে বনু আব্বাসের দ্বন্দ্ব ছিল দীর্ঘ দিনের। উমাইয়া বংশের সর্বশেষ খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানের সময়ে এই কলহ চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে টাইগ্রিস নদীর অববাহিকা অঞ্চলে জাব নদীর তীরে আব্বাসীদের সাথে উমাইয়াদের সংঘটিত যুদ্ধে মারওয়ানের পরাজয় ঘটে ও এর মাধ্যমে উমাইয়া খেলাফতের পতন হয়।একই সাথে ইসলামের ইতিহাসে আব্বাসীয় শাসন-যুগের সূচনা হয় এবং আবুল আব্বাস আস সাফ্ফাহ প্রথম আব্বাসী খলিফা হিসেবে ক্ষমতায় আসীন হন।

ক্ষমতায় আরোহনের সাথে সাথেই আব্বাসীরা উমাইয়াদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করা শুরু করে। তাদের অনেককেই নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। এদের মধ্যে একজন ছিলেন ১৯ বছর বয়সী উমাইয়া শাহজাদা আব্দুর রহমান। তিনি ছিলেন একজন বিচক্ষণ ও সাহসী তরুণ। তিনি তাদের হত্যাযজ্ঞ থেকে কোনরকমে প্রাণে বেঁচে ছদ্মবেশে পলায়ন করে স্পেনে প্রবেশ করেন। এ জন্যে তাঁকে আব্দুর রহমান আদ দাখিল বলা হয়।[৩৫]

তিনি মরক্কোর উপকূলে সিউটা বন্দরে পৌঁছেন ও বার্বারদের সমর্থন লাভ করেন। সেখানে বার্বাররা স্পেনে বসবাসরত সিরীয়দের পক্ষে কাজ করত। আর তারা দীর্ঘদিন উমাইয়া শাসনের অধীনে থাকায় আব্দুর রহমানকে সমর্থন করে ও তাঁর পক্ষে কাজ করা শুরু করে। সবকিছু প্রস্তুত করে তারা তাঁকে স্পেনে প্রবেশ করতে অনুরোধ জানায়। স্পেনে প্রবেশ করার পর একে একে সব শহর তাঁর হস্তগত হয়। স্পেনের তৎকালীন আব্বাসীয় গভর্নর ছিল ইউসুফ আল ফিহরী। তিনি তাঁকে পরাজিত করে মুসলিম স্পেনের স্বাধীন আমীর হন। তাঁর হাতে মুসলিম স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া শাসনের যাত্রা শুরু হয়।মুসলিম স্পেনের রাজধানী দামেস্ক থেকে কর্ডোভাতে স্থানান্তর করা হয়। তিনি নিজেকে আমীর বলতেন এবং প্রথম দিকে আব্বাসীয় খলিফা আল মানসুরের নামে খুতবা পাঠ করতেন। পরবর্তীতে আব্দুল মালিক ইবন উমর ইবন মারওয়ানের পরামর্শে তিনি এটা স্থগিত করেন এবং আমীরুল মুসলিমীন খেতাব ধারণ করেন।[৩৬]

আব্দুর রহমান ছিলেন একজন বিচক্ষণ ও জ্ঞানী শাসক। আল-মানসুর তাঁকে সাকরু কুরাইশ বা কুরাইশদের বাজপাখি নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। তিনি ক্ষমতায় আরোহনের পরে অল্প কিছুদিনের

[৩৫] শাওকী দ্বাইফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী 'আসরুদ দুওয়ালি ওয়াল ইমারাতিল আনদালুস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
[৩৬] ইমাম উদ্দিন, এস, এম, *এ পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অব মুসলিম স্পেন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

মধ্যেই মুসলিম স্পেনের বিবাদ বিশৃঙ্খলা মিটিয়ে সেখানে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। তবে তিনি আব্বাসীয় খলিফাদের দ্বারা বেশ কিছু বাধার সম্মুখীন হন। ৭৬১ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা আল মানসুর আল-আলা ইবন মুগীসকে স্পেনের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দিয়ে স্পেনে প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে গিয়ে আব্বাসী সমর্থকদের একত্রিত করেন এবং আব্দুর রহমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে আল আলা নিহত হন। [৩৭]

রাজ্যে বিদ্রোহ দমন করে তিনি স্পেনকে পুনর্গঠনের কাজে মনযোগ দেন। শহরগুলোকে সুবিন্যস্ত করেন এবং চারদিকে প্রাচীর নির্মাণ করেন। তাঁর নির্মিত বিভিন্ন স্থাপনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কর্ডোভার জামে মসজিদ যা পরবর্তীকালে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসেবে পরিগনিত হয়। তিনি তাঁর বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে স্পেনে উমাইয়া শাসনের সুদৃঢ় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন যা প্রায় ২৭৫ বছর টিকেছিল। তিনি ১৭২ হিজরী মোতাবেক ৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তখন তাঁর পুত্র হিশাম তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

প্রথম আব্দুর রহমান নিজেকে আমীর হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর বংশের বেশ কয়েক পুরুষ পর্যন্ত এই উপাধি স্থায়ী থাকে। তবে এই রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন তৃতীয় আব্দুর রহমান যাঁর শাসনামলে মুসলিম স্পেন উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করে। তিনি প্রথম খলিফা উপাধি গ্রহণ করেন। সে হিসাবে স্বাধীন উমাইয়া শাসকদের তালিকাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

ক) স্বাধীন আমীরঃ

১. প্রথম আব্দুর রহমান আদ দাখিল (৭৫৬-৭৮৮ খ্রি.)
২. প্রথম হিশাম (৭৮৮-৭৯৬খ্রি.)
৩. প্রথম আল হাকাম (৭৯৬-৮২২ খ্রি.)
৪. দ্বিতীয় আব্দুর রহমান (৮২২-৮৫২ খ্রি.)
৫. প্রথম মুহাম্মদ (৮৫২-৮৮৬ খ্রি.)
৬. আল-মুনযির (৮৮৬-৮৮৮ খ্রি.)
৭.আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (৮৮৮-৯১২ খ্রি.)
৮. তৃতীয় আব্দুর রহমান (৯১২-৯২৯ খ্রি. আমীর হিসেবে)

খ. খলিফাঃ

৮. তৃতীয় আব্দুর রহমান (৯২৯-৯৬১ খ্রি. খলিফা হিসেবে)
৯. দ্বিতীয় হাকাম (৯৬১-৯৭৬ খ্রি.)

[৩৭] ইমাম উদ্দিন, এস, এম, *এ পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অব মুসলিম স্পেন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

১০. দ্বিতীয় হিশাম (৯৭৬-১০০৯ খ্রি.)
১১. দ্বিতীয় মুহাম্মদ (১০০৯ খ্রি.)
১২. সুলাইমান (১০১০-১০১২খ্রি.)
১৩. আলী ইবন হাম্মাদ (১০১৫-১০১৭ খ্রি.)
১৪. চতুর্থ আব্দুর রহমান (১০১৮ খ্রি.)
১৫. কাসিম ইবন হাম্মাদ আল-মামুন (১০১৮-১০২৩ খ্রি.)
১৬. পঞ্চম আব্দুর রহমান (১০২৩-১০২৪ খ্রি.)
১৭. তৃতীয় মুহাম্মদ (১০২৪-১০২৫ খ্রি.)
১৮. ইয়াহইয়া ইবন আলী ইবন হাম্মাদ (১০২৫-১০২৭ খ্রি.)
১৯. তৃতীয় হিশাম (১০২৭-১০৩১ খ্রি.)

প্রথম হিশামঃ

স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম আব্দুর রহমানের মৃত্যুর পরে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র প্রথম হিশাম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তিনি বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও ধার্মিক হওয়ায় তাঁর পিতা আব্দুর রহমান মৃত্যুর পূর্বেই তাঁকে উত্তরসুরী রূপে মনোনীত করে যান।

তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ও ফকীহদের মাধ্যমে প্রভাবিত ছিলেন।যে কোন কাজের ক্ষেত্রে তিনি তাঁদের শরণাপন্ন হতেন ও তাঁদের দেয়া উপদেশ মত কাজ করতেন। ধর্মভীরুতা ও জ্ঞানে গুণে তাঁকে উমাইয়া শাসক উমর ইবন আব্দুল আযীযের সাথে তুলনা করা হত। সেসময়ে চার মাযহাবের অন্যতম ছিলেন ইমাম মালিক ইবন আনাস । তিনি ইমাম মালিকের ভক্ত ও অনুসারী ছিলেন। তিনি ইমাম মালিককে একসময় মদীনা ছেড়ে স্পেনে এসে বসবাস করার আহবান জানান। কিন্তু তিনি রাজি ছিলেন না। ফলে হিশাম মানুষকে মদীনায় গিয়ে ইমাম মালিকের কাছে ইসলামী জ্ঞান অর্জনে উৎসাহিত করেন এবং সেখান জ্ঞান অর্জন শেষে তাদেরকে স্পেনে এসে তা প্রচার করতে আহবান জানান।

হিশাম তাঁদের এতটাই ভক্ত ছিলেন যে, একবার কর্ডোভার বিচারক মুসআব ইবন ইমরান তাঁর এক লোকের বিচারের রায় প্রদান করেন। সে রায়ে সন্তুষ্ট না হয়ে আমীরের কাছে অভিযোগ করে। তখন তিনি তাকে প্রত্যুত্তরে বলেন, আল্লাহর শপথ, যদি তিনি আমাকে সিংহাসন ও ছেড়ে দিতে বলেন তবে আমি তাই ছেড়ে দেব।[৩৮]

[৩৮] শাওকী দ্বাইফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী 'আসরুদ দুওয়ালি ওয়াল ইমারাতিল আনদালুস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

তিনি রাষ্ট্রের বিচারকার্য সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে ইমাম মালিকের শিষ্যদেরকে নিয়োগ দিতেন। তাঁর শাসনামলে স্পেনে মালিকী মাযহাবের ব্যাপক প্রসার হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে মালিকী মাযহাব অনুযায়ী আইন শিক্ষাদানের বিষয়বস্তু অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

তাঁর শাসনামলে বেশ কিছু বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তাঁর ভাই সুলাইমান যখন পিতার মৃত্যু সংবাদ ও ভাই হিশামের ক্ষমতায় আরোহনের সংবাদ পায় তখন সে জনবল গুছিয়ে বিদ্রোহ শুরু করে। সে জনবল নিয়ে হিশামকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে কর্ডোভার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। তখন তিনি খবর পেয়ে সৈন্য নিয়ে তার মোকাবিলায় রওনা হন এবং তাকে পরাজিত ও প্রতিহত করেন।[৩৯]

তিনি ১৮০ হিজরী মোতাবেক ৭৯৬ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রথম আল হাকাম :

প্রথম হিশামের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র প্রথম আল-হাকাম ২৬ বছর বয়সে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সাহসী ছিলেন। তবে তিনি তাঁর পিতার মত ধার্মিক ছিলেন না। তাঁর বিলাসবহুল জীবনের কারণে ফকীহগণ তাঁকে পছন্দ করতেননা।

তাঁর পিতা প্রথম হিশামের সময়ে ফকীহ সহ অন্যান্য ধর্মীয় নেতারা ছিলেন সমাজের সবচেয়ে গণ্যমান্য ও প্রভাবশালী মহল। তাঁরা রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্বভাবতই এ কারণে তাঁদের সাথে তাঁর সংঘাতপূর্ণ সম্পর্কের সূচনা হয়। তিনি তাঁদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা হ্রাস করেন। একই সাথে নবদীক্ষিত মুসলিমদের ভাগ্যও বিঘ্নিত হয়। ফলে তারা ফকীহদের সাথে আল-হাকাম বিরোধী আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করে। এদের মধ্যে অন্যতম ফকীহ ছিলেন ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া ও ঈসা ইবন দীনার।তাঁরা তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন। কিন্তু ঘটনাক্রমে এটা ফাঁস হয়ে যায়। তখন আমীর আল হাকাম তাদেরকে দমন করতে পদক্ষেপ গ্রহন করেন। ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া ও ঈসা ইবন দীনার কোনমতে পালিয়ে টলেডোতে আশ্রয় নেন।

কিন্তু তিনি এই বিদ্রোহ চিরতরে দমন করতে পারেন নি। আবারো এই বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করে। তখন তিনি এক নিষ্ঠুর বলপ্রয়োগ করে তাদেরকে দমন করতে সচেষ্ট হন। এসব ধর্মীয় নেতাসহ সর্বসাধারণ মানুষের উপর এক অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়। তাদের বহুসংখ্যক নেতাকে হত্যা করা হয় এবং অনেককে দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হয়।[৪০]

---

[৩৯] ড. আব্দুল কাদির বুবায়া (সম্পাদনা): *তারীখু আনদালুস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০

[৪০] হিট্টি, পি.কে. *হিস্ট্রি অব দ্যা অ্যারাবস*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫১২

তাঁকে তাঁর কঠোরতা ও রাজ্য পরিচালনার দিক থেকে আব্বাসী খলিফা আল মানসুরের সাথে তুলনা করা হয়।[৪১]তবে এত নিষ্ঠুরতার পরেও তিনি একজন সাহিত্যানুরাগী ও সঙ্গীতপ্রেমী ছিলেন। তাঁর রাজদরবারে অনেক কবি সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞের যাতায়াত ছিল। তিনি নিজেও কবিতা চর্চা করতেন।

৮২২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাঁর শাসনকালের অবসান ঘটে।

দ্বিতীয় আব্দুর রহমানঃ

প্রথম হাকামের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় আব্দুর রহমান ৮২২ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতায় আসীন হন। দুই আব্দুর রহমান তথা পূর্বপুরুষ আব্দুর রহমান আদ দাখিল ও নাতি আব্দুর রহমান আন নাসেরের মধ্যবর্তী হওয়ায় তাঁকে আব্দুর রহমান আল আওসাত বলা হত।[৪২] তাঁর সময়কালকে মুসলিম স্পেনের অন্যতম উৎকৃষ্ট সময় হিসেবে গন্য করা হয়। তিনি রাষ্ট্রে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি স্পেনে আরব সংস্কৃতির চূড়ান্ত রূপ প্রদান করেন।তাঁর শাসনামলে তিনটি বিষয় তথা ধর্ম, আরবী ভাষা ও জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার অগ্রযাত্রা শুরু হয়।

তিনি তাঁর দাদা প্রথম হিশামের মত ধার্মিক ও একইসাথে ধর্মীয় নেতাদের সমঝদার ছিলেন। তাঁর পিতা হাকামের আমলে ধর্মীয় নেতাদের প্রভাব অনেকটাই কমে যায়। তবে তিনি শাসক হয়ে পূর্ব ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনেন। তাঁর সময়ে ধর্মীয় নেতা ছিলেন আল হাকামের সময়কালীন বিদ্রোহী ফকীহ নেতা ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া। তিনি এ আমলে মুসলিম স্পেনে রাষ্ট্রীয়ভাবে মালিকী মতবাদের প্রবর্তন করেন।

তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্য চর্চাকে অনেক বেশি প্রধান্য দিতেন। এ যুগে অন্যতম প্রসিদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন কর্ডোভার বাসিন্দা আব্বাস ইবন ফিরনাস। তিনি একাধারে দার্শনিক ও কবি ছিলেন। জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল।[৪৩] এছাড়াও এযুগের অন্যতম প্রসিদ্ধ শিল্পী ছিলেন যিরয়াব[৪৪]। তিনি একইসাথে গায়ক, কবি, শিল্পী ও বিজ্ঞানী ছিলেন।

---

[৪১] শাওকী দ্বাইফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী 'আসরুদ দুওয়ালি ওয়াল ইমারাতিল আনদালুস* , প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

[৪২] ড. রাগেব আস সিরজানী, *কিস্‌সাতুল আনদালুস মিনাল ফাতহি ইলাস সুকূত*, (কায়রো : মুআস্‌সাসাতু ইকরা, ২০১১), পৃ. ১৭৩

[৪৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

[৪৪] শাওকী দ্বাইফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী 'আসরুদ দুওয়ালি ওয়াল ইমারাতিল আনদালুস* , প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

দ্বিতীয় আব্দুর রহমান রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রভূত পরিবর্তন সাধন করেন।তাঁর আমলেই তাঁর নামে আনদালুসের প্রথম মুদ্রা চালু হয়। এ সময়ে কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রসারিত হয়। এছাড়াও আল-আনদালুসে আরো বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

তবে তাঁর শাসনামলে রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজমান থাকলেও বেশ কিছু বিদ্রোহও দেখা দেয়। এর মধ্যে নরম্যানদের আক্রমণ অন্যতম। এরা ডেনমার্ক, সুইডেন, ফিনল্যান্ড ও নরওয়ে তথা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চলের এক ধরণের বিশেষ জনগোষ্ঠী ছিল। এই জনগোষ্ঠী ৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে ৫৪ টি নৌ বহর নিয়ে নৌ পথে সেভিলের উপকূলে আক্রমণ করে। সেখানে তারা ব্যাপক লুটতরাজ চালায়। আব্দুর রহমান এটা জানতে পারলে তিনি উপকূলে সৈন্য প্রেরণ করে তাদের প্রতিহত ও বিতাড়িত করেন।[৪৫]

তাঁর রাজত্বকালের শেষ দিকে ধর্মান্ধ খ্রিষ্টানদের আন্দোলন ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মুসলিম স্পেনে খ্রিষ্টানদের ধর্মীয়, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় সুযোগ- সুবিধা ভোগ করত। এমনকি তাদের অনেকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদেও অধিষ্ঠিত হয়। তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করেও আরবী ভাষা ও আরবীয় কৃষ্টি-কালচারের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। বিশেষ করে দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের সময়কাল থেকে আনদালুসে আরবী সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসারের ফলে তারা নিজেরাও এর দিকে ঝুঁকে ও আরবীয় জীবন যাপনের অনুকরণ করতে শুরু করে। তারা নিজেদেরকে মোযারাব নামে অভিহিত করে। এদের এরূপ আকর্ষণের বিরোধিতা করে গোঁড়া খ্রিষ্টানগণ। তারা তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে থাকে এবং এই ঘৃণা একসময়ে মুসলিম বিরোধিতায় রূপ নেয়। তারা ইসলাম ধর্ম এমনকি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে নিয়েও কটুক্তি করতে দ্বিধাবোধ করেনা। তখন দ্বিতীয় আব্দুর রহমান এদের বিরূদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এসব বিদ্রোহী ও কটুক্তিকারী বেশ কিছু ধর্মনেতাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। তখন মোযারাব খ্রিষ্টানদের অনেকেই নিজেদের বাঁচাতে ও নির্দোষ প্রমাণ করতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।[৪৬]

আমীর দ্বিতীয় আব্দুর রহমান ৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আল-আনদালুসের শক্তিমত্তা অনেক হ্রাস পায়।

প্রথম মুহাম্মদঃ

দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের মৃত্যুর পর প্রথম মুহাম্মদ ৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তিনি তাঁর পিতার পরিচালিত কর্মধারা অব্যাহত রাখেন। তাঁর আমলে বেশ কিছু কারণে শাসনব্যবস্থার ভিত দূর্বল হয়ে পড়ে। যেমন- মানুষ ধন-সম্পদপ্রিয় ও বিলাসী হয়ে পড়ে।এর ফলে ফিতনা ফাসাদ বেড়ে যায়। এছাড়াও অভ্যন্তরীণ গোত্রীয় ও ধর্মীয় দ্বন্দ্ব ও শাসনব্যবস্থা দূর্বল হয়ে যাওয়ার পেছনে অনেক দায়ী। স্বভাবতই এসব কারণে এসময়ে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়। অনেকেই সুযোগ পেয়ে এসময় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

---

[৪৫] ড. রাগেব আস সিরজানী, *কিস্‌সাতুল আনদালুস মিনাল ফাতহি ইলাস সুকূত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

[৪৬] শেরওয়ানী এইচ কে, *মুসলিম কলোনিস ইন ফ্রান্স, নর্দান ইটালী এন্ড সুইজারল্যান্ড* (ই, অনু.), (লাহোর: ১৯৬৪), পৃ. ১২৩

এদের মধ্যে আব্দুর রহমান ইবন মারওয়ান আল জিল্লিকী ও মালাগায় উমর ইবন হাফসুনের বিদ্রোহ অন্যতম।[৪৭] তাদের এসব বিদ্রোহের সঙ্গী হয় খ্রিষ্টান বিদ্রোহী, তথাকথিত নওমুসলিম তথা মোযারাব ও মুওয়াল্লাদরা। দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের সময় যারা নিজেদের বিপদমুক্ত রাখতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল তাদের অনেকেই এ বিদ্রোহে শামিল হয়। তারা বলতে থাকে, স্পেনের অধিবাসী হিসেবে আরবদের চেয়ে তারাই সিংহাসনের অধিকতর ও ন্যায্য দাবীদার। এ দাবি বাস্তবায়ন করতে তারা মরিয়া হয়ে ওঠে এবং বেশ কিছু স্থানে স্বাধীন রাজ্য ঘোষণা করে বসে। তাদের এই বিদ্রোহ দমন করতে প্রথম মুহাম্মদ সহ পরবর্তী দুই শাসক মুনযির, আব্দুল্লাহ ও তাঁদের উত্তরসুরী খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমান ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সর্বশেষে তিনি এই বিদ্রোহ দমন করতে বিশেষ অবদান রাখেন ও ফলপ্রসু হন।

মুনযিরঃ

প্রথম মুহাম্মদ ৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পুত্র মুনযির রাষ্ট্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।তিনি দুই বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। এসময়েও তাঁর পিতার সময়ে সংঘটিত বিদ্রোহ বিরাজমান থাকে।তিনি তাদেরকে দমন করতে ব্যর্থ হন। এদের মধ্যে একজন ছিলেন উমর ইবন হাফসুন। তার চক্রান্তে বিষ প্রয়োগে ৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে মুনযিরের অকাল মৃত্যু ঘটে। বলা হয়ে থাকে, এই চক্রান্তে তাঁর ভাই দ্বিতীয় আব্দুল্লাহও জড়িত ছিলেন।[৪৮]

দ্বিতীয় আব্দুল্লাহঃ

মুনযিরের মৃত্যুর পরে তাঁর ভাই দ্বিতীয় আব্দুল্লাহ সিংহাসনে আরোহন করেন। তাঁর শাসনামলেও বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হয়নি। তাঁর সময়ে স্পেনীয় ও আরব জনগণের দুইটি আলাদা শক্তি পরিলক্ষিত হয়। এলভিরায় স্পেনীয়দের ও সেভিলে আরবদের অভ্যুত্থান ঘটে। এছাড়াও তাঁর শাসনামলে স্পেন ছাড়াও আরো বিভিন্ন এলাকায় ফিতনা ফাসাদ দেখা দেয়। গ্রানাডা, তুতাইলা, মার্সিয়া সহ নানান এলাকায় বিভিন্ন ধর্মীয় ও বিদ্রোহী নেতার উদ্ভব ঘটে।[৪৯]

৯১২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আল-আনদালুসে স্বাধীন আমীরদের শাসনের অবসান হয়।

তৃতীয় আব্দুর রহমানঃ

[৪৭] শাওকী দ্বাইফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী 'আসরুদ দুওয়ালি ওয়াল ইমারাতিল আনদালুস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
[৪৮] ড. আব্দুল কাদির বুবায়া (সম্পাদনা), *তারীখু আনদালুস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬
[৪৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯

দ্বিতীয় আব্দুল্লাহর নাতি তৃতীয় আব্দুর রহমানের প্রকৃত নাম ছিল আব্দুর রহমান আন নাসির। তিনি তাঁর দাদার মৃত্যুর পরে ২৩ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহন করেন।তাঁর সময়কালকে মুসলিম স্পেনের সর্বোৎকৃষ্ট সময় হিসেবে গণ্য করা হয়।

দাদা দ্বিতীয় আব্দুল্লাহর সময়ে রাষ্ট্রের সব জায়গায় বিশৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল। তিনি এসব বিশৃঙ্খলা দমন করতে অপারগ হয়ে পড়েন। তখন তিনি তাঁর নাতি আব্দুর রহমানকে নানা ধরনের জ্ঞানার্জন, যোগ্যতা অর্জনের শিক্ষা দিয়ে নিজের মনমত গড়ে তোলেন। আব্দুর রহমান আন নাসির ছিলেন পিতৃহারা। তাঁর জন্মের ২৩ দিন বয়সে তাঁর পিতাকে তাঁর চাচা হত্যা করে।[৫০] তখন থেকেই তিনি তাঁর দাদার কাছে লালিত পালিত হন। তিনি প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। ফলে অল্প বয়সেই তিনি কুরআন-হাদীস, ব্যকরণ, কবিতা, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে অগাধ জ্ঞানার্জন করেন। একই সাথে তিনি একজন যোগ্য শাসক হওয়ার গুণাবলী অর্জন করেন।

দাদার মৃত্যুর পরে তিনি যখন সিংহাসনে আরোহন করেন তখন কর্ডোভা ছাড়া বাকি সব এলাকা মুসলিম শাসনের আয়ত্ত্বের বাইরে ছিল। এমতাবস্থায় তাঁর প্রথম কাজ ছিল আয়ত্ত্বাধীন কর্ডোভাকে পুনর্গঠিত করা। তিনি সর্বপ্রথম এর দিকে মনোনিবেশ করেন এবং একে নতুন করে সাজান। তিনি সেখানে নিজের, পরিবারবর্গ, আমীর ওমরাহ, জ্ঞানী গুণী, আলেম সবার জন্যে "আয-যাহরা" নামে প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এছাড়াও কর্ডোভার জামে মসজিদের পরিধি বৃদ্ধি, অলঙ্করণ ও সেখানে মিহরাব স্থাপন করেন।[৫১]

তৃতীয় আব্দুর রহমান যখন ক্ষমতায় আরোহন করেন তখন রাজ্যে তাঁর পূর্বসূরীদের সময়ে সংঘটিত বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান ছিল। আনদালুসের দুই দিক তথা দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম দিকে চরম অরাজকতা বিরাজ করছিল। প্রথমে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মনোযোগ দেন। এই অঞ্চলে সবচেয়ে বড় বিদ্রোহী নেতা ছিল উমর ইবন হাফসুন। তাকে স্যামুয়েল ও বলা হত। সে অনেক আগে থেকেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আর সে এসব কাজের জন্যে উত্তর দিক থেকে খ্রিষ্টানদের ও দক্ষিন দিক থেকে ফাতেমী রাজ্যের সাহায্য পেত। এছাড়াও সেভিল থেকেও তাকে সাহায্য করা হত। আব্দুর রহমান ক্ষমতায় আরোহনের এক বছরের মধ্যেই ৯১৩ খ্রিস্টাব্দে তার বিরূদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। তিনি সর্বপ্রথম তার সাহায্যের রাস্তাগুলো বন্ধ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ উদ্দেশ্যে প্রথমে তিনি সেভিল অভিযানের চিন্তা করেন। সেভিলে বসবাসরত মুসলিম শক্তিকে একত্রিত করা হয় এবং এ অভিযানে তাদেরকেও অন্তর্ভূক্ত করা হয়। সাহায্যের সব রাস্তা বন্ধ করার পরে ইবন হাফসুনের সাথে সম্মুখ অভিযান অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ তিন মাস এই অভিযান স্থায়ী হওয়ার পরে সে শহর ও দূর্গ হস্তান্তরের বিনিময়ে শান্তি চুক্তির প্রস্তাব পাঠায় ও তা গৃহীত হয়।[৫২]

---

[৫০] ড. রাগেব আস সিরজানী, *কিস্‌সাতুল আনদালুস মিনাল ফাতহি ইলাস সুকূত*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯১

[৫১] শাওকী দ্বাইফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী 'আসরুদ দুওয়ালি ওয়াল ইমারাতিল আনদালুস* , প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

[৫২] ড. রাগেব আস সিরজানী, *কিস্‌সাতুল আনদালুস মিনাল ফাতহি ইলাস সুকূত*, প্রাগুক্ত, পৃ.২০০

একই বছরে তিনি দক্ষিণের অন্যান্য শহর তথা ইসতিজা, জায়ান বিদ্রোহীদের দখলমুক্ত করেন। এরপর উত্তর দিকের বিদ্রোহ কবলিত এলাকার দিকে মনোনিবেশ করেন। আল আনদালুসের উত্তর দিক খ্রিষ্টানদের অধীনস্থ ছিল।এদিকের রাজ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল লিওন, নাফার ইত্যাদি। এসব রাজ্যে আব্দুর রহমান বেশ কয়েক বার অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু কোন অভিযানই সম্পূর্ণভাবে সফলতা বয়ে আনেনি। অবশেষে ৯২১ খ্রিষ্টাব্দে খ্রিষ্টানদের সাথে মুসলিম বাহিনীর প্রায় তিন মাস ব্যাপী এক বড় যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের ফলে লিওন রাজ্য আনদালুসের অন্তর্ভূক্ত হয়। এর চার বছর পরে ৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নাফার রাজ্যে অভিযান প্রেরণ করেন এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তা মুসলিম সাম্রাজ্যভূক্ত হয়।[৫৩]

আব্দুর রহমানের শাসনামলে আরেক নতুন বিদ্রোহ দেখা দেয়। ৩২৫ হিজরীতে গামরা পাহাড়ের কাছে অবস্থিত এক এলাকায় এক ব্যক্তি নবুওয়ত দাবী করে বসে। সে তার মনগড়া ধর্ম ও অনেক নতুন নতুন রীতি রচনা করে। যেমন- সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের সময় নামায আদায়, প্রত্যেক ওয়াক্তে তিন রাকাআত করে নামাযের নির্দেশ দেয়, অযু করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এমনকি সে কুরআন রচনার মত দু:সাহস ও দেখায়। এই খবর আব্দুর রহমানের কাছে পৌঁছলে তিনি তাঁর বিরূদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। তারা তাকে হত্যা করে ও তার মাথা কর্ডোভায় নিয়ে আসে।[৫৪]

আব্দুর রহমান আন নাসির এভাবে একে একে আনদালুসের চতুর্দিক তথা পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণের সব এলাকার বিদ্রোহ দমন করেন ও সেগুলোকে আনদালুসের একচ্ছত্র মুসলিম শাসনের অধীনে নিয়ে আসেন।

বিদ্রোহ দমন ও রাজ্যে শান্তি- শৃঙ্খলা ফিরে এলে আমীর উপাধি পরিবর্তন করে আমীরুল মুমিনীন ও নাসির লি দ্বীনিল্লাহ উপাধি গ্রহণ করেন এবং আনদালুসের শাসন ব্যবস্থাকে উমাইয়া খেলাফত হিসেবে ঘোষণা করেন। এই খিলাফত ৯২৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত টিকে ছিল।

তিনি শুধু মুসলিম স্পেনের পরিধি সম্প্রসারণ করেই ক্ষান্ত হননি, বরং এরপরে তিনি অত্র এলাকার সার্বিক উন্নয়নের প্রতিও মনোযোগ দিয়েছিলেন। তাঁর শাসনামলে কৃষিখাতে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়। এসময় ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়।এছাড়াও বিভিন্ন ধরণের শিল্প যেমন চামড়াজাত দ্রব্য, নৌকা, বিভিন্ন রকম যন্ত্রপাতির ব্যবসা বৃদ্ধি পায়।[৫৫]

---

[৫৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩

[৫৪] ড. আব্দুল কাদির বুবায়া (সম্পাদনা), *তারীখু আনদালুস*, প্রাগুক্ত, পৃ.২০৯

[৫৫] ড. রাগেব আস সিরজানী, *কিস্‌সাতুল আনদালুস মিনাল ফাতহি ইলাস সুকূত*, প্রাগুক্ত, পৃ.২২২

এসময়ে জ্ঞান- বিজ্ঞান চর্চায় অগ্রগতিও ছিল লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল কর্ডোভা লাইব্রেরীর আকার বৃদ্ধি। তিনি এর আকার এতটাই বৃদ্ধি করেন যে এর বইএর পরিমাণ চার লক্ষে পৌঁছায়। এত সুবিশাল সমাহারের কোন বই ছাপাখানায় মুদ্রিত ছিল না। এর সবই ছিল হাতে লিখে সংকলন করা। আব্দুর রহমান আন নাসিরের সময়ে এমন অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন যারা এসব বই হাতে লিখে কর্ডোভা লাইব্রেরীতে সংরক্ষণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে হাস্‌সান ইবন আব্দিল্লাহ ইবন হাস্‌সান, মুহাম্মদ ইবন আব্দিল্লাহ আল লাইসি প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[৫৬] কেই এসব বই কপি করতে ইচ্ছা করলে এসব লেখকের কাছে যেত এবং তারা লাইব্রেরীতে এসে এসব বই হাতে লিখে কপি করে দিতেন।

এই মহান শাসক আনদালুসকে সভ্যতার সুতিকাগার ও জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তোলেন। দাদা আব্দুল্লাহর সময়ে যেখানে আনদালুস ছিল শুধু কর্ডোভা কেন্দ্রিক একটি ক্ষুদ্র রাজ্য সেখানে আব্দুর রহমান আন নাসির তাঁর দীর্ঘ ৫০ বছরের শাসনকালে একে এক বিশাল রাজ্যে পরিণত করেন এবং নিজেকে স্পেনে উমাইয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুর রহমান আদ দাখিলের সুযোগ্য উত্তরসুরী রূপে প্রমাণ করেন। তিনি ৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর আগে নিজ পুত্র হাকামকে সিংহাসনের জন্যে মনোনীত করে যান।

দ্বিতীয় হাকামঃ

খলিফা আব্দুর রহমান আন নাসিরের পুত্র আল হাকাম ৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে ৪৭ বছর বয়সে ক্ষমতায় আসীন হন। তিনি খলিফা হয়ে আল মুনতাসির বিল্লাহ উপাধি ধারণ করেন। তাঁর শাসনামলেও প্রভূত উন্নতি লক্ষণীয়। পিতা আব্দুর রহমান আন নাসির আনদালুসের যে চিত্র তৈরী করে গেছেন তাকে ধরে রেখে আরো উন্নতি সাধন করতে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। তিনি মূলত তাঁর পিতার অসমাপ্ত কাজগুলোই সমাপ্ত করার দায়িত্ব হাতে নেন।

আব্দুর রহমান আন নাসির রাজ্যের বিশৃঙ্খলাগুলো দমন করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে যাওয়াতে তাঁর জন্যে শাসনকার্য পরিচালনা করা অনেক সহজ হয়ে যায়। তাঁর সময়ে তেমন কোন প্রতিকূলতা ছিল না। ফলে এ সময়ে শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়। আনদালুসের সাথে বহির্বিশ্বের যোগাযোগ ও পারস্পারিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে উত্তর দিকের খ্রিষ্টান রাজ্য ও ইউরোপীয় রাজ্যগুলোর সাথে পুন:সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

তবে আব্দুর রহমান আন নাসিরের মৃত্যুর পরে তারা আনদালুসের শাসন ব্যবস্থাকে দূর্বল ভাবতে থাকে এবং খলিফা আল হাকামকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে শুরু করে। তখন তিনি ভাল ব্যবহারের চিন্তা বাদ দিয়ে

[৫৬] ইবনুল ফারদী, *তারীখু উলামাইল আনদালুস*,(কায়রো: মাকতাবাতুল খানিজী, ১৯৮৮)পৃ. ১১৬

তাদেরকে দমনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ৩৫১ হিজরীতে তিনি সৈন্য প্রেরণ করে তাদেরকে প্রতিহত করেন ও বহু দূর্গ মুসলমানদের হস্তগত হয়।[৫৭]

তিনি একইসাথে একজন আলেম, ফকীহ ও ইতিহাসের সংরক্ষক ছিলেন। তাঁর মধ্যে সব ধরণের ভাল গুণের সমাবেশ ছিল। স্বভাবত একারণেই তিনি তাঁর পিতার মত রাজ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। তাঁকে মুসলিম খলিফাগণের মধ্যে সবচেয়ে পন্ডিত ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হত। পাশাপাশি তিনি আলেম-ওলামাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

তাঁর সময়ে আনদালুসে বেশ কিছু লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। এদের মধ্যে উমাইয়া লাইব্রেরী অন্যতম। এই লাইব্রেরীকে মধ্যযুগের অন্যতম বড় লাইব্রেরী হিসেবে গণ্য করা হয়। একে সমসাময়িক অন্যান্য লাইব্রেরীর সাথে তুলনা করা হত। এতে অনেক কর্মচারী নিয়োযিত ছিল যারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন ভাষার বই সংগ্রহ করে আনত এবং সেগুলোকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করা হত।[৫৮] আর এসব অনুবাদ কর্মের জন্যে বিভিন্ন ভাষায় দক্ষতা অর্জন করাও অত্যাবশ্যক ছিল। এর ফলে এ সময়ে ভাষা চর্চা, অনুবাদ কর্ম ও লেখনী চর্চা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয় হাকামের শাসনামলে কর্ডোভায় বিশ্ববিদ্যালয় নির্মিত হয়। এটা ছিল কর্ডোভার সবচেয়ে বড় জামে মসজিদ সংলগ্ন। আনদালুসকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা অপরিসীম। এখানে বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান- বিজ্ঞানের চর্চা হত। দেশে-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আলেমরা এসে এখানে পড়াতেন। তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন ইবন কুতিয়াহ, আবু বকর ইবন মুআবিয়া আল কুরশী, আবু আলী আলক্বালী প্রমুখ। ইবন কুতিয়াহ ছিলেন প্রখ্যাত নাহু বিশারদ। তিনি কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাহু পড়াতেন। আবু বকর ইবন মুআবিয়া হাদীসের পাঠদান করতেন। আবু আলী আল ক্বালী জাহেলী যুগের আরবদের ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ইত্যাদিতে গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি আনদালুসের ছাত্রদের এসব বিষয়ে শিক্ষাদান করতেন।[৫৯]

এ সময়ে আরো একজন বিখ্যাত আলেম ছিলেন। তিনি হলেন আবু বকর আয যুবাইদী। আরবী ভাষা ও ব্যকরণ সংরক্ষণে তাঁর বিশেষ অবদান ছিল। ব্যকরণ ও ভাষার উপরে তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। আলহাকাম তাঁকে রাজপরিবারের সন্তানদের শিক্ষাদানের জন্যে মনোনীত করেন।[৬০]

---

[৫৭] ড. রাগেব আস সিরজানী, *কিস্‌সাতুল আনদালুস মিনাল ফাতহি ইলাস সুকূত*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪১

[৫৮] প্রাগুক্ত, পৃ.২২৮

[৫৯] মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আনদালুস*, (কায়রো: মাকতাবাতুল খানিজী, ১৯৯৭)২য় খন্ড, পৃ. ৫০৭

[৬০] ড. রাগেব আস সিরজানী, *কিস্‌সাতুল আনদালুস মিনাল ফাতহি ইলাস সুকূত*, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৯

সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে আল হাকামের অবদান অপরিসীম। গরীব ও অসহায় মানুষরা যারা টাকার অভাবে সন্তানদেরকে লেখাপড়া করাতে পারতনা তিনি তাদের জন্যে বিনামূল্যে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দেন। এ ছাড়াও যারা এসব গরীব সন্তানদের লেখাপড়া ও লালন-পালনের ভার নিত তিনি তাদেরকে বায়তুল মাল থেকে মজুরি বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎসাহিত করতেন।
এই মহান শাসক ৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর ১১ বছরের নাবালক পুত্র হিশামকে সিংহাসনের জন্যে মনোনীত করে যান।

দ্বিতীয় হিশামঃ

আল হাকাম মৃত্যুবরণ করার সময় যখন তদীয় পুত্র হিশামকে মনোনীত করেন তখন এই নাবালক পুত্রের জন্যে শাসনকার্য পরিচালনা করা ছিল এক দুরূহ ব্যাপার। কারণ, একদিকে ছিল প্রভাবশালী ফাতেমী রাজ্য ও খ্রিষ্টান রাজ্যগুলোর বিদ্রোহ জেগে ওঠার আশংকা, আর অন্যদিকে ছিল দুই ধরনের শক্তি তথা সাকালিব নামক এক ধরনের জনগোষ্ঠীর যুবক সম্প্রদায় এবং হাজীব জা'ফর ইবন উছমান ও তাঁর অধীনস্থ কর্মচারী মুহাম্মদ ইবন আবী আমের আল মানসুর। আবার হিশাম নাবালক হওয়ায় প্রতিনিধিত্ব করেন তাঁর মা উত্তর স্পেনের নাভার গোত্রীয় উম্মে সুবহ । তিনি হাজীবের কর্মকান্ডকে সমর্থন করতেন।

সাকালিব গোষ্ঠীর লোকেরা আব্দুর রহমান আন নাসিরের সময়কাল থেকেই রাজদরবারের বিভিন্ন দায়িত্বে জড়িয়ে পড়ে। খলিফাগণও তাদের উপরে রাজ্য পরিচালনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে নির্ভর করতেন। এমনকি অনেক কাজ তাদের উপরে ছেড়ে দিতেন। খলিফা আল হাকামের শাসনামলে এদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। তাদের মধ্যে ফায়েক ও জুযার নামক দুই ব্যক্তি ছিল। খলিফা মৃত্যুবরণ করলে তারা বিষয়টি গোপন রাখার চেষ্টা করে এবং ক্ষমতালিপ্সু হয়ে ওঠে। অন্যদিকে নাবালক খলিফা আল হিশামের তত্ত্বাবধায়ন ও রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব হাজীবের উপরে ন্যস্ত ছিল। তারা তাঁকে হত্যার হুমকি দেয়।[৬১]

এর মধ্যে মুহাম্মদ ইবন আবী আমের তাঁর আপন শক্তিমত্তায় প্রকাশিত হন। মুহাম্মদ ইবন আবী আমের ছিলেন ইয়ামানের মুয়াফের বংশোদ্ভূত। তাঁর দাদা আব্দুল মালিক আল মুআফিরী ছিলেন তারিক ইবন যিয়াদের সৈন্যদলের একজন আরব সেনা যিনি তাঁর সাথে আনদালুসে আগমন করেছিলেন।[৬২] আর তাঁর পিতা ছিলেন রাজদরবারের একজন কর্মচারী। একারণে তিনি ছোটবেলা থেকে রাজদরবারের পরিবেশে লালিত পালিত হন।

খলিফা আল হাকাম তাঁর মৃত্যুর পূর্বে হাজিব জা'ফর ও ইবন আবী আমেরকে তাঁর পুত্রের অভিভাবক নিযুক্ত করে যান। ইবন আবী আমের ছিলেন একজন জ্ঞানী, বিচক্ষণ, সৎ ও সাহসী ব্যক্তি। তাঁর এসব

[৬১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬
[৬২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০

গুণে আল হাকাম মুগ্ধ হন। এর ফলে তিনি তাঁর উপর বিভিন্ন সময় রাজ্যের বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করেন। তাঁকে সেভিলের কাযী পদে নিয়োগ দেয়া হয়। এরপর একদল সেনাবাহিনীর দায়িত্ব দেয়া হয়। এই সেনাবাহিনী শহর রক্ষার কাজে নিয়োযিত ছিল। এরপর তাঁকে উত্তর আফ্রিকায় প্রধান বিচারকের দায়িত্ব দেয়া হয়।[৬৩]

ইবন আবী আমের তাঁর যোগ্যতায় ও সততায় রাজপরিবারের সবার বিশেষ করে আল হিশামের মা সুবহ এর সুনজর অর্জন করেন। আল হাকামও মৃত্যুর পূর্বে বিশ্বস্ততার জায়গা মনে করে তাঁকে আল হিশাম ও সম্পদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব দিয়ে যান। কিন্তু খলিফার এই ধারণা সঠিক ছিলনা। ইবন আবী আমের ছিলেন একজন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি। তিনি সবসময় রাজ্য পরিচালনার স্বপ্ন দেখতেন। নিজের যোগ্যতা ও বুদ্ধির মাধ্যমে তিনি সেই জায়গায় পৌঁছতে সক্ষম হন।

খলিফা আল হাকামের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে উত্তর দিকের চুক্তিবদ্ধ খ্রিষ্টানরা সুযোগের সন্ধান করতে থাকে। এদিকে নবনিযুক্ত খলিফা হিশাম আল মুয়াইইদ বিল্লাহ অল্পবয়স্ক হওয়ায় তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখা কষ্টকর হয়ে পড়ে। আর এই সুযোগ গ্রহন করেন ইবন আবী আমের। তিনি অন্যান্য শাসনকর্তা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মত সামরিক দক্ষতার অধিকারী ছিলেন না, এমনকি এর আগে কখনো কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও করেননি। তবুও তিনি নিজ বুদ্ধিমত্তায় ও বিচক্ষণতার বলে সেনাপতির আসন অলঙ্কৃত করে এক বাহিনী নিয়ে খ্রিষ্টানদের মোকাবিলায় রওনা হন এবং দীর্ঘ ৫২ দিন পর বিজয় ও বহু গণিমত অর্জন করে কর্ডোভায় ফিরে আসেন। এতে জনগণ তাঁর উপর অনেক সন্তুষ্ট হয়।[৬৪]

তিনি এভাবে একের পর এক জায়গায় নিজের অবস্থান সুদৃঢ় ও মানুষের ভালবাসা অর্জন করেন। তাঁর হাজীব তথা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথে যারা যারা বাঁধা ছিল তাদের সবাইকে বিভিন্নভাবে পরাহত ও ক্ষমতাচ্যুত করেন। তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হাজীব জা'ফরকে কর্ডোভার দায়িত্ব থেকে সুকৌশলে অব্যহতি দেন ও তাঁকে কারাবন্দী করে রাখেন এবং নিজে সেই জায়গায় অধিষ্ঠিত হন। হাজীবের পদ দখল করে তিনি আল মানসুর উপাধি ধারণ করেন।[৬৫]

হাজীব হওয়ার পরে ইবন আবী আমের শাসকের ভূমিকা পালন করেন এবং নাবালক খলিফা পুতুল খলিফাতে পরিণত হন। রাজ্যের সমস্ত দিক তথা রাজ্য পরিচালনা থেকে শুরু করে যুদ্ধ- বিগ্রহ পরিচালনা

---

[৬৩] ড. রাগেব আস সিরজানী, *কিস্‌সাতুল আনদালুস মিনাল ফাতহি ইলাস সুকূত*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫১

[৬৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫

[৬৫] শাওকী দ্বাইফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী 'আসরুদ দুওয়ালি ওয়াল ইমারাতিল আনদালুস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

পর্যন্ত সব ক্ষেত্রে তিনি নিজেই নির্দেশ দিতেন এবং তাঁর কথামতই সব সংঘটিত হত। তিনি এই সাম্রাজ্যকে আমিরী সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত করেন।

এই সময়কাল ছিল আনদালুসের ইতিহাসে রাজনৈতিক ও শাসনগত দিক থেকে অনেক শক্তিশালী। ৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০০৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিল এই শাসনামলের ব্যাপ্তি। হাজীব আল মানসুর রাজবংশীয় না হয়েও রাজ্য পরিচালনা ও পুনর্গঠনে অত্যন্ত সুনিপুণ দক্ষতার পরিচয় দেন। তিনি প্রথমেই সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠিত করেন। তিনি সেনাবাহিনীতে প্রচুর পরিমাণ বার্বারকে নিয়োগ দেন। এই বার্বার সেনাবাহিনী ছিল তাঁর অন্যতম বড় শক্তি। এদের উপরে তিনি চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস রাখতে পারতেন।

ক্ষমতা দখল করেই তিনি আব্দুর রহমান আন নাসিরের নির্মিত " আয যাহরা" প্রাসাদের অনুকরণে পূর্ব কর্ডোভায় আল-জাহিরা নামক এক জমকালো প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল আমিরী শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে পরিগণিত হওয়া। ৩৬৮ হিজরীতে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং ৩৭০ হিজরীতে নির্মাণ শেষ হলে হাজীব আল মানসুর সেখানে গিয়ে উঠেন। একইসাথে রাজ্যের যাবতীয় কার্যব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা সহ সবকিছুকে তিনি সেখানে স্থানান্তরিত করেন। এভাবে আল জাহিরা আনদালুসের শাসনব্যবস্থার মূল কেন্দ্রতে পরিণত হয়।[৬৬]

৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি রাজকীয় উপাধির ন্যায় হাজীব আল মানসুর উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর নিজের নামে মুদ্রা অঙ্কিত হয়। বই পুস্তক ও চিঠি-পত্রে তাঁর নাম লেখা শুরু হয়। এছাড়া মসজিদের খুতবায় খলিফা আল হিশামের পাশাপাশি তাঁর নামও উচ্চারণ করা শুরু হয়।[৬৭]

তিনি জবরদস্তি মূলক ও সুকৌশলে আনদালুসের শাসন ক্ষমতা দখল করলেও একজন যোগ্য ও দক্ষ শাসক ছিলেন। তাঁর জ্ঞান, বুদ্ধি ও দক্ষতায় আনদালুস তার রাজনৈতিক শক্তিতে অদ্বিতীয় হয়ে ওঠে। আশেপাশের খ্রিষ্টান রাজ্যগুলো যেমন লিওন, নাভার আল হিশামকে নাবালক পেয়ে আনদালুসের উপরে আবার আক্রমণের প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু তিনি তাদেরকে পরাস্ত করেন। এরপর তারা আর এই দু:সাহস দেখায়নি।

হাজীব আল মানসুর নিজে যোদ্ধা বা কোন সামরিক ব্যক্তি ছিলেন না। যুদ্ধ সম্পর্কিত কোন জ্ঞান ও তাঁর ছিল না। কিন্তু তিনি অত্যন্ত সুদক্ষতার সাথে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন। এমনকি নিজে সেনাবাহিনীর

[৬৬] ইবন উযারী, *আল বায়ানুল মাগরিব*, (বৈরুত: দারুস ছাক্বাফা, ১৯৮৩) ২য় খন্ড, পৃ. ২৭৫/ ইবন খালদুন, *তারীখু ইবন খালদুন*, (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৮৮) ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১৪৮

[৬৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯

পদও অলঙ্কৃত করেন। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি মোট ৫৪ টি যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন। এর কোনটিতেই তিনি ব্যর্থ হন নি।[৬৮]

আল মানসুরের একান্ত ইচ্ছা ছিল তাঁর যেন কোন এক যুদ্ধে শহিদী মৃত্যু হয়। এই আশায় সব সময় যুদ্ধে বের হওয়ার সময় কাফনের কাপড় সাথে রাখতেন। এই কাপড় তাঁর মেয়েরা সেলাই করে দিয়েছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষের বাড়ী ছিল টরকসে। সেই বাড়ী সংলগ্ন জমির আয় দিয়ে তিনি এই কাপড় কিনেছিলেন। কারন, তাঁর ইচ্ছা ছিল এই কাপড় হবে নিষ্কলঙ্ক যা অন্য অর্থ দিয়ে কিনলে নাও হতে পারে। তাঁর এই আশা পূরণ হয়। তিনি তাঁর জীবনের সর্বশেষ যুদ্ধে বের হন ১০০২ খ্রিষ্টাব্দে। এই যুদ্ধেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৬৯]

হাজীব আল মানসুরের মৃত্যুর পরে তাঁর সমাধির গায়ে কয়েকটি কথা লেখা হয়। তা হলো:

" তাঁর ইতিহাস লেখা আছে পৃথিবীতে যদি তা পড়ার মত চোখ আপনার থাকে। আল্লাহর শপথ। আগামী বছরগুলোতে কেউ আর তাঁর মত জন্মগ্রহণ করবে না। আমাদের উপকূল রক্ষার জন্যে আর কাউকে পাওয়া যাবেনা।"[৭০]

হাজীব আল মানসুরের মৃত্যুর পর খলিফা আল হিশাম আল মানসুরের পুত্র আব্দুল মালিককে তাঁর জায়গায় স্থলাভিষিক্ত করেন। তিনি আল মুজাফ্ফর উপাধি ধারণ করে পিতার জায়গায় আসীন হন। তিনিও তাঁর পিতার দেখানো পথ ধরে রাখতে চেষ্টা করেন এবং রাষ্ট্রের ভেতর ও বাইরের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে পিতার অনুসরণ করেন।

আব্দুল মালিক আল মুজাফ্ফর তাঁর পিতার ন্যায় বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত ছিলেন। এজন্যে আল আনদালুসের জনগণ তাঁকে অনেক পছন্দ করত এবং তাঁকে বিভিন্ন উপাধি দিয়েছিল। এসব গুণের মাধ্যমে তিনি সবার মন জয় করতে সক্ষম হন।

পিতা হাজীব আল মানসুর ও অন্যান্য পূর্ববর্তী আনদালুসীয় খলিফাগণের মত তাঁর ও প্রধান কাজ ছিল আশে পাশের খ্রিষ্টান রাজ্যের পরাশক্তিকে প্রতিহত করা। তিনি বেশ কিছু অভিযান পরিচালনা করেন। প্রথমে তিনি মদীনাতুস সালিমে গমন করেন ও সেনাবাহিনীকে সংঘবদ্ধ করেন। এরপর সেখান থেকে তিনি

[৬৮] ড. রাগেব আস সিরজানী, *কিস্‌সাতুল আনদালুস মিনাল ফাতহি ইলাস সুকূত*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬৭
[৬৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২
[৭০] নজরুল ইসলাম, *ইতিহাস বিখ্যাত মুসলিম বীরগণ*, (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ২০০০), পৃ. ১২৫

বার্সেলোনা অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানে খ্রিষ্টানদের সাথে মুসলিম বাহিনীর বিশাল এক যুদ্ধ হয়।যুদ্ধে খ্রিষ্টানরা পরাজিত হয়। তাদের অনেক দূর্গ মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হয়।[৭১]

এরপরে তিনি আরো অভিযান পরিচালনা করেন। এর মধ্যে অন্যতম ছিল উত্তর দিকের খ্রিষ্টানদের বিরূদ্ধে অভিযান।এখানেও মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করে।এ যুদ্ধে থাকাকালীন সময়ে তিনি অনেক অসুস্থ হয়ে পড়েন।অবশেষে কর্ডোভাতে ফেরার পথে ৩৯৯ হিজরী তথা ১০০৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৭২]

তাঁর মৃত্যুর পরে আনদালুসের শাসনব্যবস্থা দূর্বল হয়ে পড়ে ও বহুমুখী বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।এছাড়াও মূল খলিফা হিশাম রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে খুব বেশি আগ্রহী ছিলেন না। এজন্যে তিনি সবসময় হাজীবদের উপরে নির্ভর করতেন। ফলে আব্দুল মালিক ইবন আল মানসুর যখন মৃত্যুবরণ করলেন তখন তিনি তাঁর ভাই আব্দুর রহমান ইবন মানসুরকে হাজীব হিসেবে মনোনীত করেন।

আব্দুর রহমান ছিলেন তাঁর পিতা ও ভাইয়ের বিপরীত। তিনি ছিলেন মদ্যপ ও ফাসিক ব্যক্তি। এ কারণে মানুষ তাকে অপছন্দ করত। এছাড়াও তাঁর মা নাভার গোত্রীয় খ্রিষ্টান বংশোদ্ভূত হওয়ায় এটা তাঁর উপরে প্রভাব ফেলে।[৭৩] তাঁর এসমস্ত কার্যকলাপের কারণেই রাজ্য পরিচালনা শিথিল হয়ে আসে ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে শুরু করে। তিনি এমন সব কার্যকলাপ শুরু করেন যা আনদালুসের কোন শাসকই কখনোই করেন নি। ফলে মানুষজনের কাছে তাঁর অগ্রহণযোগ্যতার মাত্রা আরো বেড়ে যায়।

এমন সময় তিনি খলিফা হিশামকে দিয়ে নিজেকে খিলাফতের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী বানানোর জন্যে চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন। তখন জনতা রাগে ও বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ও রাজদরবারে গিয়ে খলিফার কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে বানু উমাইয়ারই এক ব্যক্তি মুহাম্মদ ইবন হিশাম ইবন আব্দুল জাব্বার ইবন আব্দুর রহমান আন নাসিরকে উক্ত আসনে স্থলাভিষিক্ত করে। তিনি আব্দুর রহমান আন নাসিরের বংশেরই ছিলেন। মুহাম্মদ ইবন হিশাম আল মাহদী উপাধি গ্রহণ করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন এবং তার পরপরই আব্দুর রহমান ইবন মানসুর নিহত হন।[৭৪]

মুহাম্মদ ইবন হিশাম আল মাহদী শাসক হিসেবে যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন না। তিনি এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যার ফলে রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে বিশৃঙ্খলা পূর্ণতা পায়। তিনি বহু সংখ্যক আমিরীকে হত্যা করেন, অনেককে বিশেষ করে আমিরী ও বার্বারদেরকে সেনাবাহিনী থেকে অপসারণ

[৭১] রাগেব আস সিরজানী, *কিস্‌সাতুল আনদালুস মিনাল ফাতহি ইলাস সুকূত*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৯
[৭২] ইবনুল উযারী, *আল বায়ানুল মাগরিব*, (বৈরুত: দারুস ছাক্বাফা, ১৯৮৩) ৩য় খন্ড, পৃ. ২৭
[৭৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
[৭৪] রাগেব আস সিরজানী, *কিস্‌সাতুল আনদালুস মিনাল ফাতহি ইলাস সুকূত*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯১

করেন। ফলে তারা একজোট হয়ে তাঁর বিরূদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারা সুলাইমান ইবনুল হাকাম ইবন সুলাইমান ইবন আব্দুর রহমান আন নাসিরকে আল মুসতাঈন বিল্লাহ উপাধি দিয়ে তাঁর নেতৃত্বকে স্বীকার করে। ফলে সুলাইমান ও মুহাম্মদের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়।[৭৫]

খলিফা আল মাহদীর শক্তি- সামর্থ্যের তুলনায় সুলাইমানের শক্তি- সামর্থ্য ছিল দূর্বল। ফলে তিনি উত্তরের খ্রিষ্টান রাজ্যগুলোর সহায়তা কামনা করেন। তারা এতদিন এ ধরনের সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। ফলে আল মাহদীর বিরূদ্ধে যুদ্ধ করতে তারা সুলাইমানকে সাহায্য করে। এ যুদ্ধে মাহদী পরাজিত হন এবং সুলাইমান আনদালুসের সিংহাসনে আরোহন করেন। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আল মাহদী পলায়ন করেন এবং তুলাইতালাতে পৌঁছেন। নিরুপায় হয়ে তিনি তাঁর চিরশত্রু আমিরী গোত্রের এক যুবকের শরণাপন্ন হন এবং রাজ্য উদ্ধারে তার সাহায্য কামনা করেন। তিনি তাকে নতুন করে সব শুরু করার প্রতিশ্রুতি দেন। তারা দু'জনে বার্সেলোনার আমীরের সাহায্য কামনা করেন। সে তাঁদেরকে বেশ কিছু শর্ত সাপেক্ষে বিশেষ করে মদীনাতুস সালিম হস্তান্তরের শর্তে সাহায্য করতে রাজি হয়। মাহদী শর্ত মেনে নেন এবং এভাবে পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করে সুলাইমানের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করেন ও বিজয় লাভ করে হারানো রাজ্য উদ্ধার করেন।[৭৬]

সুলাইমান ইবনুল হাকাম ১০১২ খ্রিষ্টাব্দে পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তাঁর মূল চালিকাশক্তি ছিল র্বাবার গোষ্ঠী। এসময় বার্বাররা তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে। তারা ক্ষমতায় আসীন হওয়ার জন্যে তাদের আলী ইবন হামুদ নামক এক ব্যক্তিকে দিয়ে হিশাম ইবন হাকামের বরাত দিয়ে লেখা এক চিঠি সহ সুলাইমানের দরবারে পাঠায় এবং বলে হিশাম তাকে খিলাফতের জন্যে অসিয়ত করে গেছেন। এরপর ১০১৬ খ্রিষ্টাব্দে সুলাইমানের সাথে আলী ইবন হামুদ ও বার্বারদের যুদ্ধ হয়। সুলাইমান পরাজিত হন ও হামুদ সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি আন নাসির বিল্লাহ উপাধি গ্রহণ করেন ও কর্ডোভায় হাম্মাদী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।[৭৭]

আমিরীগন এটা মেনে নিতে পারেনি। তারা আব্দুর রহমান আন নাসিরের এক বংশধর আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে তাঁকে খলিফা হিসেবে মনোনীত করে। তিনি আল মুরতাদী বিল্লাহ উপাধি ধারণ করেন।[৭৮] তাঁরা ক্ষমতা ফিরিয়ে আনার জন্যে কর্ডোভা অভিমুখে রওনা হন। কিন্তু পতিমধ্যে আমিরীদের এক ব্যক্তি আব্দুর রহমানের ক্ষমতার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে এবং জনবল নিয়ে তাঁর বিরূদ্ধে যুদ্ধ করে তাঁকে হত্যা করে।

---

[৭৫] ইবন খালদুন, *তারীখু ইবন খালদুন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

[৭৬] রাগেব আস সিরজানী, *কিস্সাতুল আনদালুস মিনাল ফাতহি ইলাস সুকূত*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯৮

[৭৭] লিসানুদ্দীন ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, (বৈরুত: দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১৯৫৬)পৃ. ১২১

[৭৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০

এদিকে সাকালিবদের কিছু লোক আলী ইবন হামুদের বিরূদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাঁকে হত্যা করে। তাঁর ভাই কাসিম ইবন হামুদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু তাঁর ভাইয়ের ছেলে ইয়াহইয়া ইবন আলী তাঁর বিরূদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।[৭৯] এভাবে একের পর এক আনদালুসে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলতে থাকে ।

১০৩১ খ্রিষ্টাব্দে কর্ডোভার নেতৃস্থানীয় ও জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ এসব বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ থেকে দেশকে রক্ষার জন্যে একজোট হন। তাঁদের নেতা ছিলেন আবুল হাজম ইবন জহুর। তিনি রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি শাসনকার্য পরিচালনার জন্যে মজলিসে শুরা গঠন করেন। তবে এটার কার্যক্রম শুধু কর্ডোভাতেই অব্যাহত ছিল। ফলে আনদালুসের অন্য এলাকাগুলো ভাগ হয়ে যায় এবং যার যার ইচ্ছা মত চলতে থাকে।[৮০]

[৭৯] রাগেব আস সিরজানী, *কিস্‌সাতুল আনদালুস মিনাল ফাতহি ইলাস সুকূত*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০২
[৮০] ইবন খালদুন, *তারীখু ইবন খালদুন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম পরিচ্ছেদ

স্পেনে মুসলিম শাসনের পতন

স্পেনে মুসলমানদের গৌরবোজ্জল শাসনের পতনের সূচনা হয় মূলত স্বাধীন উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় হিশামের সময় থেকেই। তাঁর সময়েই মূলত উমাইয়া শাসনব্যবস্থায় ফাটল ধরে এবং হাজীব আল মানসুরের মাধ্যমে আমিরী শাসকবংশের উদ্ভব হয়। এতদসত্ত্বেও হাজীব আল মানসুর ছিলেন একজন যোগ্য শাসক। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে মুসলিম স্পেন তথা আনদালুসের দায়িত্ব নেয়ার মত কোন যোগ্য নেতার আবির্ভাব ঘটেনি। উপরন্তু সবাই ছিল ক্ষমতা ও সিংহাসনের প্রতি লোভী। যার ফলে নিজেদের মধ্যেই বিবাদ- বিশৃঙ্খলা লেগে যায়। আনদালুস ভেঙ্গে অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এসব রাজ্যকে মুলুকুত তাওয়ায়েফ বলা হত।এসব রাজ্যে আরব- অনারব সবাই শাসক হয়ে উঠেছিল। যেমন আরব শাসকদের মধ্যে ছিলেন কর্ডোভার বানু জাওহার, মালাগা ও আলজেসিরাসের বানু হাম্মাদ, সারাগোসার বানু হুদ ও সেভিলের বানু আব্বাস। গ্রানাডার বানু জিরি ও টলেডোর বানু জুন্নুন ছিলেন বার্বার শাসক ও দক্ষিণ-পূর্ব স্পেনের আলমেরিয়ার খাইরান, মুরসিয়ার জুহাইর, দেনিয়ার মুওয়াহিদ ও অন্য শাসকরা ছিলেন স্লাভ।[৮১]

আনদালুস এভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ায় অভ্যন্তরীণ শক্তি দূর্বল হয়ে পড়ে। এছাড়াও মুলুকুত তাওয়ায়েফের নেতারাও নিজেদের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এর সুযোগ গ্রহণ করে আশে পাশের খ্রিষ্টান রাজ্যগুলো। এই দূর্বলতার সুযোগে তারা ক্ষমতা প্রয়োগের পরিকল্পনা করে এবং অনেক রাজ্য থেকে কর আদায় করা শুরু করে।

এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রাজা ৬ষ্ঠ আলফেন্সো। তিনি ১০৮৫ সালে কৌশলে টলেডো দখল করেন ও নিজেকে মুলুকুত তাওয়ায়েফের কলহ-বিবাদের মিমাংসাকারী রূপে উপস্থাপন করেন। এটা ছিল মূলত তাঁর মুখোশ। এই সহায়তার অন্তরালে তিনি সমগ্র স্পেনকে আয়ত্বে আনার পরিকল্পনা করেন। অভ্যন্তরীণ কলহের সুযোগ নিয়ে তিনি একদলকে আরেকদলের বিরূদ্ধে লাগিয়ে দেন। মুযারাবদের সাহায্যে ৪০০০

[৮১] ইমামুদ্দীন, এস এম, *এ পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অব মুসলিম স্পেন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০

সৈন্য নিয়ে তিনি সেভিলের বিরূদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। সেভিল, গ্রানাডা, বাদাযোজ ও অন্যান্য এলাকার মুসলমানরা যখন বুঝতে পারলেন যে খ্রিষ্টানরা এভাবে মুসলিম এলাকা দখলের পরিকল্পনা করেছে তখন তাঁরা একজোট হয়ে তাদের মোকাবিলা করতে সচেষ্ট হলেন। কিন্তু তার মুযারিবদের সাথে মিলিত হওয়ায় মুসলিম বাহিনীর শক্তির প্রয়োজন হয়। তাঁরা মরক্কোর মুরাবিতীন শাসক ইউসুফ ইবন তাশফীনের শরণাপন্ন হলে তিনি তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন এবং আলফেন্সোর বাহিনী পরাজিত হয়।[৮২]

তবে ইউসুফ ইবন তাশফীনের কাছ থেকে সাহায্য লাভ স্পেনীয় শাসকদের জন্যে দূর্ভাগ্য বয়ে আনে। তিনি স্পেনীয় শাসকদের মধ্যে অনৈক্য ও বিবাদ দেখে অসন্তুষ্ট হন এবং এক বিশাল এলাকা নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেন। এর ফলে আনদালুসে মুরাবিতীনদের শাসনামলের সূচনা হয়।[৮৩]

তাদের অধীনে বেশ কয়েক বছর আনদালুসের অবস্থা স্থিতিশীল থাকে। কিন্তু পরক্ষনেই ১১১৮ খ্রিষ্টাব্দে সারাগোসা আলফেন্সোর দখলে চলে যায়। এর মধ্যে মুওয়াহিদুন নামে আরেক গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। এদের হাতে মুরাবিতীনদের পরাজয় ঘটে এবং স্পেনে মুওয়াহিদুন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। মুওয়াহিদুনদের নেতা ছিলেন মুহাম্মদ ইবন তুমারত। তাঁর মরক্কোর পাহাড়ী এলাকায় আল্লাহর একত্ববাদের প্রচার করতেন বলে তাঁদেরকে মুওয়াহিদুন বলা হত।তাঁরা স্পেনের শাসনক্ষমতা হাতে নিয়ে হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। এরপরেও বিভিন্ন জায়গায় বিদ্রোহ লেগেই থাকে। ৬২০ হিজরীতে আল মামুন আল মুওয়াহিদী শাসক হন। এই সময় থেকে বিদ্রোহ নতুন আকার ধারণ করে। এসময় বেশ কিছু বিদ্রোহী নেতা কিছু কিছু এলাকার স্বাধীনতা ঘোষণা করে। বিদ্রোহী নেতারা এলাকাগুলো দখল করে নিজেদের অধীনে আনা শুরু করে। ১২৩০ খ্রিষ্টাব্দে নবম আলফেন্সোর মৃত্যুর পরে তাঁর রাজ্য তৃতীয় ফার্ডিন্যান্ডের অধীনস্থ ক্যাস্টাইলের সাথে যোগদান করে। ফার্ডিন্যান্ড ছিল আরাগনের রাজা। সে ক্যাস্টাইলের রাজকুমারী ইসাবেলাকে বিয়ে করায় খ্রিষ্টানদের শক্তিমত্তা আরো বৃদ্ধি পায়। ১২৩২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে তিনি মুসলিম সাম্রাজ্যের বিরূদ্ধে অভিযান পরিচালনা শুরু করেন। ১২৩৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কর্ডোভা ও ১২৪৮ খ্রিষ্টাব্দে সেভিল দখল করেন। এই শতাব্দীর শেষভাগ অবধি গ্রানাডা ছাড়া বাকি সব এলাকা তারা দখল করে নেয়।

এসময় গ্রানাডার শাসনের ভার ন্যস্ত ছিল বনু আহমার গোত্রের উপরে। এই গোত্র বিখ্যাত সাহাবী সা'দ ইবন উবাদাহ এর নাতি মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ ইবন নাসর এর সাথে সম্পৃক্ত। তিনি ইবন আহমার নামে পরিচিত ছিলেন এবং আল গালিব বিল্লাহ উপাধি ধারণ করেন। তিনি গ্রানাডায় বনু আহমার তথা নাসরীয় রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের ২১ জন সুলতান ১২৩২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪৩২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

---

[৮২] হিট্টি, পি. কে. *হিস্ট্রি অব দ্যা অ্যারাবস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪০

[৮৩] শাওকী দ্বাইফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী 'আসরুদ দুওয়ালি ওয়াল ইমারাতিল আনদালুস* , প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

এবংশের ১৯ তম শাসক ছিলেন আলী আবুল হাসান। তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব ছিল। এরই সুযোগ নেয় ফার্ডিন্যান্ড। তাঁর পুত্র আবু আব্দুল্লাহ বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং বেশ কিছু লোকের সমর্থন নিয়ে ১৪৮২ সালে আল হামরা প্রাসাদ দখল করে। ফার্ডিন্যান্ড তাকে গ্রানাডা দখলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে এবং তাকে আল হামরার চাবি সমর্পণ করতে বাধ্য করায়। তারা মুসলমানদের ও মসজিদ-মাদ্রাসা, লাইব্রেরী সহ সবকিছুর প্রতিরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু তা পালন করেনি। তারা মুসলমানদের রাজ্য থেকে বিতাড়ন, হত্যাযজ্ঞ ইত্যাদি শুরু করে এবং তাঁদেরকে "মুদজিনীন" বা মরিস্কো নামে আখ্যায়িত করে।[৮৪] আবু আব্দুল্লাহ নিরূপায় হয়ে সব এলাকা তাদের কাছে সমর্পণ করে ও রাজ্য ছেড়ে চলে যায়। যখন খ্রিষ্টানরা দেখে যে আর কোন ধরনের আক্রমণের শঙ্কা নেই তখন তারা ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে গ্রানাডায় প্রবেশ করে সর্বময় কর্তৃত্ব হাতে নিয়ে নেয় এবং মুসলমানদের উপরে নির্যাতনের স্টিম রোলার চালানো শুরু করে। তারা লাইব্রেরীগুলোর দিকে হাত বাড়ায় এবং আরবী বইগুলো আগুনে পুড়িয়ে দেয়। এভাবে তারা মুসলিম স্পেনকে ইসলাম শূন্যের পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞান শূন্য করতে শুরু করে।

১৫০১ খ্রিষ্টাব্দে এক রাজকীয় আদেশবলে গ্রানাডায় থেকে যাওয়া মুসলমানদেরকে জোরপূর্বক খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করার আদেশ জারি করা হয়। এবং এই ধর্ম গ্রহণ না করার অপরাধে ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে তাদেরকে স্পেন থেকে বহিষ্কারের আদেশ জারি করা হয় এবং তাদেরকে বিতাড়ন করা হয়।[৮৫]

এভাবে মুসলিম স্পেন তথা আনদালুসে মুসলমানদের প্রায় ৮০০ বছরের গৌরবোজ্জ্বল শাসনের পতন হয়।

[৮৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

[৮৫] ইমাম উদ্দিন, এস. এম. *পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অব মুসলিম স্পেন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১-৩৩২

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম পরিচ্ছেদ

স্পেনীয় সভ্যতায় মুসলমানদের অবদান

ইসলামের আগমনের পূর্বে স্পেনের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। শুধু স্পেনই নয়, সমগ্র ইউরোপ তখন ছিল অজ্ঞতার, বর্বরতার গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। এই অবস্থা থেকে উত্তোলনের জন্যে তাদের মধ্য থেকে কেউই ত্রাতারূপে আসেনি। বরং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রতি তাদের তীব্র বিরূপ মনোভাব ছিল।আর স্বভাবতই জ্ঞানের অভাবই তাদেরকে সভ্যতা বিবর্জিত এক জাতিতে পরিণত করেছিল।

ঠিক এমন সময় সেখানে মুসলমানদের আগমন ছিল তাদের জন্যে আশীর্বাদস্বরূপ। দীর্ঘ ৮০০ বছরের শাসনামলে মুসলমানরা স্পেনের চিত্র পুরোপুরি পাল্টে দেন। সেখানে অনেক বড় বড় সভ্য নগরী গড়ে ওঠে যেগুলোকে আজো সভ্যতার সুতিকাগার হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্যসহ সব দিক দিয়ে স্পেন হয়ে ওঠে এক অনন্য আদর্শ নগরী। মুসলিমরা এর নামকরণ করে আল আনদালুস নামে।

সকল ক্ষেত্রেই মুসলমানদের অবদান ছিল অনস্বীকার্য। যেমন:

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা:

স্পেনের অবহেলিত অজ্ঞ মানুষদের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটানোতে মুসলমানদের অবদান ছিল অপরিসীম। এসময়ে মুসলমানরা স্পেনে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারে যে পরিমান অবদান রেখেছিলেন তা সমসাময়িক ইউরোপে আর কেউ রাখতে সক্ষম হয়নি।

এসময়ে আনদালুসে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়, লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। এসমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন এলাকা যেমন ফ্রান্স, জার্মানি, ইংল্যান্ড থেকে শিক্ষার্থীরা আগমন করত।

শিক্ষার প্রসারে ২য় হাকামের আমলকে স্বর্ণযুগ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এসময়ে জ্ঞান- বিজ্ঞান ও সভ্যতার মূল কেন্দ্র ছিল কর্ডোভা। ২য় হাকাম কর্ডোভা মসজিদ প্রাঙ্গনে তাঁর পিতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়কে আরো সম্প্রসারিত করেন। সেখানে বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান চর্চার জন্যে আসত।

ভাষা ও সাহিত্যঃ

মুসলমানদের আগমনের ফলে আনদালুস আরবী ভাষা ও সাহিত্যের মাধুর্যের সাথে পরিচিত হয়। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সেখানে এ ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রযাত্রা শুরু হয়।আরবী ভাষা ও সাহিত্যে আকৃষ্ট হয়ে স্পেনীয়রাও এ ভাষায় সাহিত্য চর্চায় আগ্রহী হয়। এই সুদীর্ঘ শাসনামলে আনদালুস অনেক প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও সাহিত্যিকের জন্ম দেয় যাদের আরবী সাহিত্যে অবদান অপরিসীম।

এসময়ে প্রচুর গ্রন্থ আরবী থেকে অন্য ভাষায় এবং অন্য ভাষা থেকে আরবীতে অনুদিত হয়। এর ফলে ভাষা শেখার গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়।আরবী ভাষাকে পুঁজি করে বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থ রচনা শুরু হয। যেমন হিব্রু ব্যকরণের মূল ভিত হিসেবে আরবী ব্যকরণকে গণ্য করা হয়। [৮৬]

মুসলিম আনদালুসে আরবী সাহিত্যের চর্চা উল্লেখযোগ্যহারে লক্ষণীয়।এসময় অনেক স্বনামধন্য সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়। এদের মধ্যে অন্যতম প্রতিভাবান সাহিত্যিক ছিলেন ইবন আব্দি রাব্বিহ, যার "আল ইকদুল ফারীদ" জগদ্বিখ্যাত। এছাড়াও মু'তামাদ ইবনুল আব্বাদ, লিসানুদ্দীন ইবনুল খতীব, ইবন যায়দুন প্রমুখ ছিলেন আনদালুসের প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের দলভুক্ত।

এছাড়াও এসময়ে সাহিত্যে বেশ কিছু নতুন ধারাও আবিষ্কৃত হয়। এসব নতুন ধারায় স্পেনের নিজস্ব সংস্কৃতির সাথে আরবী ভাষা ও সংস্কৃতি একীভূত হয়।

লাইব্রেরীঃ

আনদালুসে লাইব্রেরীর অগ্রযাত্রা শুরু হয় দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের শাসনামলের শুরুতেই। এসময়ে কর্ডোভাতে একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে এটা মুসলিম বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত লাইব্রেরীতে পরিণত হয়। খলিফা ৩য় আব্দুর রহমান একে সম্প্রসারণ করেন। ২য় হাকাম তাঁর রাজত্বকালে

[৮৬] হিট্টি, পি. কে. *হিস্ট্রি অব দ্যা অ্যারাবস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৭

রাজপরিবারের ৩টি লাইব্রেরী একত্রিত করে ৬০০০০০০ গ্রন্থের সমাহারে এক বিশাল লাইব্রেরীতে পরিণত করেন।[৮৭]

এই লাইব্রেরীর বইগুলো হস্ত-লিখিত ছিল। কেই যদি কোন বই কপি করার ইচ্ছা করতেন তখন ঐ লেখককে বললে তারা তা থেকে আবার কপি করে দিতেন। এসব বই আবার বিভিন্ন এলাকা থেকে লোক দিয়ে সংগ্রহ করে আনা হত।

লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠায় অন্যান্য এলাকাও পিছিয়ে ছিল না। গ্রানাডায় অনেক গুলো লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। এদের মধ্যে বানু যুবাইদি, ইবন ফুরকান প্রমুখের লাইব্রেরীগুলো অন্যতম।

স্থাপত্য শিল্পঃ

স্থাপত্যশিল্পে মুসলিম স্পেন নৈপুণ্যের সাক্ষর রাখে। বিশেষ করে স্পেনীয় উমাইয়া শাসকদের আমলে এ বিষয়ে চরম উৎকর্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। এসময়ে আনদালুসে অনেক মসজিদ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, নগরী, ইমারত ইত্যাদি গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে অন্যতম ছিল কর্ডোভা, গ্রানাডা, সেভিল প্রভৃতি নগরী ও তার স্থাপত্যশিল্প।

কর্ডোভাঃ

কর্ডোভা নগরীর অবস্থান ছিল গুয়াডালকুইভির নদীর দক্ষিণ তীরে। এটা দেখতে অনেকটা অর্ধবৃত্তাকার রঙ্গমঞ্চের মত ছিল।[৮৮] মুসলমানরা সাধারণত কোন এলাকা বিজয়ের পরে মসজিদ কেন্দ্রিক শহর নির্মাণ করতেন। কর্ডোভার বেলাতেও তাই ঘটে। এর উত্তর প্রান্তে ১ম আব্দুর রহমান রুসাফা নামক এক উদ্যান প্রাসাদ নির্মান করেন।

ধীরে ধীরে কর্ডোভা নগরী এক সমৃদ্ধশালী সুপরিকল্পিত নগরী ও সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে ওঠে। এর নির্মাণে উমাইয়া, আব্বাসী ও স্থানীয় স্থাপত্যরীতি অনুসরণ করা হয়। কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলে আখ্যায়িত করা হত।

---

[৮৭] ইমাম উদ্দিন, এস. এম. *সাম অ্যাসপেক্ট অব দ্যা সোশিও ইকোনমিক এন্ড কালচারাল হিস্ট্রি অব মুসলিম স্পেন ৭১১-১৪৯২*, (লেইডেন: ই. জে. ব্রিল, ১৯৬৫), পৃ. ১৪০

[৮৮] আমীর আলী, সৈয়দ, *শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিনস*, (নিউ ইয়র্ক: দ্যা ম্যাকমিলান এন্ড কো., ১৯৬৯), পৃ. ৫০৫

কর্ডোভার অন্যতম প্রধান স্থাপত্যের নিদর্শন ছিল কর্ডোভা মসজিদ। ৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে আব্দুর রহমান আদ দাখিল এই মসজিদের কাজ শুরু করেন এবং তাঁর পুত্র হাকাম এর কাজ ৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে শেষ করেন। অন্যান্য শাসকরা একে সম্প্রসারণ ও সৌন্দর্যমন্ডিত করেন।

এ মসজিদটি ছিল উক্ত সময়ের এক উল্লেখযোগ্য শৈল্পিক নিদর্শন।তৎকালীন সময়ের এমন কোন কারুকাজ ছিলনা যেটা এখানে নিয়ে আসা হয়নি। এর নির্মাণ ও সৌন্দর্য্যবর্ধনে কাঠ, হাতির দাঁত, সোনা, মোজাইক পাথর ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। এতে স্তম্ভ নির্মাণে রোমান, খিলানে সিরিয়া, মোজাইকে বাইজানটাইন ও প্রাচীর নির্মাণে পারস্যকে অনুকরণ করা হয়।[৮৯]

মদীনাতুয যাহরাঃ

আনদালুসীয় আরবদের স্থাপত্যের আরেকটি অন্যতম নিদর্শন ছিল মদীনাতুয যাহরা। ৩য় আব্দুর রহমান আন নাসির তাঁর স্ত্রী আয যাহরার স্মৃতি ধরে রাখতে এটা নির্মাণ করেন।এর অবস্থান ছিল কর্ডোভা থেকে প্রায় চার মাইল দূরে জাবালুল উরুস উপত্যকায়।এটা ছিল ৪০ হেক্টর জায়গার উপর নির্মিত এক ধরনের অবকাশ যাপন কেন্দ্র যেটা ছিল একটি রাজপ্রাসাদ, একটি হেরেম, একটি প্রাচীর বেষ্টিত প্রাসাদ ও কয়েকটি ভবন ও চত্বরের সমন্বিত রূপ।[৯০] এই এলাকার মনোরম নৈসর্গিক পরিবেশের কারণে তিনি একে এই নির্মাণকাজের জন্যে বেছে নেন। ৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে এর নির্মাণকাজ শুরু হয় এবং তা তাঁর পুত্র ২য় হাকামের আমলে সমাপ্ত হয়।

মদীনাতুয যাহরার নির্মাণসামগ্রী বিভিন্ন দেশ যেমন রোম, কার্তেজ, তিউনিস, সিরিয়া প্রভৃতি এলাকা থেকে সংগ্রহ করা হয়। এটা মুসলিম সভ্যতা ও স্থাপত্য শিল্পের উজ্জল নিদর্শন বহন করে। বিভিন্ন মণি-মুক্তা, পাথর, স্বর্ণ ইত্যাদি দিয়ে এর সৌন্দর্যবর্ধন করা হয়।

মদীনাতুয যাহরায় ৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে একটি মসজিদ নির্মিত হয়। তৎকালীন অন্যান্য আরব মসজিদের ন্যায় এতেও বিভিন্ন ধরনের পাথর দিয়ে কারুকাজ করা হয়।

তবে এই সমৃদ্ধশালী শৈল্পিক নগরী বেশি দিন টিকেনি। মুসলিম শাসনের শেষ দিকে বার্বারদের আক্রমণে এটা ধ্বংসের প্রান্তে এসে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় ফিলিপের শাসনামলে এটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

---

[৮৯] ইমাম উদ্দিন, *এস. এম. সাম অ্যাসপেক্ট অব দ্যা সোশিও ইকোনমিক এন্ড কালচারাল হিস্ট্রি অব মুসলিম স্পেন ৭১১-১৪৯২*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮

[৯০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮

আল- হামরাঃ

স্পেনীয় মুসলিম শিল্পের আরেকটি উজ্জলতম নিদর্শন হল আল-হামরা প্রাসাদ।এটা প্রথম নাসিরীয় শাসক প্রথম মুহাম্মদ নির্মাণ করেন। এর অবস্থান ছিল গ্রানাডার দক্ষিণে সাবিকা পাহাড়ের উপরে। পরবর্তীতে তাঁর পুত্ররা এর সৌন্দর্য্যবর্ধন ও নির্মাণকাজ সমাপ্ত করেন।

১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে রাজা ফার্ডিন্যান্ড গ্রানাডা দখল করার পরে এই প্রাসাদ সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সম্রাট ৫ম চার্লস এর পুন:নির্মাণ করে ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে এখানে বসবাস করা শুরু করেন। পরে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট স্পেন আক্রমণ করে এই প্রাসাদকে তার সেনাবাহিনীর ব্যারাকরূপে ব্যবহার করেন। পরবর্তীতে রাজা ৭ম ফার্ডিন্যান্ড এর সংস্কার করেন এবং ১৮৭০ সালে একে স্পেনের জাতীয় ইমারতের মর্যাদা দেয়া হয়। বর্তমানে প্রাসাদটি স্পেনের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে রয়েছে।[৯১]

আল হামরার বাইরের দিক ছিল অত্যন্ত সাদামাটা, কিন্তু ভেতরের দিক ছিল খুবই আকর্ষণীয়। এর দেয়াল গুলো বিভিন্ন নকশায় অলঙ্কৃত ছিল। আরবদের এই দেয়াল অলঙ্করণের মূল উপাদান ছিল চুন ও বালির মিশ্রিত প্রলেপ।

[৯১] হিট্টি, পি. কে. *হিস্ট্রি অব দ্যা অ্যারাবস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৫

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্পেনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য
ও
মুসলিম স্পেনের আরবী গদ্য ও পদ্য

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ
স্পেনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

আনদালুসের সাহিত্যে, শিল্পে, সংস্কৃতিতে সামগ্রিক অবস্থা ছিল খুবই অনুকূল। এসময় সেখানে ভাষা বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন সহ বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত ও অনুদিত হয়। অনেক লাইব্রেরী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এছাড়াও দীর্ঘ প্রায় ৮০০ বছরের মুসলিম শাসনামলে আনদলুসে অগণিত মুসলিম ঐতিহাসিক স্থাপত্য স্থাপিত হয়।

আনদালুসে যখন উমাইয়া শাসনের গোাড়াপত্তন হয় সে সময় আব্বাসী আমলে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের জন্যে ছিল স্বর্ণযুগ। স্বভাবতই এর প্রভাব সুদূর আনদালুসে এসেও পড়েছিল। এর পেছনে আমীর- ওমরাহ, শাসকশ্রেণীর অবদান অনেক বেশি ছিল। তাঁরা নিজেরা জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা করতেন, মানুষকে দিয়ে চর্চা করাতেন এবং এ ব্যাপারে উৎসাহ- অনুপ্রেরণা প্রদান করতেন। এরকম আরো বিভিন্নভাবে অবদান রেখে তাঁরা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে অনেক সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

কুরআন-হাদীসের চর্চা তাঁদের কাছে প্রশংসনীয় একটি বিষয় ছিল। আনদালুসের বেশিরভাগ মানুষ মালেকী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।[৯২] ফলে সেখানে মাযহাব কেন্দ্রিক চর্চাও ভালোভাবেই হত। একই সাথে দর্শন চর্চাকে আনদালুসে নিরুৎসাহিত করা হত। যদি কেউ চর্চা করতেন তাঁকে যিনদীক উপাধী দেয়া হত। তাঁর গ্রন্থগুলো পুড়িয়ে ফেলা হত এবং শাস্তি স্বরূপ তাঁকে নির্বাসনেও পাঠানো হতো।

[৯২] ড. মুহাম্মদ আব্দুল মুন'ইম খাফাজী, *আল আদাবুল আনদলুসী তাতাউর ওয়া তাজদীদ*, (বৈরুত: দারুল জীল, ১৯৯২) পৃ: ২০৭

লাইব্রেরী ছিল আনদালুসের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মূল ভান্ডার। আব্বাসীয় শাসকরা যখন প্রাচ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে জন্যে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করলেন সেই একই ধাঁচে আনদালুসে উমাইয়া শাসকরাও লাইব্রেরী স্থাপন শুরু করেন। আনদালুসে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৬০ টি লাইব্রেরী ছিল। এদের মধ্যে কর্ডোভা লাইব্রেরী ছিল প্রসিদ্ধ।[৯৩] এসব লাইব্রেরীতে বিভিন্ন অনুদিত বই সহ আনদালুসের রচিত গ্রন্থগুলো সংরক্ষণ করে রাখা ছিল।

আনদালুসের সাহিত্য ছিল তার সংস্কৃতির একটি বড় অংশ। সাহিত্যের প্রসারে দেশের রাজন্যবর্গসহ সব স্তরের মানুষ এতে ভূমিকা রাখেন। রাজপ্রাসাদে কবিদের জন্যে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা থাকত। এসবের মধ্যে অন্যতম একটি ছিল মজলিস ব্যবস্থা। এই সাহিত্যের মজলিস ছিল সাহিত্য চর্চার এক অন্যতম জায়গা।

স্পেনীয় শাসক ইবন আবী আমেরের দরবারে সাহিত্যের এক মজলিস ছিল যেখানে প্রতি সপ্তাহে সাহিত্যিক ও জ্ঞানী- গুণী মানুষের আগমন ঘটত।[৯৪]

আনদালুসের সংস্কৃতির একটি অন্যতম অংশ ছিল গান- বাজনা। প্রথম আব্দুর রহমানের সময়কাল থেকেই মূলত গান-বাজনা প্রীতি পরিলক্ষিত হয়। পরে তাঁর পুত্র প্রথম হিশামের আমলে তা আরো বিস্তৃত হয়। তাঁর রাজসভায় আল-আব্বাস, আন নাসা'ঈ, আল মানসুর, আলুন ও যারকূন নামক পাঁচজন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে আল আব্বাস হিশামের রাজসভার প্রধান সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন।

আনদালুসের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন যিরয়াব। তাঁর প্রকৃত নাম আবুল হাসান আলী ইবন নাফি। তিনি যিরয়াব নামে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি আনদালুসে গান- বাজনা প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের আমলে তিনি আনদালুসে আগমন করেন। তিনি তাঁর প্রতিভা ও আচরণ দিয়ে খলিফার মন জয় করে নেন। এর ফলে তিনি সঙ্গীত চর্চায় দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন এবং আনদালুসে সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। রাজকোষাগার থেকে তাঁর জন্যে বেতন বরাদ্দ করা হয়। তিনি মানুষকে গান- বাজনা শেখানোর জন্যে কর্ডোভায় একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এছাড়াও আনদালুসে এমন বেশ কিছু বাদ্য- যন্ত্রের প্রচলন করেন যা আগে প্রচলিত ছিল না। প্রচলিত আছে যে তিনিই সর্বপ্রথম বীণার তন্ত্রীতে পঞ্চম তন্ত্রী সংযোজন করেন।[৯৫]

---

[৯৩] প্রাগুক্ত, পৃ: ২০৮

[৯৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪

[৯৫] শাওকী দ্বাইফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী 'আসরুদ দুওয়ালি ওয়াল ইমারাতিল আনদালুস* , প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
মুসলিম স্পেনে গদ্য সাহিত্যের উৎপত্তি

তারিক বিন যিয়াদ কর্তৃক স্পেন বিজয়ের পরে সেখানে আরব মুসলিমদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। স্পেনের অধিবাসীরা আরবদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সবকিছুই অনুসরণ করতে শুরু করে। তারা আরবী ভাষা শিক্ষা করতে শুরু করে এবং আরবী সাহিত্যের মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তাদের এই আগ্রহের ফলে আনদালুসে আরবী সাহিত্যের চর্চা শুরু হয়।

সাহিত্যের অন্যান্য যুগের মত এখানেও প্রথমে গদ্য সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয়। একই ধারাবাহিকতায় এখানে স্পেন বিজয়ের সময় প্রদত্ত তারিক বিন যিয়াদের বক্তৃতাকে আনদালুসের প্রথম গদ্য সাহিত্য হিসেবে গণ্য করা হয়।

আরবী গদ্য সাহিত্যের অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু ছিল বক্তৃতা। জাহেলী, ইসলামী, উমাইয়া, আব্বাসী সহ সব যুগেই বক্তৃতা সমান গুরুত্ব বহন করে। এমনকি এসব যুগের গদ্য সাহিত্যের সূচনাও হয় বক্তৃতার মাধ্যমে। এসব বক্তৃতা ছিল বেশির ভাগই ধর্মীয় ও রাজনৈতিক। মুসলমানরা কোন রাজ্য বিজয়ের পরে সেখানে ধর্মীয় উপদেশ মূলক ও রাজনৈতিক বক্তৃতা প্রদান করতেন। এটাই আরবী গদ্য সাহিত্যের অন্যতম প্রধান সম্পদ হিসেবে পরিণত হয়।

স্পেন বিজয়ের প্রাক্কালে তারিক বিন যিয়াদ তার সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশ্যে এক উদ্দীপনামূলক বক্তৃতা দিয়েছিলেন যাকে আনদালুসে আরবী গদ্য সাহিত্যের যাত্রার ভিত হিসেবে গণ্য করা হয়।

আনদালুসের আরবী গদ্য সাহিত্যের উৎপত্তিতে বক্তৃতার পাশাপাশি অনুবাদ সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বও ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। মুসলিম শাসন জারি হওয়ার পর যখন আনদালুসের বাসিন্দারা প্রাচ্যের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, বিশেষ করে দাপ্তরিক কাজে যখন আরবী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন দেখা দেয় তখন ভাষাবিদদের আনাগোনা বেড়ে যায়। প্রাচ্য থেকে অনেক আরবী মৌলিক গ্রন্থ সংগ্রহ করে, অনুবাদ করে, সংকলন করে সংরক্ষণ করা শুরু হয়। এগুলোও ছিল গদ্য সাহিত্য চর্চার অন্যতম প্রভাবক।

তবে নিরেট গদ্য সাহিত্যের যাত্রা সূচিত হয় আরো পরে যার প্রারম্ভিক বিস্তৃতি কবিদের হাতেই শুরু হয়। অনেক প্রতিশযশা কবি যেমন ইবন আব্দি রাব্বিহ, ইবন শহীদ প্রমুখ গদ্য সাহিত্য রচনায় প্রভূত অবদান রাখেন। বলা যায়, তাঁরা ছিলেন আনদালুসে গদ্য সাহিত্য রচনার অন্যতম পথিকৃত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
গদ্য সাহিত্যের ক্রমবিকাশ

আনদালুসের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপরে ভিত্তি করে এই এলাকার গদ্য সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ঘটে। এ দিক থেকে আনদালুসীয় আরবী গদ্য সাহিত্যের ক্রমবিকাশের স্তরকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়।[৯৬] প্রথম যুগ ছিল স্পেন বিজয়ের যুগ তথা উমাইয়া আমল। স্বাধীন উমাইয়া আমল ও ক্ষুদ্র রাজ্যভিত্তিক শাসনামলে রচিত গদ্য সাহিত্য ছিল দ্বিতীয় স্তরের। আর পতনের যুগের গদ্য সাহিত্যকে তৃতীয় স্তরের সাহিত্য হিসেবে গন্য করা হয়।

স্পেনে বিজয়ের প্রাক্কালে তারিক বিন যিয়াদের ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে সেখানে আরবী গদ্য সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয়। এ স্তরে গদ্য সাহিত্য চর্চা সেই বক্তৃতা এবং চিঠি-পত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আনদালুসে মুসলিম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে সেখানে স্বভাবতই ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বক্তৃতার চর্চা ছিল। এছাড়াও আনদালুসের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হত সুদূর দামেস্ককেন্দ্রিক উমাইয়া খিলাফতের অধীনে। দামেস্কের সাথে আনদালুসের যোগাযোগ হত পত্রের মাধ্যমে। খলিফা কোন আদেশ পাঠাতে ইচ্ছা করলে তা পত্রযোগে বাহকের মাধ্যমে প্রেরণ করতেন। অনুরূপ রাজ্য পরিচালনায় কোন সমস্যায় পতিত হলে অথবা কোন বিষয় খলিফাকে অবহিত করাতে হলে তারও মাধ্যম ছিল চিঠি-পত্র।

এ স্তরের পত্র সাহিত্য ছিল মূলত চিঠি-পত্র, আদেশনামা, চুক্তিনামা ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধ।

[৯৬] হান্না আল ফাখুরী, *তারীখুল আদাবিল আরব*, (বৈরুত: দারুল জীল, ১৯৮৬) পৃ. ৮১৯

স্পেনে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে যখন বাগদাদ কেন্দ্রিক আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠা হয় আনদালুসে আব্দুর রহমান আদ দাখিলের নেতৃত্বে স্বাধীন উমাইয়া শাসনের যাত্রা শুরু হয়।এসময় ছিল আনদালুসে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প- সংস্কৃতি, সভ্যতা সহ সব দিক থেকে উন্নয়নের যুগ।আব্দুর রহমান আদ দাখিল ও তাঁর বংশধরদের হাতে আনদালুস চরম উন্নতির শিখরে আরোহন করে। আনদালুসীয় সাহিত্যও এ সময়ে নতুন রূপ ধারণ করে। এসময় গদ্য সাহিত্য চর্চার মূল ভিত্তি ছিল অনুবাদ সাহিত্য। আনদালুসীয় শাসকগণ সর্বপ্রথম জ্ঞানচর্চার দিকে মনোনিবেশ করেন। এসময় বেশ কিছু লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব লাইব্রেরীর জন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন ভাষার বই- পুস্তক সংগ্রহ করা হত এবং আরবীতে অনুবাদ করা হত। এর জন্যে মানুষ নানান ভাষা শিখতে শুরু করে। এছাড়াও ও কোন ছাপাখানা ছিল না। ফলে বইগুলো হাতে লিখে কপি করা হত। ফলে লিখন-শিল্পের ব্যাপক প্রসার হয়।

সাহিত্যের অন্যান্য শাখারও অগ্রযাত্রা এ সময়ে শুরু হয়। আনদালুসীয় কবি সাহিত্যিকরা উমাইয়া ও আব্বাসী সাহিত্যিকদের দ্বারা প্রভাবিত হন। বিশেষ করে গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে জাহিযের সাহিত্যিক রীতি দ্বারা তাঁরা প্রভাবিত হন।

আনদালুসীয় শাসকগণ সাহিত্যিকদের ব্যাপক সমাদর করতেন। তাদেরকে তাঁরা উৎসাহ দিতেন। এমনকি লেখনীর জন্যে উপঢৌকন ও দিতেন। সাহিত্যিকরাও কোন কিছু রচনা করে তাঁদের সামনে পেশ করতেন।

আনদালুসীয় রাজ দরবারে কবি সাহিত্যিকদের এতটাই সমাদর ছিল যে তাদেরকে রাজ্যের বিভিন্ন পদেও নিয়োগ দেয়া হত। যেমন আল মু'তাদিদ আল আবাদী ইবন যায়দুনকে মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব দেন।

এছাড়াও এসময়ে বিশেষ করে আব্দুর রহমান আন নাসির ও আল হাকামের সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের জন্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন এলাকা থেকে অনেক জ্ঞানী-গুণী, কবি- সাহিত্যিক এসব প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের জন্যে আগমন করতেন। তাদের মাধ্যমেও সাহিত্যের এক বিশাল অগ্রযাত্রা সূচিত হয়।

আনদালুসে স্বাধীন উমাইয়া শাসন বিলুপ্ত হলে এর প্রভাব সাহিত্যের উপরে এসেও পড়ে। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ভেঙ্গে গোত্রীয় শাসনব্যবস্থায় রূপ নেয়। একই সাথে বিদ্রোহ, যুদ্ধ ইত্যাদি নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ফলে গদ্য সাহিত্যও তার স্বকীয়তা হারায়। এ সময়ে ভাবের মাধুর্যের চেয়ে জটিল ও বেশি বেশি শব্দের ব্যবহার ইত্যাদি সাহিত্যিকদের কাছে প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। মুরাবিতীন ও মুওয়াহিদীনদের সময়ে রচনামূলক গদ্য সাহিত্যেও (الكتابة الإنشائية) প্রচলন হয়। এ সময়ে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচিত হয়। যেমন: ইবন দাহিয়া এর- المطرب من أشعار أهل المغرب , আমীর আব্দুর

রাবী' আল মুওয়াহিদীর اختصار الأغاني ইত্যাদি। বনু আহমারদের সময়েও গদ্য সাহিত্যের বেশ কিছু রূপ পরিলক্ষিত হয়। যেমন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, শহর-নগর, ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদি নিয়ে রচিত বর্ণনামূলক গদ্য, পত্রসাহিত্য ইত্যাদি। এছাড়াও এসময়ে মাকামা রচনাও পরিলক্ষিত হয়। [৯৭]

আনদালুসে আরবী সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে বেশ কিছু কার্যকরণের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। এসব কার্যকরণ সর্বাত্মকভাবে আরবী গদ্য ও পদ্যের বিকাশে অবদান রাখে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যকরণগুলো হলো:

১. সামাজিক পরিবেশ:
তৎকালীন আনদালুসের সামাজিক পরিবেশ সাহিত্যের বিকাশের ক্ষেত্রে অনেকাংশে ভূমিকা পালন করে। সামাজিক পরিবেশ বলতে সামাজিক জনগোষ্ঠী উদ্দেশ্য যাদের ভাষা, আচার- সংস্কৃতি, কর্মকান্ড ইত্যাদি সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

২. আনদালুসের সমকালীন পরিবেশ:
মুসলিম আনদালুসের সামগ্রিক প্রাকৃতিক পরিবেশ তথা নদী- নালা, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা সহ সব কিছুই তথায় আরবী সাহিত্যের বিকাশে প্রভূত অবদান রাখে। আনদালুসের প্রকৃতি কবি-সাহিত্যিকের মনোজগতে ব্যাপকহারে প্রভাব বিস্তার করে যা তাদের সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৩. আনদালুস ও প্রাচ্যের মধ্যে সাহিত্য- প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব:
আনদালুসে আরবী সাহিত্যের বিকাশের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে তা হলো প্রাচ্যের সাথে সাহিত্য রচনায় প্রতিযোগিতা।

৪. শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতা:
আনদালুসে সাহিত্য চর্চার প্রসারে শাসকগোষ্ঠীর অবদান অপরিসীম। তাঁরা ছিলেন সাহিত্য-সমঝদার এবং এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। আরবী সাহিত্যের প্রসারে যুগে যুগেই রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল অন্যতম প্রধান প্রভাবক। আনদালুসেও এর ব্যতিক্রম হয় নাই। তাঁরা বিভিন্ন ভাবে কবি- সাহিত্যিকদের সাহিত্য চর্চায় উৎসাহিত করতেন, উপঢৌকন প্রদান করতেন ও দরবারী কবির মর্যাদা দিতেন।

[৯৭] http://islamstory.com/detailes.php?module=artical&slug=تاريخ-النثر-في-بلاد-الاندلس

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মুসলিম স্পেনে পদ্য সাহিত্যের উৎপত্তি

আনদালুসের পদ্য সাহিত্যের উৎপত্তি হয় প্রাচ্যের পদ্য সাহিত্যের মতই। এর উৎপত্তির পেছনে যেসব কারণ রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল রাজা-বাদশাহদের গান-বাজনা প্রীতি ও আনদালুসের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। আরেকটি অন্যতম কারণ ছিল জাতিগত ও ধর্মীয় সংস্কৃতির বিভিন্নতা। এখানে আরব, ল্যাটিন, বার্বার, ইহুদী, খিষ্টান সহ বিভিন্ন জাতির বসবাস ছিল। তাদের সংস্কৃতির বিচিত্রতা আনদালুসীয় সাহিত্যের উপরে প্রভাব ফেলে।

আনদালুসে পদ্য সাহিত্যের প্রথম রচয়িতা হিসেবে ইবন হাজমের এক বর্ণনামতে আবুল আজরাব জাউনা আল কিলাবীর নাম পাওয়া যায়। তাঁকে আনদালুসের আনতারা নামে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। তিনি ইফসুফ ইবন আব্দুর রহমান আল ফিহরীর উযির সুমাইল ইবন হাতিমের নিন্দায় হিজা রচনা করেন।[৯৮] তবে তাঁর কবিতার তেমন কিছুই এখন পাওয়া যায়না।

এছাড়াও আবুল মুখাশ্শা আসেম ইবন যায়দ নামক এক কবির নাম জানা যায় যিনি হীরা রাজ্য থেকে আগত খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি স্বাধীন উমাইয়া খেলাফত পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন এবং সুলাইমান ইবন আব্দুর রহমান আদ দাখিলের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। তাঁর মেয়ে হাসানাও কবি ছিলেন। তাকে আনদালুসের প্রথম মহিলা কবিদের মধ্যে একজন হিসেবে গণ্য করা হতো।[৯৯]

[৯৮] ড. ইহসান আব্বাস, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী আসরু সিয়াদাতি কুরতুবা*, (বৈরুত: দারুস সাকাফা, ১৯৬৯), পৃ. ৪৪
[৯৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

পরবর্তীতে আনদালুসে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে সেখানে পদ্য সাহিত্যে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে এবং তা নতুন আঙ্গিকে যাত্রা শুরু করে। আনদালুসীয় পদ্য সাহিত্যের নবরূপে যাত্রার পেছনে যেসব প্রধান কারণ বিদ্যমান ছিল তা হলো: কবি-সাহিত্যিকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, গান-বাজনার প্রচার-প্রসার ও সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিভিন্নতা ইত্যাদি।

সাহিত্যকে নতুন রূপ দিতে কবি-সাহিত্যিকদের প্রচেষ্টা ছিল অক্লান্তকর। তারা প্রাচ্যে গমন করে সেখানকার সাহিত্য ও ভাষা সম্পর্কিত বিভিন্ন জ্ঞান লাভ করে দেশে ফিরে কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার চর্চা করতে শুরু করেন। কুসাঈ, আসমাঈ, খলীল ইবন আহমদ আল ফারাহিদী সহ বিভিন্ন প্রখ্যাত ব্যক্তিদের বই নিয়ে জ্ঞান চর্চা শুরু হতে থাকে। কবিরা বিভিন্ন নতুন কলা-কৌশল রপ্ত করেন। কবিতাকে প্রাচীন ও সংকীর্ণ খোলস থেকে বের করে নতুন রূপ দেন।[১০০]
গান বাজনা ছিল পদ্য সাহিত্যের উৎপত্তিতে অন্যতম সহায়ক। গান-বাজনার ব্যাপক প্রসার ও এর প্রতি প্রীতি থাকায় গীতি কবিতার উদ্ভব হয়। এছাড়াও আনদালুসের ধর্মীয় ও জাতিগত সংস্কৃতির বিচিত্রতাও কবিদেও মনস্তাত্বিক জগতের উপরে প্রভাব ফেলে।

আনদালুসের কবিরা কবিতা রচনার ক্ষেত্রে প্রাচ্যের স্টাইল ও বিষয়বস্তুকে গ্রহণ করলেও তাদের নিজেদের এক বিশেষ কবিতার জন্ম দেয়। এটি আল মুওয়াশশাহাত নামে পরিচিত। এ ধরণের কবিতার স্টাইল ছিল আনদালুসের সম্পূর্ণ নিজস্ব। এ বিশেষ ধরণের গীতিকবিতা শুধু আনদালুসেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, প্রাচ্য এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশ একে অনুসরণ ও অনুকরণ করে এ থেকে নিজস্ব রীতির কবিতারও জন্ম দিয়েছে।

[১০০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পদ্য সাহিত্যের ক্রমবিকাশ

আনদালুসের পদ্য সাহিত্যের ক্রমবিকাশও আব্বাসী পদ্য সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারাকে অনুসরণ করে। একইভাবে তা প্রাচীন রূপ থেকে আধুনিক রূপে পরিবর্তিত হয়। ফলে আনদালুসীয় পদ্যের ক্রমবিকাশকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা: প্রাচীনপন্থী তথা সনাতনধর্মী, মুক্তধারা ও আধুনিক পদ্য।[১০১]

সনাতনধর্মী পদ্য ছিল আনদালুসের মুসলিম ইতিহাসের শুরুর দিকের তথা উমাইয়া শাসনামলের। তারিক ইবন যিয়াদ কর্তৃক আনদালুস বিজয়ের পরে বিভিন্ন আরব রাষ্ট্র যেমন সিরিয়া, মিসর, ইরাক প্রভৃতি এলাকা থেকে মানুষ এসে এখানে বসবাস করা শুরু করে।এদের অনেকেই ছিল সনাতনধারার ধারক-বাহক ও সংরক্ষক। ফলে আনদালুসে আরবী কবিতার উৎপত্তির পরে দীর্ঘকাল যাবত তা সনাতনধর্মী থেকে যায়। খ্রিষ্টীয় একাদশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত এ ধরনের কবিতার অস্তিত্ব টিকে থাকে। এ ধারার পদ্য সাহিত্যের বিশিষ্ট কবি হচ্ছেন ইবন আব্দি রাব্বিহ, ইবন হানী, ইবন শুহাইদ, ইবন দার্‌রাজ প্রমুখ। তাঁরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রাচ্যের উমাইয়াদেরকে অনুসরণ করতেন।

সনাতন রীতি থেকে বের হয়ে আসার প্রচেষ্টা শুরু হয় খ্রিষ্টীয় একাদশ শতক থেকে। এর অন্যতম কারণ ছিল প্রাচ্যকে অনুসরণ করতে না চাওয়া এবং নিজ মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসা ও নিজ প্রকৃতির টান। এর ফলে প্রাচীন রীতি থেকে মুক্ত পদ্যের জন্ম নেয়। এ ধারার কবি ছিলেন ইবন যায়দুন, ইবন আম্মার, মু'তামাদ ইবন আব্বাদ, ইবন হাদ্দাদ প্রমুখ।

---

[১০১] হান্না আল ফাখুরী, *তারীখুল আদাবিল আরব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯৬

আনদালুসীয় পদ্য মুক্ত ধারা থেকে আধুনিকতার দিকে যাত্রা করে দ্বাদশ শতকে। এ ধারার পথিকৃতরা ছিলেন ইবনু হুমাইদিস, ইবনু আবদুন, ইবনু খাফাজাহ, লিসানুদ্দীন ইবনুল খাতীব প্রমুখ। এ সময়ে আনদালুসীয় আরবী কবিতা সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব স্টাইলে রূপ নেয়।

শেষপর্যায়ের কবিরা তাঁদের বর্ণনামূলক কবিতাতে এক বিশেষ ধরণের রূপ সংযোজন করেন। এমনকি শোকগাঁথাতেও এ ধরণের রূপ পরিলক্ষিত হয়, যা অন্য কোন যুগে বা এলাকায় সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। তা হলো শহর, নগর নিয়ে শোকগাঁথা ও বর্ণনা। আনদালুসের মুসলিম শাসন যখন প্রায় স্তিমিত, একে একে তার শহর, নগর গুলোতে যখন মুসলিম শাসনের পতন শুরু হয়েছে, সে সময়কার অবস্থার বর্ণনা দিয়ে তাঁরা আনদালুসের বিভিন্ন এলাকা নিয়ে শোকগাঁথা রচনা করতেন। এটা ছিল তাঁদের সম্পূর্ণ নিজস্ব বর্ণনাভঙ্গি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মুসলিম স্পেনের কবিতায় আল কুরআনের প্রভাব

আনদালুসের কবিতায় ইসলামী ভাবধারা লক্ষণীয়। বিশেষ করে বেশ কিছু কবির কবিতায় আল কুরআনের প্রভাব দেখা যায়। এসব কবিতায় আল কুরআনের শব্দ, ঘটনা, ভাব ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়। এ সমস্ত কবিরা তাঁদের কবিতা রচনায় আল কুরআন থেকে শব্দ চয়ন করেছেন, অনেক সময় কুরআনের কোন কোন পরিভাষার ব্যবহার করেছেন। আবার বিভিন্ন নবী- রাসূলের সময়ের ঘটনাবলী, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী যেগুলো আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে সেসব বিষয়ও তাঁরা কবিতায় তুলে এনেছেন।

যাদের কবিতায় আল কুরআনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তাঁদের মধ্যে ইবন যায়দুন অন্যতম। তাঁর রচিত গদ্য ও পদ্য উভয় শাখাতেই এ প্রভাব লক্ষনীয়। তাঁর রচিত সাহিত্য আল কুরআন কর্তৃক প্রভাবিত হওয়ার কারণ হিসেবে কুরআনের ব্যাপারে তাঁর লব্ধ জ্ঞানকে চিহ্নিত করা হয়। বলা হয়, যাদের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন তাঁদের একজন ছিলেন স্বীয় শিক্ষক আস সুকা মসজিদের ইমাম আবু বকর মুসলিম ইবন আফলাহ আন নাহওয়ী এবং তাঁর দুই সহচর আবু বকর ইবন যাকওয়ান ও আবুল ওয়ালিদ ইবন জহুর। প্রথম জন দীর্ঘদিন কর্ডোভার বিচারকের দায়িত্বে ছিলেন এবং দ্বিতীয় জন কুরআনের হাফেজ ছিলেন। স্বভাবতই তাঁদের সাহচর্যে থাকার ফলে ইবন যায়দুনের লেখনীতে আল কুরআনের প্রভাব স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়।[১০২] তাঁর চিন্তা- চেতনা, ধ্যান- ধারণা আল কুরআন দ্বারা প্রভাবিত হয়।

[১০২] বাশারি ইবরাহীম ও ড. ফিরুজ মুসা, *আছরুল কুরআনিল কারীম ফী আদাবি ইবন যায়দুন*, (মাজাল্লাতু জামেআতুল বা'ছ, খন্ড-৩৮, ২২ সংখ্যা, ২০১৬)/ *আল ইত্তিজাহুল ইসলামী ফিশ শি'রিল আনদালুসী ফী আহদাই মুলুকিত তাওয়াইফি ওয়াল মুরাবিতীন*, পৃ. ১০৪

ইবন যায়দুনের এসব কবিতায় যে সমস্ত বিষয় লক্ষণীয় তা হলো:

১. কুরআনের একক শব্দের ব্যবহার:

ইবন যায়দুন তাঁর বিভিন্ন কবিতায় আল কুরআন থেকে একক শব্দ চয়ন করেছেন। এর মধ্যে একটি শব্দ **العفو**;
পবিত্র কুরআনে এসেছে: خُذ العفوَ و أْمُرْ بالعرف
অর্থ:"ক্ষমা করুন ও সৎ কাজের আদেশ দিন।"

তিনি তাঁর رسالة الجدية তে শব্দটির ব্যবহার করেছেন এভাবে:
و أعود فاقول : ما هذا الذنبُ الذي لم يسّعْه عفوكَ، و الجهلُ الذي لم يأتِ من ورائِهِ حِلمُكَ؟
অর্থ: আমি ফিরে আসব ও বলব: এটা এমন কোন্ পাপ যা তোমার ক্ষমাকে চায়নি, এবং (কোন) অজ্ঞতা যার পেছনে তোমার স্বপ্নের আগমন ঘটেনি?[১০৩]

কিয়ামতের সাথে সম্পৃক্ত এমন অনেক কুরআনীয় শব্দকে ইবন যায়দুন তাঁর বিভিন্ন লেখনীতে ব্যবহার করেছেন। এসব শব্দের মধ্যে রয়েছে: **الجنة،سقر** প্রভৃতি।
যেমন: **و الجنة معك سقر** অর্থ: এবং জান্নাত, তোমার সাথেই রয়েছে সাক্বার। [১০৪]

এখানে উল্লেখিত উভয় শব্দই আল কুরআন থেকে চয়নকৃত। প্রথম শব্দটির উল্লেখ আল কুরআনের বহু জায়গায় এসেছে। এবং দ্বিতীয় শব্দটি যেমন: سأصليهِ سقر و ما ادراك ما سقر
অর্থ: "আমি তাকে অচিরেই সাক্বার নামক জাহান্নামে নিক্ষেপ করব, আর আপনি কি জানেন সাক্বার কি?"[১০৫]

২. কুরআনীয় যৌগিক শব্দের ব্যবহার:

ইবন যায়দুন তাঁর অনেক লেখনীতে আল কুরআন থেকে যৌগিক শব্দ চয়ন করে ব্যবহার করেছেন। এ ধরনের ব্যবহার তাঁর গদ্য ও পদ্য উভয় ধরনের লেখনীতেই দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি এসব

[১০৩] ইবন যায়দুন, *দিওয়ানু ইবন যায়দুন*, (কায়রো: দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১৯৯৪)পৃ:২২৭
[১০৪] প্রাগুক্ত, পৃ:২৪২
[১০৫] আল কুরআন, সূরা আল মুদাছছির: ২৬-২৭

আয়াতাংশকে তাঁর লেখনীতে হুবহু তুলে এনেছেন। আবার কখনো কখনো তার সাথে অন্য শব্দের সংযোজন বা বিয়োজন ঘটিয়ে তিনি কবিতায় উল্লেখ করেছেন।

যেমনটি আবু হাজম ইবন জহুরের প্রশংসায় রচিত তাঁর এক কবিতায় পাওয়া যায়:

أ أنكثُ فيكَ المدحَ مِن بعد قوةٍ و لا أقتَدِي إلا بِنَاقضةِ الغزل

অর্থ: ক্ষমতার পরে কি আমি আপনার প্রশংসা করা থেকে বিরত থাকব
আর যে কাটা সূতা ছিড়ে ফেলে শুধু তাকে অনুসরণ করব(?) [১০৬]

এই পঙক্তিটি এই আয়াত কর্তৃক প্রভাবিত:

و لا تكونوا كالتي نقضتْ غزلَها مِن بعد قوةٍ أنكاثًا

অর্থ: তোমরা ঐ মহিলার মত হয়ো না, যে পরিশ্রমের পর কাটা সূতা টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলে।[১০৭]
ইবন যায়দুন তাঁর শোকগাঁথা রচনাতেও আল কুরআন থেকে শব্দ চয়ন করেন। যেমন আল মু'তাদিদের মায়ের মৃত্যুতে রচিত তাঁর এক শোকগাঁথায় পাওয়া যায়:

خفضتَ جناحَ الذل في العز رحمةً لها و عزيز ان تضلَّ و تخضعا

অর্থ: আপনি তাঁর সম্মানে রহমতের ডানা বিছিয়েছিলেন, ভ্রান্ত হওয়ার (ভয়ে) এবং বিনয়ী হয়ে।[১০৮]

এ কবিতাংশের সাথে আল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের মিল খুঁজে পাওয়া যায়:

و اخفِضْ لهما جناح الذل من الرحمة

অর্থ: আর তাদের জন্যে রহমতের ডানা বিছিয়ে দাও।[১০৯]

একই আয়াতের সাথে আরেকটি মিল খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর এক প্রশংসামূলক কবিতায়। যেমনটি এসেছে:

لا سكّن الله قلبا عن ذكركم فلم يطر بجناح الشوق خفّاقا

অর্থ: আল্লাহ অন্তরকে তোমাদের স্মরণ থেকে প্রশমিত করেন নি
ফলে কোন আকাঙ্ক্ষার ডানা তাতে পত পত করে উড়েনি।[১১০]

---

[১০৬] ইবন যায়দুন , *দিওয়ানু ইবন যায়দুন*, প্রাগুক্ত, পৃ:১৬
[১০৭] আল কুরআন, সূরা আন নাহল: ৯২
[১০৮] ইবনু যায়দুন, *দিওয়ানু ইবন যায়দুন*, প্রাগুক্ত, পৃ:১২৬
[১০৯] আল কুরআন, সূরা আল ইসরা: ২৪
[১১০] ইবনু যায়দুন, *দিওয়ানু ইবন যায়দুন*, প্রাগুক্ত, পৃ:১৭২

আল কুরআনের প্রভাব শুধু তাঁর প্রশংসামূলক কবিতা ও শোকগাঁথাতেই সীমিত থাকেনি, বরং তিনি বিভিন্ন বিষয়বস্তুতে এর সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। তিনি কারারুদ্ধ থাকা অবস্থায় স্বীয় উযির- বন্ধু আবু হাফস ইবন বুরদকে উদ্দেশ্য করে একটি কবিতা লিখেন। এটা ছিল মূলত সময় ও কালের ব্যাপারে অভিযোগ ও আক্ষেপমূলক একটি কবিতা। এতে তিনি বলেন:

إن قسا الدهرُ فللما ءِ مِنَ الصخر انبجاسُ

অর্থ:নিশ্চয় যুগ কঠোর হচ্ছে পাথর থেকে পানি উৎসারণের জন্যে। [১১১]

এই পঙক্তিটির সাথে নিম্নোক্ত আয়াতের সাদৃশ্য পাওয়া যায়:

و ان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار، و ان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، و ان منها لما يهبط من خشية الله

অর্থ: পাথরের মধ্যে এমনও আছে যা থেকে ঝরণা প্রবাহিত হয়, এমনও আছে যা বিদীর্ণ হয়, অত:পর তা থেকে পানি নির্গত হয় এবং এমনও আছে যা আল্লাহর ভয়ে খসে পড়তে থাকে।[১১২]

এই পঙক্তিটির সাথে উল্লেখিত আয়াতের স্পষ্ট কোন মিল খুঁজে না পাওয়া গেলেও কবি এখানে কারাগারে থাকা সময়কালীন নিজের অবস্থার সাথে আয়াতে বর্ণিত অবস্থার মিল দেখাতে চেয়েছেন।

৩. আল কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনা আনয়ন:

ইবন যায়দুন তাঁর কবিতায় আল কুরআন থেকে একক শব্দ, যৌগিক শব্দ, ভাবধারা ইত্যাদি আনয়নের মধ্যেই সীমা থাকেন নি, বরং তাঁর কবিতায় কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা, নবী- রাসূলগণের ঘটনা ইত্যাদিরও সমাবেশ ঘটিয়েছেন। তিনি যে সব ঘটনা চয়ন করেছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ:

ক.মূসা (আ:) এর ঘটনা:

ইবন যায়দুন জেলে থাকা অবস্থায় তাঁর মাকে উদ্দেশ্য করে তাঁর ধৈর্য্য ধারণের ব্যাপারে একটি কবিতা রচনা করেন। এখানে মূসা (আ) এর একটি ঘটনার সাথে নিজ অবস্থার তুলনা দেন। মূসা (আ) এর জন্মের পর ফিরআউনের ভয়ে ভীত হয়ে নিজ সন্তানকে রক্ষার্থে তাঁর মা তাঁকে একটি বাক্সে করে নদীতে ভাসিয়ে দেন। এখানে সন্তানের সাথে মায়ের যে বিচ্ছেদ হয় এবং তাতে মূসা (আ) এর মা যে ধৈর্যধারণ করেছিলেন তার সাথে নিজ মায়ের ধৈর্যধারণের তুলনা করেন। তিনি তাঁর কবিতায় বলেন:

[১১১] প্রাগুক্ত, পৃ:৬৬

[১১২] আল কুরআন, সূরা আল বাক্বারা: ৭৪

أقِلّي بُقَاءَ لستِ اوّلَ حُرّةٍ طَوتْ بالأسى كشحا على مضضِ الثكل
و في ام موسى عبرةٌ ان رمت به إلى اليمّ في التابوتِ فاعتبري واشلي

অর্থ: কম ক্রন্দন করুন, আপনি প্রথম স্বাধীন মহিলা নন
ভারী কষ্টে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে কষ্টকে গুটিয়ে নিয়েছে,
আর মূসা (আ) এর মায়ের অশ্রু যখন তিনি তাঁকে ভাসিয়েছিলেন
নদীতে বাক্সে করে ,তা আমার আঘাত ও অবস্থার ন্যায়। [১১৩]

তাঁর এ কবিতায় উল্লেখিত মূসা (আ) সংশ্লিষ্ট ঘটনাটির সাথে নিম্নোক্ত আয়াতের সাদৃশ্যতা পাওয়া যায়:
إذ أوحينا الى أمك ما يُوحى- أنِ اقْذِفِيهِ في التابوتِ فاقذِفِهِ في اليمّ فليلقه اليمُّ بالساحل يأخذه عدو لي و عدو له—
যখন আমি আপনার মাতাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যা অত:পর বর্ণিত হচেছ। যে, তুমি তাকে সিন্দুকে রাখো, অত:পর তা সমুদ্রে ভাসিয়ে দাও, অত:পর সমুদ্র তাকে তীরে ঠেলে দিবে। তাকে আমার শত্রু ও তোমার শত্রু উঠিয়ে নিবে।[১১৪]

খ) ইউসুফ (আ) এর ঘটনা:

ইবন যায়দুন কর্তৃক চয়নকৃত আল কুরআনে বর্ণিত ঘটনাসমূহের একটি হলো ইউসুফ (আ) ও তাঁর ভাইদের ঘটনা। এ ঘটনার সাথে মিল রেখে তিনি আবুল হাজম ইবন জহুরের প্রশংসায় রচিত এক কবিতায় উল্লেখ করেন:

كان الوشاةُ و قد مُنيتُ بإفكِهم أسباطَ يعقوبٍ و كنتُ الذّيبا

অর্থ: তারা কুৎসা রটনাকারী ছিল আর আমি তাদের অপবাদে ধৈর্যধারণ করেছি
(তারা) ইয়া'কুবের বংশধরদের (মত) আর আমি বাঘের (ঘটনার মত)।[১১৫]

উক্ত পঙক্তির সাথে নিম্নোক্ত আয়াতের সাদৃশ্য পাওয়া যায়:
قالوا يا أبانا إنّا ذهبنا نستبق و تركنا وسف عند متاعنا فاكله الذئب و ما انت بمؤمن لنا و لو كنّا صادقين

[১১৩] ইবন যায়দুন , *দিওয়ানু ইবন যায়দুন*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩
[১১৪] আল কুরআন, সূরা ত্বহা: ৩৮-৩৯
[১১৫] ইবন যায়দুন , *দিওয়ানু ইবন যায়দুন*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪

অর্থ: তারা বলল: হে পিতা, আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করতে গিয়েছিলাম এবং ইউসুফকে আসবাব পত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম, অত:পর তাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। আপনি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা সত্যবাদী।[১১৬]

এখানে কবিতায় উল্লেখিত **الوشلة** দ্বারা কবি উপরোক্ত আয়াতের اخوة يوسف এর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

গ) ইবরাহীম (আ) এর ঘটনা:

ইবন যায়দুন আবুল হাজম ইবন জহুরের প্রশংসায় রচিত এক কবিতায় বলেন:

بأبي انت إن تشأ تكُ بردا و سلاما كنار ابراهيم

অর্থ: আমার পিতার শপথ, আপনি যদি চান তাহলেই ইবরাহীম (আ) এর আগুনের ন্যায় শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যান।[১১৭]

এখানে তিনি আল কুরআনের একটি আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যতা টেনে আনেন। তা হলো:

قلنا يا نار كوني بردا و سلاما على ابراهيم

অর্থ: আমরা বললাম, হে আগুন, ইবরাহীমের জন্যে শীতল এবং শান্তিদায়ক হয়ে যাও।[১১৮]

উক্ত আয়াত ইবরাহীম (আ) এর একটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে। ইবরাহীম (আ) কে যখন নমরূদ কর্তৃক আদেশ প্রদত্ত হয়ে আগুনে নিক্ষেপ করা হয় তখন আল্লাহর হুকুমে আগুন নিভে যায় এবং ইবরাহীম (আ) তা থেকে রক্ষা পান।

এছাড়াও ইবন যায়দুন তাঁর কবিতায় আরো অনেক নবী- রাসূল, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী যেগুলো আল কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে সেগুলোর দৃষ্টান্ত তুলে এনেছেন।

আনদালুসের আরো একজন প্রসিদ্ধ কবি ইবন যাবের আল আনদালুসী যার কবিতায়ও কুরআনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর কবিতাতেও ইবন যায়দুনের কবিতার ন্যায় একক শব্দ, যৌগিক শব্দ বা বাক্যাংশ ইত্যাদির উপস্থিতি লক্ষণীয়। আবার বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ ও তাঁর কবিতায় পাওয়া যায়। সেদিক থেকে তাঁর চয়নকৃত আয়াত বা ঘটনার উপর ভিত্তি করে তাঁর এ ধরণের কবিতা গুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়:

---

[১১৬] আল কুরআন, সূরা ইউসূফ: ১৭

[১১৭] ইবন যায়দুন, *দিওয়ানু ইবন যায়দুন*, প্রাগুক্ত, পৃ:২০

[১১৮] আল কুরআন, সূরাতুল আম্বিয়া : ৯৬

ক) আল কুরআনের আয়াত বা আয়াতাংশের প্রভাব সম্বলিত কবিতা:

ইবন যাবের আনদালুসী তাঁর অনেক কবিতায় আল কুরআনের আয়াত চয়ন করেছেন । তাঁর কাছে চয়নের ধরণ দুই ধরণের ছিল: ১. শাব্দিক, ২. ভাবার্থমূলক।

শাব্দিক চয়নের ক্ষেত্রে তিনি কোন রকম পরিবর্তন ছাড়াই হুবহু চয়ন করেছেন। যেমন:

يا صاحب المال ألم تستمع لقوله ما عندكم ينفد
فاعمل به خيرا فو الله ما يبقي و لا انت به مخلد

অর্থ: হে সম্পদের মালিক, তুমি কি তাঁর (আল্লাহর) বানী শুনো নাই,
তোমাদের কাছে যা আছে তা নি:শেষ হয়ে যাবে।
ফলে তা দিয়ে ভাল কাজ কর; আল্লাহর শপথ,
তা রয়ে যাবে আর তুমি এর দ্বারা চিরস্থায়ী নও।[১১৯]

নিম্নোক্ত আয়াতের সাথে উক্ত পঙক্তিদ্বয়ের মিল পাওয়া যায়:

ما عندكم ينفد و ما عند الله باق

অর্থ: তোমাদের কাছে যা আছে তা নি:শেষ হয়ে যাবে, এবং আল্লাহর কাছে যা আছে তা কখনো নি:শেষ হবে না।[১২০]

সাহাবাদের বর্ণনায় তিনি তাঁর এক কবিতায় বলেন:

هم جاهدوا في الله حقَّ جهادِهِ و قاموا بنصر الدين في كل مشهد

অর্থ: তাঁরা আল্লাহর রাস্তায় সত্যিকার অর্থে জিহাদ করেছেন এবং সকল দিকেই দ্বীনকে বিজয়ী করে প্রতিষ্ঠা করেছেন।[১২১]

নিম্নোক্ত আয়াতের সাথে এর মিল খুঁজে পাওয়া যায়:

و جاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم و ما جعل عليكم في الدين من حرج

অর্থ: তোমরা আল্লাহর জন্যে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিত, তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। [১২২]

---

[১১৯] ড: আহমদ ফাওযী আল হীব , *আল আনদালুসী: ইবন জাবের মুহাম্মদ ইবন আহমদ আদ দ্বরীর, শি'রুহু*, (দামেশক: দারু সা'দুদ দ্বীন, ২০০৭), পৃ: ৩৫

[১২০] আল কুরআন, সূরাতুন নাহল: ৯৬

[১২১] ড: আহমদ ফাওযী আল হীব, *আল আনদালুসী: ইবন জাবের মুহাম্মদ ইবন আহমদ আদ দ্বরীর, শি'রুহু*, প্রাগুক্ত, পৃ:৪৩

[১২২] আল কুরআন, সূরা আল হজ্জ: ৭৮

এছাড়াও তিনি মক্কা- মদীনার উদ্দেশ্যে নিজ সফর ও হজ্জের ইচ্ছা পোষণ করে এক কবিতায় বলেন:

شددنا عقود العزم منا لتوبة تعود لنا من غافر الذنب بالبشرى

অর্থ: আমাদের পক্ষ থেকে তওবার সংকল্প দৃঢ় হয়েছে,
পাপ ক্ষমাকারীর কাছ থেকে আমাদের জন্যে সুসংবাদ নিয়ে ফিরে এসেছে।[১২৩]

যার সাথে নিম্নোক্ত আয়াতের মিল পাওয়া যায়:

غافر الذنب وقابل التوب

অর্থ: পাপ ক্ষমাকারী ও তওবা কবুলকারী।[১২৪]

খ) কুরআনীয় অর্থের প্রতি ইঙ্গিত:

ইবন জাবের আল আনদালুসী তাঁর অনেক কবিতায় আল কুরআনের আয়াতের ভাবার্থ গ্রহণ করেছেন। তিনি এসব কবিতায় সরাসরি কুরআন থেকে শব্দ বা বাক্য চয়ন করেননি। তাঁর আল কুরআনের ভাবধারা সম্পন্ন কবিতাগুলোর মধ্যে এ ধরনের কবিতার সংখ্যাই বেশি দেখতে পাওয়া যায়।[১২৫]

রাসূল (সা:) এর একটি মুজিজা চাঁদকে দ্বিখন্ডিত করা। এ বিষয় আল কুরআনে বর্ণিত রয়েছে। ইবন জাবের ও তাঁর কবিতায় এ বিষয়ের অবতারণা করেছেন।

যেমন বলেন:

و الشمسُ بعد غروبها رُدَّتْ له و البدرُ بين يديه شُقَّ و أُفرجا

অর্থ: আর সূর্য অস্ত যাওয়ার পরে তাঁর জন্যে উদিত হয়েছে
এবং চাঁদ তাঁর দু'হাতের মধ্যে বিদীর্ণ হয়েছে ও মুক্তি পেয়েছে।[১২৬]

অন্য এক জায়গায় বলেন:

و بالقمر المُنشقّ كمْ غاظ حاسدا و ما سلّموا حتى أنالهم حصْدا

[১২৩] ড: আহমদ ফাওযী আল হীব, *আল আনদালুসী: ইবন জাবের মুহাম্মদ ইবন আহমদ আদ দ্বরীর, শি'রুহু*, প্রাগুক্ত, পৃ:৭৭
[১২৪] আল কুরআন, সূরা আল মু'মিন: ৩
[১২৫] *মাজাল্লাতু মারকাযি বাবেল লিদ দিরাসাতিল ইনসানিয়্যা*, খন্ড. ৪, সংখ্যা. ২, পৃ. ১৮৫
[১২৬] ড: আহমদ ফাওযী আল হীব, *আল আনদালুসী: ইবন জাবের মুহাম্মদ ইবন আহমদ আদ দ্বরীর, শি'রুহু*, প্রাগুক্ত, পৃ:৩২

অর্থ: আর বিদীর্ণ চন্দ্র দ্বারা কত হিংসুক রাগান্বিত হয়েছে
আর ফলাফল পাওয়া অবধি তারা নত স্বীকার ও করেনি।[১২৭]

আরেক জায়গায় এসেছে:

و شقَّ على اعدائه أنّ ربَّه لتعجزهم بدر السماء له شق

অর্থ: তা তার শত্রুদের উপর বিদীর্ণ হয়েছে, নিশ্চয় তার প্রতিপালক
তাদেরকে অক্ষম করে দিতেই আকাশের চাঁদকে বিদীর্ণ করেছেন।[১২৮]

এই পঙক্তিগুলো নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থ বহন করে:

اقتربتِ الساعةُ و انشقَ القمرُ

অর্থ: কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে।[১২৯]

অনুরূপভাবে তিনি বদরের যুদ্ধে আরেক মুজিজা আল্লাহর সাহায্যের বর্ণনা দেন এভাবে:

تلا الفتحُ من بعد القتال و كيف لا و قد كان أملاكُ السماءِ له جندا

অর্থ: যুদ্ধের পরে বিজয় এসেছে এবং কিভাবে নয় (আসবেনা)
আর যার সৈন্য ছিল আসমানের ফেরেশতারা।[১৩০]

যেমনটি আল কুরআনে আল্লাহ তা'লা বলেছেন:

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ - إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ **رَبُّكُم** بِثَلاَثَةِ آلاَفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُنزَلِينَ- بَلَى إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَـذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوِّمِينَ-

অর্থ: "বস্তুত: আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দূর্বল। কাজেই আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো। আপনি যখন মুমিনগণকে বলতে লাগলেন- তোমাদের জন্যে কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের পালনকর্তা আসমান থেকে অবতীর্ণ

[১২৭] প্রাগুক্ত, পৃ:৩৮
[১২৮] প্রাগুক্ত, পৃ:১০০
[১২৯] আল কুরআন, সূরা আল ক্বমার: ০১
[১৩০] ড: আহমদ ফাওযী আল হীব, *আল আনদালুসী: ইবন জাবের মুহাম্মদ ইবন আহমদ আদ দ্বরীর*, *শি'রুহু*, প্রাগুক্ত, পৃ:৩৯

তিন হাজার ফেরেশতা পাঠাবেন। অবশ্য তোমরা যদি ধৈর্য্যধারণ করো এবং বিরত থাক আর তারা যদি তখনই তোমাদের উপর চড়াও হয় তাহলে তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত ঘোড়ার উপর পাঁচ হাজার ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যে পাঠাবেন।"[১৩১]

ইবন জাবের আনদালুসী রাসূল (সা) এর শানে অনেক কবিতা রচনা করেন। এসব কবিতায় তিনি রাসূল (সা) এর নবুয়তের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা সহ তাঁর গুনাবলীর বর্ণনা দেন। এছাড়াও এক কবিতায় তাঁর শেষ নবী হওয়ার বিষয়টি ও বর্ণনা করেন। যেমন বলেন:

يوم دارا بها خيرُ الورى حَسَبًا الخاتمُ الرسل من عُربٍ و من عجمٍ

অর্থ: শ্রেষ্ঠ মানবের আগমন আজ সুসম্পন্ন হয়েছে
তিনি আরব ও আজমের শেষ রাসূল।[১৩২]

এ বিষয়টি যেমনভাবে আল কুরআনে এসেছে:

ما كان محمدٌ أبا أحدٍ من رجالكم و لكن رّسولَ الله و خاتمَ النبيينَ

অর্থ: "মুহাম্মদ (সা) তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী।"[১৩৩]

এছাড়া তিনি তাঁর কবিতায় দ্বীন সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনায় কিয়ামত, হাশর ও সেই সময়ের অবস্থাও তুলে ধরেন।

গ) ইবন জাবেরের কবিতায় কুরআনীয় শব্দঃ

ইবন জাবের আনদালুসী তাঁর কবিতায় শুধু আল কুরআন থেকে শাব্দিক অর্থ বা ভাবার্থই গ্রহণ করেননি, তিনি অনেক বিশেষায়িত শব্দও চয়ন করেছেন। যেমন تبلب ; শব্দটির অর্থ লিসানুল আরবে এসেছে : هلاك [১৩৪]

আল কুরআনে শব্দটির ব্যবহার বিভিন্ন ভাবে এসেছে। যেমন সূরা লাহাবে এসেছে:

تبّت يدا ابي لهب و تبّ

অর্থ: আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক।

[১৩১] আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান: ১২৩-১২৫
[১৩২] ড: আহমদ ফাওযী আল হীব, *আল আনদালুসী: ইবন জাবের মুহাম্মদ ইবন আহমদ আদ দ্বরীর, শি'রুহু*, প্রাগুক্ত, পৃ:১৪৬
[১৩৩] আল কুরআন, সূরা আল আহযাব: ৪০
[১৩৪] ইবন মানজুর, *লিসানুল আরব*, (দারুল মাআ'রিফ), ১ম খন্ড,/পৃ. ৪১৫

আরেক সূরায় এসেছে:

وكذلك زُيّنَ لِفرعونَ سوءُ عملهِ و صُدَّ عن السبيلِ و ما كيدُ فرعونَ الا في تبابٍ.

অর্থ: এভাবেই ফেরআউনের কাছে সুশোভিত করা হয়েছিল তার মন্দ কর্মকে এবং সোজা পথ থেকে তাকে বিরত রাখা হয়েছিল। ফেরআউনের চক্রান্ত ব্যর্থ হওয়ারই ছিল। [১৩৫]

এখানে এই تبٌّ শব্দের মূল হলো تباب যার অর্থ ধ্বংস। ইবন যায়দুন তাঁর কবিতায় শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেন:

يعُدُّون من عِزّ النفوس اكْتِسابِها   و ما هو الا ذلة و تباب
و ما مَثَلُ الدنيا و طلابِ مثلها   سوى جيَفٍ مِن حولِهن كلابٌ

অর্থ: তারা মানুষের সম্মানকে তার অর্জন মনে করে
আর তা অপমান ও ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নয়।
আর দুনিয়া ও তার অনুরূপ চাহিদার উপমা
উচ্ছিষ্টের চারপাশে কুকুরের মত ছাড়া কিছুই নয়।[১৩৬]

আল কুরআনে ব্যবহৃত তাঁর আরেকটি চয়নকৃত শব্দ مآرب; এ শব্দটিকে তিনি আলমারিয়ার প্রতি তাঁর দেশ প্রেমের বহি:প্রকাশ হিসেবে কবিতায় উল্লেখ করেছেন:

مرَّتْ ليالٍ بالمريَّةِ طالما   قضيتُ من ليلٍ بهنَّ مآربا
لم اسلُ عن تلك الديار و إنما   جُعِلَ القضاءُ لكل نفسٍ غالبا

অর্থ: কত না রাত অতিবাহিত হয়েছে আলমারিয়াতে
আমি সেখানে রাত্রি যাপন করেছি বিভিন্ন কাজে।
সে সমস্ত ঘর- বাড়ি থেকে আমি চলে আসিনি
বরং প্রত্যেক মানুষের জন্যেই বিষয়াদি নির্ধারিত হয়েছে। [১৩৭]

শব্দটি কুরআনে এসেছে এভাবে:

و ما تلك بيمينِك يا موسى. قال هي عصايَ أتوكَّأُ عليها و أهُشُّ بها على غنمي و لِيَ فيها مآربُ اخرى

অর্থ:হে মূসা, তোমার ডান হাতে ওটা কি? তিনি বললেন: এটা আমার লাঠি, আমি এর উপর ভর দেই এবং এর দ্বারা আমার ছাগপালের জন্যে বৃক্ষপত্র ঝেড়ে ফেলি এবং এতে আমার অন্যান্য কাজও চলে।[১৩৮]

---

[১৩৫] আল কুরআন, সূরা আল মু'মিন: ৩৭
[১৩৬] ড: আহমদ ফাওযী আল হীব, *আল আনদালুসী: ইবন জাবের মুহাম্মদ ইবন আহমদ আদ দ্বরীর, শি'রুহু*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
[১৩৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
[১৩৮] আল কুরআন, সূরা ত্বহা: ১৭-১৮

ঘ) ইবন জাবেরের কবিতায় কুরআনীয় বাক্যাংশঃ

ইবন জাবের আনদালুসী তাঁর কবিতায় আল কুরআন থেকে বাক্যাংশও চয়ন করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি কোন রকম পরিবর্তন ছাড়াই তা কবিতায় উল্লেখ করেছেন, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কবিতার ছন্দের সাথে মিল রেখে সামান্য পরিবর্তনও করেছেন।

তাঁর এক কবিতায় এসেছে:

بهم عاش في أم القرى كلّ هالكٍ و هم أوقدوا نارَ القِرى لمن استهدى

অর্থ: প্রত্যেক ধ্বংসপ্রাপ্তই (যারা) উম্মুল কুরা (মক্কা) তে বাস করেছে
আর তারা সত্য পথের অন্বেষীদের আবাসে আগুন প্রজ্জ্বলন করেছে। [১৩৯]

এ কবিতায় তিনি দু'টি শব্দের ব্যবহার এনেছেন:**أوقدوا نارَ** ও **أم القرى**; দ্বিতীয় শব্দটির ব্যবহার সরাসরি আল কুরআনে এসেছে এভাবে:

كلما أوقدوا نارا لِلحربِ أطفَأها الله و يسعَون في الارض فسادا

অর্থ: যখনই তারা যুদ্ধের আগুন প্রজ্জলিত করে আল্লাহ তা নির্বাপিত করে দেন, তারা দেশে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়।[১৪০]

তিনি তাঁর আরেক কবিতায় বলেন:

هى العُرْوةُ الوثقى فإن كُنتَ طالِبًا نجاتَك فاسْتَمْسِكْ بِعُرْوتِها **الوُثْقى**

অর্থ: এটা সুদৃঢ় হাতল, যদি তুমি তোমার মুক্তি-অন্বেষী হয়ে থাকো তবে তার সুদৃঢ় হাতলকে আঁকড়ে ধর।[১৪১]

এখানে তিনি **العُرْوةُ الوثقى** শব্দটি আল কুরআন থেকে চয়ন করেন।

এটি আল কুরআনে এসেছে এভাবে:

فمن يكفرْ بِالطاغوتِ و يُؤمِن بالله **فقدِ اسْتَمْسكَ بِالعُروةِ الوثقى و لا انفصامَ** لها و الله سميع عليم.

---

[১৩৯] ড: আহমদ ফাওযী আল হীব, *আল আনদালুসী: ইবন জাবের মুহাম্মদ ইবন আহমদ আদ দ্বরীর*, *শি'রুহু*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

[১৪০] আল কুরআন, সূরা আল মায়েদা: ৬৪

[১৪১] ড: আহমদ ফাওযী আল হীব, *আল আনদালুসী: ইবন জাবের মুহাম্মদ ইবন আহমদ আদ দ্বরীর*, *শি'রুহু*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

অর্থ: এখন যারা গোমরাহকারী তথা তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাঙ্গবার নয়, আর আল্লাহ সবই শুনেন এবং জানেন।[১৪২]

এ বাক্যাংশটি অন্য এক আয়াতে এভাবে এসেছে:

و من يُسْلِمْ وجهَه الى الله و هو محسِنٌ فقدِ اسْتمسكَ بالعروةِ الوثقى و الى الله **عاقِبةُ الامور**

অর্থ: যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে স্বীয় মুখমন্ডলকে আল্লাহ অভিমূখী করে সে এক মজবুত হাতল ধারণ করে, সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর দিকে।[১৪৩]

ঙ) আয়াত বা সূরার প্রতি ইঙ্গিত:

ইবন জাবের আনদালুসীর এ ধরনের কবিতার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো তিনি সরাসরি আয়াত থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ চয়ন না করে উক্ত আয়াত বা সূরার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অনেক সময় তিনি শুধু সূরার নামই কবিতায় ব্যবহার করেছেন।

যেমন তাঁর এক কবিতায় পাওয়া যায়:

فجاء مُجيبا في (اذا جاء) بالذي شفاهم فقالوا حقُّه ان يُسَوّدُ
فآيتُها مِن آخر الفجر أُسْمِعُوا لدى وضعهِ في خير قبر و ملحَدِ

অর্থ: উত্তর স্বরূপ এসেছে (যখন আসবে) এর ব্যাপারে, যার দ্বারা
তারা সুপারিশ করেছে ,তারা বলেছে এর বাস্তবতা কালো হওয়া।
উত্তম ও অবিশ্বাসীর কবরে তাকে রাখার সময়
ফজরের শেষের আয়াত শ্রবণ করো [১৪৪]

[১৪২] আল কুরআন, সূরা আল বাক্বারা: ২৫৬
[১৪৩] আল কুরআন, সূরা লুকমান: ২২
[১৪৪] ড: আহমদ ফাওযী আল হীব, *আল আনদালুসী: ইবন জাবের মুহাম্মদ ইবন আহমদ আদ দ্বরীর*, *শি'রুহু*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

এখানে কবি প্রথম পঙক্তিতে সূরা আন নাসর এবং দ্বিতীয় পঙক্তিতে সূরা ফজরের শেষ আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

আল কুরআনের বিশেষত্ব সম্পর্কে কবি তাঁর এক কবিতায় বলেন:

على مساقٍ و نظمٍ ليس مِن بشرٍ فللمُعارضِ تعزيزٌ و تخذيلُ
و العُرْبُ عن سورةٍ من مثلهِ عجَزوا في وفرهِم و هم اللُسْنُ المقَاويلُ

অর্থ:গল্প- কবিতার উর্দ্ধে, কোন মানুষের নয় ,
এর বিপরীতে রয়েছে সম্মান ও অপমান।
আর আরবরা সূরার অনুরূপ আনতেও অক্ষম,
অথচ তারা ভাষায় বাগ্মী।[১৪৫]

প্রথম পঙক্তিতে তিনি নিম্নোক্ত আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন:

و إن كنتم في ريبٍ مما نزَّلنا على عبدنا فأتوا بسورةٍ من مثلهِ وادعوا شهداءَكُم **من دون الله إن كنتم** صادقين

অর্থ: আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি সে ব্যাপারে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস এবং তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকে সাথে নাও, এক আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।[১৪৬]

আর দ্বিতীয় পঙক্তিতে اللُسْنُ المقَاويْلُ هم দ্বারা তিনি و تُنذِرَ به قوما لُدا (অর্থ: এবং এর দ্বারা কলহকারী সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন) [১৪৭] আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

চ) কুরআনীয় ঘটনার বর্ণনা:

[১৪৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮
[১৪৬] আল কুরআন, সূরা আল বাক্বারা: ২৩
[১৪৭] আল কুরআন, সূরা মারইয়াম: ৯৭

ইবন যায়দুনের মত ইবন জাবের আনদালুসীও তাঁর কবিতায় আল কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা তুলে এনেছেন। তবে তাঁর বর্ণিত ঘটনাগুলোর মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে মিরাজ, হিজরত ইত্যাদির মত বিষয়গুলো।

যেমন তাঁর এক কবিতায় পাওয়া যায়:

سبحان من اسرى به من بيته للمسجد الاقصى بليل قد دجا
ركِبَ البُراقَ و جال سبعَ طِباقِها في ليلة و دنا و بلّغ ما ارتجى

অর্থ: পরম পবিত্র সত্তা যিনি তাঁকে তাঁর ঘর থেকে ভ্রমণ করিয়েছেন
মসজিদে আকসা পর্যন্ত যখন রাত অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েছিল।
তিনি বুরাকে আরোহন করেছেন ও তার (আকাশের) সাত স্তর পর্যন্ত গিয়েছেন
এবং সেই রাতে কাঙ্খিতের নিকটবর্তী হয়েছেন ও পৌঁছেছেন ।[১৪৮]

এটা নিম্নোক্ত আয়াতের প্রতি নির্দেশ করে:

سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لِنُرِيَهُ من آياتِنَا إنه هو السميع البصير

অর্থ: পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাতের বেলায় ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার চার পাশে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল।[১৪৯]

[১৪৮] ড: আহমদ ফাওযী আল হীব, *আল আনদালুসী: ইবন জাবের মুহাম্মদ ইবন আহমদ আদ দ্বরীর, শি'রুহু*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২
[১৪৯] আল কুরআন, সূরাতুল ইসরা: ০১

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ইউরোপীয় সাহিত্যে স্পেনের আরবী সাহিত্যের প্রভাব

মুসলিম স্পেন যখন সভ্যতার স্বর্ণশিখরে তখন ইউরোপের অন্যান্য দেশ স্পেন কর্তৃক প্রভাবিত হয়। তারা আরবী ভাষা শেখার চেষ্টা শুরু করে, সাহিত্য ও সভ্যতা কর্তৃক নিজেদেরকে প্রভাবিত করে।

আরবী ভাষা শেখার জন্যে যেসব বিষয় তাদেরকে প্রেরণা যোগায় তা ছিল:

১.ধর্মীয় প্রেষনা:

অমুসলিম ইউরোপীয়দের আরবী ভাষা শিক্ষার পেছনে সবচেয়ে বড় প্রেষনা ছিল ধর্মীয়। মুসলিমদের অগ্রযাত্রা রোধ এর অন্যতম একটি বড় কারণ ছিল। স্পেনের ভৌগলিক অবস্থান ইউরোপের মধ্যে হওয়ায় এবং সেখানে মুসলিম সভ্যতার চরম উৎকর্ষ সাধন হওয়ায় আশে পাশের খ্রিষ্টান অধ্যুষিত এলাকার অধিবাসীরা নিজেদের প্রভাব পুন:বিস্তারের চেষ্টা শুরু করে। আরবী বিশেষত আল- কুরআন ও ইসলামের

ভাষা হওয়ায় ইউরোপীয় খ্রিষ্টানরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম সম্পর্কে জানার জন্যে আরবী ভাষা শিক্ষা করা শুরু করে। পাশাপাশি তারা আরব সাহিত্য- সংস্কৃতির প্রতিও আগ্রহান্বিত হয়।[১৫০]

প্রথম দিকে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল উপাসনালয় কেন্দ্রিক। এটা শুধু ধর্মীয় শিক্ষাদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এরপর তারা প্রাচ্যের শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাদের শিক্ষার ধরন ও পরিধি বাড়তে থাকে। তবে তারা প্রাচ্যের শিক্ষা- সংস্কৃতিকে অনুসরণ করলেও ধর্মীয় অংশকে অবজ্ঞা করে।[১৫১]

২.জ্ঞানার্জনের তাড়না:

ইউরোপীয়দের আরবী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণের আরেকটি অন্যতম কারণ তাদের জ্ঞানার্জনের তাড়না। স্বভাবতই তারা পার্শ্ববর্তী দেশ মুসলিম স্পেন কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন উপায়ে জ্ঞান চর্চা শুরু করে।

১১ শতক থেকে আরবীতে রচিত জ্ঞান ও দর্শনমূলক গ্রন্থগুলো ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদের কাজ শুরু হয়। এরপর ক্রমান্বয়ে অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়। পরবর্তীতে এসব গ্রন্থই ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠ্য সিলেবাস হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়।[১৫২]

৩.অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেষণা:

ইউরোপীয়দের আরবী ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহের আরেকটি অন্যতম কারণ ছিল তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান। ১৬ শতকে উসমানী সাম্রাজ্যের সাথে তাদের বানিজ্যিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এর ফলে তাদের জন্যে আরবী ভাষা জানা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।[১৫৩]

ইউরোপীয়দের আরবী ভাষা ও সাহিত্য আয়ত্বের ধরণ:

১.পান্ডুলিপি সংগ্রহ:

[১৫০] রিশা আব্দুল্লাহ আল খতীব ও ড. সালাহ মুহাম্মদ জার্‌রার, *আল আদাবুল আনদালুসী ফিদ দিরাসাতিল ইসতিশরাক্বিয়াতিল ব্রিতানিয়্যা*,(জর্ডান: জামেয়াতুল উরদুনিয়া, কুল্লিয়াতুদ দিরাসাতিল উলয়া, ২০০৯), পৃ. ২১

[১৫১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

[১৫২] প্রাগুক্ত, পৃ.২২

[১৫৩] প্রাগুক্ত, পৃ.২৩

ইউরোপীয়রা বিভিন্ন পন্থায় আরবী ভাষা শিক্ষা করতে শুরু করে। তন্মধ্যে তাদের প্রথম প্রচেষ্টা ছিল আরবী ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহের পান্ডুলিপি সংগ্রহ করা। তারা প্রাচ্য ও আনদালুস উভয় জায়গা থেকেই আরবী গ্রন্থগুলো সংগ্রহ করা শুরু করে । এক্ষেত্রে তারা দু'টি পন্থা অবলম্বন করে:

ক) আরবী, ইবরানী, সুরয়ানী ইত্যাদি প্রাচ্যদেশীয় ভাষা শিক্ষালাভ,
খ) আরবী পান্ডুলিপিগুলো একত্রীকরণ।

এই দুই ধরণের পন্থা অবলম্বন করে তারা একে অপরকে পান্ডুলিপি কপি করতে সাহায্য করত।এভাবে আরবী পদ্য, গদ্য, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি সংক্রান্ত গ্রন্থগুলো তাদের কাছে সংরক্ষিত হয়।[১৫৪]

এসমস্ত গ্রন্থ পরে বিভিন্ন বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় যেমন ক্যামব্রিজ ও অক্সফোর্ডের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত হয়। এমনকি ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় ব্রিটেন সবচেয়ে বেশি গ্রন্থ সংগ্রহ করে এবং তাদের এই সংগৃহীত পান্ডুলিপির সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ২৫ হাজারে।[১৫৫]

এই দুই লাইব্রেরীর পাশাপাশি আরো কিছু লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয় যেখানে আরবী গ্রন্থগুলো সংরক্ষন করা হয়। এর মধ্যে বডলিয়ান লাইব্রেরী ছিল অন্যতম। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন টমাস বডলি যিনি প্রাচ্যদেশীয় গ্রন্থের অন্যতম একজন সংগ্রাহক ছিলেন।[১৫৬] প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে এ লাইব্রেরীর সংগ্রহের সংখ্যা ছিল খুব কম। পরে এর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

১৬শ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে বইএর সংখ্যা ছিল সীমিত। এই শতকে ১৬২৯ সালে আব্রাহাম উইলক লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হন। তিনি তথায় গ্রন্থের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সম্যক ভূমিকা পালন করেন।[১৫৭]

উইলক ইংল্যান্ডে আরবী ভাষা শিক্ষার বিস্তারে অসামান্য অবদান রাখেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ভাষা চেয়ার স্থাপন করেন।[১৫৮]

২)পান্ডুলিপির তালিকাকরণ:

[১৫৪] প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫
[১৫৫] প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭
[১৫৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
[১৫৭] হাম্মাদা মুহাম্মদ মাহের, *আলমাকতাবাতু ফিল 'আলাম*, (১৯৮১), পৃ. ২৪২/ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
[১৫৮] রিশা আব্দুল্লাহ আল খতীব ও ড. সালাহ মুহাম্মদ জার্‌রার, *আল আদাবুল আনদালুসী ফিদ দিরাসাতিল ইসতিশরাক্বিয়াতিল ব্রিতানিয়্যা*,প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

ইউরোপীয়রা আরবী ভাষা আয়ত্তের জন্যে যে পন্থাগুলো অবলম্বন করেছিল তন্মধ্যে আরেকটি ছিল আরবী গ্রন্থগুলোর তালিকাভুক্তিকরণ। তারা যেসব গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিল সেগুলোর তালিকা প্রস্তুত করে সংরক্ষণ করেছিল। ব্রিটেনে সবচেয়ে প্রাচীন তালিকাটি ছিল বডলিয়ান লাইব্রেরীর যা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত ছিল। এতে খ্রিষ্টীয় আরবী পান্ডুলিপির সংখ্যা ১০৫ টি এবং ইসলামী আরবী পান্ডুলিপির সংখ্যা ছিল ১২১৯ টি। ১৭৮৭ সালে ল্যাটিন ভাষায় এটা প্রস্তুত করা হয়।[১৫৯]

এ ছাড়াও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী সহ ব্রিটেনের আরো বিভিন্ন লাইব্রেরীতে প্রাচ্যদেশীয় গ্রন্থগুলোর তালিকা তৈরী করে সংরক্ষণ করা হয়। ব্রিটেনে তৎকালীন সময়ে অন্যতম ভূমিকা পালন করে "ব্রিটিশ লাইব্রেরী" যাতে আরবী ও ইসলামী অনেক গ্রন্থের সংগ্রহ বিদ্যমান ছিল এবং ইউরোপ অঞ্চলে এক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তৈরী করে নিতে সক্ষম হয়। এই লাইব্রেরীতে আরবী পান্ডুলিপির সংখ্যা ছিল প্রায় ৭ হাজার এবং ভাষা, শিক্ষা, ধর্ম সব মিলিয়ে এর গ্রন্থের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল প্রায় ৪০ হাজারে।[১৬০]

ইউরোপীয় সাহিত্যের উপর আনদালুসীয় সাহিত্যের প্রভাবঃ

ইউরোপীয়রা যেমন প্রাচ্য থেকে আরবী গ্রন্থ সমূহ সংগ্রহ করে ও সেগুলো কর্তৃক প্রভাবিত হয় তেমনি আনদালুসীয় আরবী সাহিত্যও তাদের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। তারা আনদালুসের সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একই পন্থা অবলম্বন করে। আরবী ভাষা ও সাহিত্যকে আয়ত্ত্ব করা ও জানার জন্যে একমাত্র প্রধান উপায় ছিল অনুবাদ ও সংকলন।

ইউরোপীয়গণ কর্তৃক আনদালুসী গ্রন্থ থেকে প্রথম অনুদিত ও সংকলিত গ্রন্থ "রিসালাতু হায়্যি ইবন ইয়াকজান" (رسالة حى بن يقذان) এটি ১৭০৮ সালে প্রথম আরবী থেকে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করা হয়।[১৬১]

১৯১৫ সালে আনদালুসী কবিতার উপরে ইউরোপীয়দের দ্বারা "The Wisdom of East" سلسلة حكمة الشرق প্রকাশিত হয়। এটা মূলত সেভিলের শাসক কবি মু'তামাদ ইবন আব্বাদের কবিতার

[১৫৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
[১৬০] প্রাগুক্ত, পৃ.৪১/ Auchterlonie, Paul, *Collections in British Libraries on Middle Eastern and Islamic Studies.* (Ed.) (1981), p.25
[১৬১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

ইংরেজী অনুবাদ ছিল। তবে এই কবিতাগুলো শুধু আরবী ভাষা থেকেই অনুবাদ করা হয় নি। এর কিছু কবিতা জার্মানী অনুবাদ থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং কিছু কবিতা আরবী থেকে অনুবাদ করা হয়।[১৬২]

বিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এ অনুবাদ কর্মের সংখ্যা খুব কম ছিল। এরপর থেকে আনদালুসীয় সাহিত্য থেকে তাদের অনুবাদ কর্ম উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। ১৯৫২ সালে ব্রডহার্স্ট رحلات ابن جبير এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করে। এর পরের বছর ১৯৫৩ সালে আর্থার জন আরবারি নামক ব্যক্তি ইবন হাজম আল আনদালুসীর طوق الحمامة নামক গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ বের করেন। তিনি একই বছরে ইবন সাঈদের رايات المبرزين এর অনুবাদ পেশ করেন।[১৬৩] এভাবে তারা আনদালুসীয় সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থ ইংরেজীতে অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ শুরু করে।

ইউরোপীয়রা এ সমস্ত গ্রন্থ শুধু ইংরেজীতেই অনুবাদ করেনি, বরং অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষাতেও অনুবাদ করা হতো।

ইউরোপীয়দের উপরে আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভিন্ন ভাবে প্রভাব ফেলে।তারা আনদালুসীয় আরবী সাহিত্য ছাড়াও আরবী সাহিত্যের অন্যান্য মৌলিক গ্রন্থাবলী সংগ্রহ ও বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষা যেমন ফরাসী, জার্মান, ইতালী, ইংরেজী ইত্যাদি ভাষায় অনুবাদ করে। এ সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে কালীলা ওয়া দিমনাহ, আলিফ লাইলা ওয়া লাইলা, মাকামা ইত্যাদির মত বিখ্যাত গ্রন্থ অন্তর্ভূক্ত ছিল।

আলিফ লাইলা ওয়া লাইলা সর্বপ্রথম ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়, এরপর তা থেকে ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়। এবং সমগ্র ইউরোপে এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থটি সমাদৃত হয় এবং তথায় ফোকলোর ও ছোট গল্পের প্রসারে প্রভূত অবদান রাখে। এ গ্রন্থটি প্রথম Boccaccio এর রচিত ছোট গল্পকে প্রভাবিত করে যা الصباحات العشرة নামে প্রকাশিত হয়। তার রচিত গ্রন্থগুলো থেকে পরবর্তীতে প্রখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক শেক্সপিয়ার তার নাটক (العبرة بالخواتيم) রচনার বিষয়বস্তু গ্রহণ করেন। [১৬৪]

আরবী সাহিত্যের অন্যতম আরেকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "কালীলাহ ওয়া দিমনাহ"। এটিও ইউরোপীয় সাহিত্যের উপরে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। গ্রন্থটি মূলত ফারসী ভাষা রুযাইবিহ কর্তৃক রচিত ছিল। তা থেকে ইবন মুক্বাফফা আরবীতে অনুবাদ করেন ও এ নামে নামকরণ করেন। ইউরোপীয়রা সর্বপ্রথম এ গ্রন্থটি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করে। ইউহান্না দাকাবু নামক এক ব্যক্তি ছিলেন এর অনুবাদক। এরপর ১২৫১ সালে দশম

[১৬২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

[১৬৩] প্রাগুক্ত, পৃ.১০৩

[১৬৪] খাইরা শারিফী,*আত তারজামাতু ফিল আনদালুস ওয়া আছরুহা আলাল হিযারাতিল উরুব্বিয়্যাহ (৫০০ হি- ৯০০ হি)*, (আলজেরিয়া: জামেআতুত ত্বাহের মাওলাই সাইদাহ), পৃ. ৩৯

ফেঞ্চু স্পেনীয় ভাষায় এর অনুবাদ করতে আদেশ দেন। এর অনুবাদের বিভিন্ন অংশ স্পেনীয় সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থ যেমন রেমন্ড লুলুর libre de les maravelles (كتابالعجائب) সহ আরো কিছু গ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যায়।[১৬৫]

পদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ইউরোপীয় সাহিত্যে আরবী সাহিত্য বিশেষ করে আনদালুসীয় সাহিত্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আনদালুসে আরবী পদ্যের এক বিশেষ ধারা মুওয়াশশাহাত। এই বিশেষ ধারা ইউরোপীয় সাহিত্যের উপরে স্পষ্ট প্রভাব ফেলে। এর ফলে ইউরোপে বিশেষ করে ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি এলাকায় এক বিশেষ ধরণের গীতি কবিতার উৎপত্তি হয় যাকে تروبادور Troubadour বলা হত। মধ্যযুগ তথা ১১ শতকের দিকে এ ধরনের কবিদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়।[১৬৬]

আরবী সাহিত্য কর্তৃক প্রভাবিত ইউরোপীয়দের স্বরচিত গ্রন্থঃ

ইউরোপীয়রা আরবী ভাষা ও সাহিত্য কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে শুধু গ্রন্থ সংগ্রহ এবং অনুবাদই করেনি, বরং তারা নিজেরাও আরবী সাহিত্যের ব্যাপারে গ্রন্থ রচনা করতে সচেষ্ট হয়েছে। এসব গ্রন্থে তারা আরব সাহিত্যের ইতিহাস, অবদান, আরব সভ্যতা- সংস্কৃতি ইত্যাদি যেমন আলোচনা করতে সচেষ্ট হয়েছে তেমনি আনদালুসের সাহিত্যকেও তাদের লেখনীতে অন্তর্ভূক্ত করেছে।

তারা যেসব গ্রন্থ রচনা করে তন্মধ্যে রয়েছেঃ

১. المدخل إلى الأدب العربي (Arabic Literature: An Introduction): [১৬৭]

এ গ্রন্থটি ১৯২৬ সালে হ্যামিল্টন গিব রচনা ও প্রকাশ করেন। এখানে তিনি শুধু আনদালুসের সাহিত্য নিয়েই আলোচনা করেননি, বরং সমগ্র আরবী সাহিত্যের উপরে আলোকপাত করেছেন।

---

[১৬৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০ / ইনখাইল বালানছিয়া, অনুবাদঃ হাসান মুনিস, *তারীখুল ফিকরিল আনদালুসি*, (পোর্ট সাইদঃ মাকতাবাতুস সাকাফাতিদ দ্বীনিয়্যা), পৃঃ ৫৮১- ৫৮২

[১৬৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১/ মুহাম্মদ রজব, *আল আদাবুল আনদালুসী বাইনাত তাআছ্ছুর ওয়াত তাছির*, (আল মামলাকাতুল আরাবিয়্যাতুস সাউদিয়্যাহঃ ইদারাতুছ ছাক্বাফা ওয়ান নাছর, ১৯৮০), পৃঃ ১১৫

[১৬৭] Gibb, H.A.R. *Arabic Literature: An Introduction*. (London: Oxford University Press, Humphrey Milford, 1926)

২. The Legacy of Islam (تراث الإسلام) [১৬৮]:

গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ বের হয় **১৯৩১** সালে। এতে মুসলিম সভ্যতা- সংস্কৃতির উপরে প্রবন্ধ, নিবন্ধ ইত্যাদি সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থটি দু'টি খন্ডে রচিত এবং খন্ড দু'টির নাম, লেখক ও বিষয়বস্তুও ভিন্ন ভিন্ন। প্রথম খন্ডের রচয়িতা J. B Trend. এটি **১৯৫৮** সালে "ইসবানিয়া ওয়া বুরতুগাল" (إسبانياوالبرتغال) শিরোনামে আনদালুসী আরবী সাহিত্য নিয়ে প্রকাশিত হয়। আর দ্বিতীয় খন্ড "আল আদাব" শিরোনামে হ্যামিল্টন গিব রচনা করেন।[১৬৯]

৩. The Influence of Islam on Medieval Europe (فضل الإسلام على الحضارة الغربية) [১৭০]

ইউরোপীয় রেনেঁসার উপরে আরব ও মুসলিম সভ্যতার প্রভাব নিয়ে যেসব গ্রন্থ রচিত হয়েছিল এটি তন্মধ্যে অন্যতম। এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হিসেবে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় **১৯৭২** সালে। এর রচয়িতা ছিলেন এম. ওয়াট। এতে তিনি আরব ও মুসলিম সংস্কৃতি কর্তৃক আনদালুসের প্রভাবিত হওয়ার ধরন, তার সাহিত্য, সভ্যতা, ইউরোপে এর প্রভাব ইত্যাদি বিষয় তুলে আনেন।

৪. The Arabs and Medieval Europe (العرب وأوروبا في العصور الوسطى) [171]
এ গ্রন্থটিও ইউরোপীয় সাহিত্যের উপরে আনদালুসীয় সাহিত্যের প্রভাব নিয়ে রচিত। **১৯৭৫** সালে রচিত এ গ্রন্থটিতে নরম্যান দানিয়েল আনদালুসী আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন দিক ও ইউরোপীয় সাহিত্যে এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন। বিশেষ করে ইউরোপীয় গীতিকবিতায় আনদালুসীয় সাহিত্যের প্রভাব তুলে ধরেন।[১৭২]

৫. The Arab Influence in Medieval Europe (التأثير العربي في أوروبا في العصور الوسطى) [173]:

---

[১৬৮] Arnold, Sir Thomas and Guillaume, Alfred (Eds.), *The Legacy of Islam,* (Oxford: Clarendon Press, 1931)

[১৬৯] রিশা আব্দুল্লাহ আল খতীব ও ড. সালাহ মুহাম্মদ জার্‌রার, *আল আদাবুল আনদালুসী ফিদ দিরাসাতিল ইসতিশরাক্বিয়াতিল ব্রিতানিয়্যা*,প্রাগুক্ত, পৃ.১০৯

[১৭০] Watt, M., *The Influence of Islam on Medieval Europe,* (Edinburgh: Edinburgh University Press,1972)

[১৭১] Daniel, Norman, *The Arabs and Medieval Europe*, (London and New York: Longman, Librairie du Liban,1975)

[১৭২] রিশা আব্দুল্লাহ আল খতীব ও ড. সালাহ মুহাম্মদ জার্‌রার, *আল আদাবুল আনদালুসী ফিদ দিরাসাতিল ইসতিশরাক্বিয়াতিল ব্রিতানিয়্যা*,প্রাগুক্ত, পৃ.১১০

[১৭৩] Agius, Dionisius and Hitchcock, Richard (Eds.), *The Arab Influence in Medieval Europe,* (London: Ithaca Press,1997)

এ গ্রন্থটি মূলত একটি গবেষনা সংকলন ছিল যা ১৯৯০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সম্মেলনে উপস্থাপন করা হয় এবং ১৯৯৭ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

এছাড়াও তারা আরো বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করে যেগুলো স্পেনের মুসলিম ইতিহাস ও এর প্রভাবের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। এসব গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ:

১. History of The Moorish Empire in Europe(تاريخ الإمبراطورية الإسلامية في أوروبا):[174]

স্যামুয়েল স্কট গ্রন্থটি ১৮৯৮ সালের আগে রচনা করেন , তবে তা প্রকাশিত হয় ১৯০৪ সালে। এতে ইউরোপ কর্তৃক গ্রহণকৃত আরব ও মুসলিম সভ্যতা- সংস্কৃতি নিয়ে আলোকপাত করা হয়। এতে জাহেলী যুগ থেকে শুরু করে ইসলামী যুগ সহ বিভিন্ন সময়ে আরবদের সভ্যতা, স্পেনে ইসলামের আগমন ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা করা হয়। এছাড়াও এতে স্পেনীয় আরবী সাহিত্য নিয়েও আলোচনা লক্ষণীয়।[১৭৫]

২. Spain from the South (إسبانيا من الجنوب)[176] :

এটিতে মূলত পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলোর মত বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়নি, বরং স্পেনে যেসব পরিব্রাজক বা বিভিন্ন দেশ থেকে যেসব মানুষের আগমন ঘটেছিল এবং তারা যেভাবে প্রভাবিত হয়েছিল ও অন্যদেরকে প্রভাবিত করেছিল তার বর্ণনা এসেছে। এছাড়াও এতে লেখক একটি অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন Hispano-Maurisque Poetry, যাতে তিনি প্রথমে আনদালুসে মুসলিম শাসনের বর্ণনা দিয়েছেন। এরপর স্পেন থেকে মরিস্কোদের বিতারনের আগ পর্যন্ত সময়ের আনদালুসীয় কবিতার আলোচনা করেছেন। এতে তিনি আনদালুসে মুসলিম উত্থান থেকে পতন পর্যন্ত সময়ের বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন।[১৭৭]

৩. The Splendour of Moorish Spain(مدنية المسلمين في إسبانيا)[178]:

---

[১৭৪] Scott, S. P., *History of the Moorish Empire in Europe,* (London: Philadelphia, Lippincott Company, 1904).

[১৭৫] রিশা আব্দুল্লাহ আল খতীব ও ড. সালাহ মুহাম্মদ জার্‌রার, *আল আদাবুল আনদালুসী ফিদ দিরাসাতিল ইসতিশরাক্বিয়াতিল ব্রিতানিয়্যা*,প্রাগুক্ত, পৃ.১১২

[১৭৬] Trend, J.B. , *Spain from the South,* (London: DARF Publisher Ltd. 1990)

[১৭৭] রিশা আব্দুল্লাহ আল খতীব ও ড. সালাহ মুহাম্মদ জার্‌রার, *আল আদাবুল আনদালুসী ফিদ দিরাসাতিল ইসতিশরাক্বিয়াতিল ব্রিতানিয়্যা*,প্রাগুক্ত, পৃ.১১২

[১৭৮] McCabe , Joseph , *The Splendour of Moorish Spain,* (London: Watts and Co, 1935)

এটিও আনদালুসে মুসলিম শাসন, তাদের প্রভাব, আনদালুসীয় আরবী সাহিত্য, সভ্যতা- সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে রচিত।এতে আরো বিশেষ করে আনদালুসে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

উপরোল্লিখিত এসব গ্রন্থ ছাড়াও ইউরোপীয় লেখকরা আরো অনেক গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন যাতে আনদালুসের সাহিত্য, আরবদের প্রভাব, মুসলিম ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

জ্ঞান- বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক লেখনীর ক্ষেত্রে তাদের যে সমস্ত অবদান ছিল তন্মধ্যে:

১. The Encyclopaedia of Islam(دائرة المعارف الإسلامية) [179] :

ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদদের উল্লেখযোগ্য কর্ম হলো The Encyclopaedia of Islam. এটা তাদের মৌলিক উৎস হিসেবে বিবেচিত। ইউরোপীয়রা যেসব প্রাচ্যদেশীয় জ্ঞান- বিজ্ঞানের ভান্ডার সংগ্রহ করেছিল এটাকে সেগুলোর সারসংক্ষেপ বা সংকলন বলা যায়।

এর প্রথম সংস্করণ ১৯১৩ সাল থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে ইংরেজী, ফরাসী ও জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের কাজ ১৯৪৫ সালে শুরু হয় এবং ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ একাডেমিকস এর তত্ত্বাবধায়নে ব্রিল কর্তৃক লেইডেনে প্রথম মুদ্রন বের হয়। নতুন সংস্করণ যাদের তত্ত্বাবধায়নে প্রকাশিত হয় তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন: হ্যামিল্টন গিব, বার্নার্ড লুইস প্রমুখ ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ।[১৮০]

২. ম্যাগাজিন বা জার্নাল প্রকাশনা:

ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদদের অন্যতম আরেকটি কাজ ছিল ম্যাগজিন প্রকাশনা যাতে তারা আরব, আনদালুস ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের মধ্যে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাহিত্য মূলক প্রভাব ও এসবের অবদান নিয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ, নিবন্ধ ইত্যাদি লিখতেন। প্রথম প্রাবন্ধিক হিসেবে স্যামুয়েল স্টার্নকে গণ্য করা হয় যিনি আনদালুসের এক বিশেষ ধারার গীতি কবিতা "মুওওয়াশশাহাত" নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন। এ প্রবন্ধটি মাদ্রিদ থেকে প্রকাশিত "মাজাল্লাতুল আনদালুস" নামক ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়।[১৮১]

---

[১৭৯] *The Encyclopaedia of Islam,* 11 vols. Prepared by A Number Of Leading Orientalists , (Under The Patronage Of The International Union Of Academics, Leiden – New York: E. J. Brill, New Edition:1960-2002)

[১৮০] রিশা আব্দুল্লাহ আল খতীব ও ড. সালাহ মুহাম্মদ জার্‌রার, *আল আদাবুল আনদালুসী ফিদ দিরাসাতিল ইসতিশরাক্বিয়াতিল ব্রিতানিয়্যা*,প্রাগুক্ত, পৃ.১১৪

[১৮১] প্রাগুক্ত, পৃ.১১৭

ব্রিটেনে প্রকাশিত ম্যাগাজিনগুলোর মধ্যে আনদালুসীয় সাহিত্যের উপরে আলাদা কোন বিশেষায়িত পত্রিকা ছিল না। আরবী ভাষা, সাহিত্যমূলক ও ইসলামী যেসব ম্যাগাজিন ছিল তাতে আনদালুসীয় সাহিত্যের উপরে রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশিত হত।

এ সব ম্যাগাজিনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো:

1. Journal of The Royal Asiatic Society (مجلةالجمعيةالآسيويةالملكية) :

এটা ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রকাশনা। ম্যাগাজিনটি ১৮৩৪ সাল থেকে প্রকাশিত হয়। এতে প্রাচ্যীয় আরবী গদ্য, পদ্য, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ক লেখনী প্রকাশিত হত।[১৮২]

2. Bulletin of the British Society for Middle Eastern Studies (مجلةالجمعيةالبريطانية للدراسات الشرق اوسطية):

বুলেটিনটি ব্রিটিশ সোসাইটি ফর মিডল ইস্টার্ন স্টাডিজ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত এই নামে প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯৯১ সাল পর্যন্ত The British Journal of Middle Eastern Studies নামে এর প্রকাশনা অব্যাহত থাকে।[১৮৩]

3. Al-Masaq(مجلةالمساق):

এটা ১৯৮৮ সালে Society for the Medieval Mediteranean এর পক্ষ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। এতে হিজরী নবম শতক পর্যন্ত ইসলামী স্যভতা- সংস্কৃতির উপরে গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশের ব্যাপারে গুরুত দেয়া হত।[১৮৪]

4. Bulletin of Hispanic Studies(مجلةالدراساتالإسبانية):

এ বুলেটিনটি লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্প্যানিশ স্টাডিজ বিভাগ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। এতে স্পেন, পর্তুগাল ও ল্যাটিন আমেরিকার ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদির উপরে গুরুত্বারোপ করা হতো।[১৮৫]

5. Al-Andalus (مجلةالأندلس):

[১৮২] প্রাগুক্ত, পৃ.১১৭
[১৮৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮
[১৮৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮
[১৮৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

এটা গ্রানাডা ও মাদ্রিদের আরবী ভাষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যাগাজিন। ম্যাগাজিনটি ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত বছরে দুই বার করে প্রকাশিত হত। এরপর ১৯৭৮ সালে এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে পুনরায় ১৯৮০ সাল থেকে Al-Qantara নামে প্রকাশিত হতে থাকে।[১৮৬]

[১৮৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

স্পেনীয় আরবী গদ্যের প্রকরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বক্তৃতা (الخطابة)

আনদালুসে আরবী গদ্য সাহিত্যের প্রথম এবং অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল বক্তৃতা। স্পেন বিজয়ের সাথে সাথেই বক্তৃতা সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয়। বিজয়ের প্রাক্কালে সেনাপতি তারিক ইবন যিয়াদ এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। এটাই ছিল মুসলিম স্পেনের ইতিহাসে প্রথম বক্তৃতা।এরপর সেখানে অন্যান্য নববিজিত এলাকার ন্যায় বক্তৃতা জারি থাকে।

এসব বক্তৃতা সাধারনত দুইটি উদ্দেশ্যে প্রদান করা হত। প্রথমত ধর্মীয় কারণ এবং দ্বিতীয়ত রাজনৈতিক কারণ। নবগঠিত মুসলিম রাজ্যে ইসলাম ধর্ম সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং ইসলামী অনুশাসন সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে এটা ছিল অন্যতম মাধ্যম। আবার রাজনৈতিকভাবে রাজ্যেকে সুসংগঠিত করতেও বক্তৃতার

প্রয়োজন ছিল অপরিসীম। তবে পরবর্তীতে বক্তৃতা এই দুই গন্ডি থেকে বের হয়ে সুপরিসর আঙ্গিকে সাহিত্যিক রূপ লাভ করে।

যখন আনদালুসে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প- সাহিত্যের প্রসার ঘটে তখন মানুষ বক্তৃতা সম্পর্কিত বিভিন্ন আলোচনা- সমালোচনা, দার্শনিক তত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে আগ্রহী হয়ে পড়ে এবং এসব নিয়ে চর্চা শুরু করে। ফলে বক্তৃতার নানান দিক তাদের সামনে উন্মোচিত হয়। এর রীতি-নীতিতেও পরিবর্তন আসে। বক্তৃতাকে তারা ছন্দময় ও প্রাণবন্ত করে শিল্পে রূপ দেয়।

বক্তৃতা সাহিত্য আনদালুসে জ্ঞান চর্চার অন্যতম এক মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। সেসময় ভাব আদান প্রদান বা মতামত ব্যক্ত করার জন্যে পত্রিকা বা এ জাতীয় অন্য কোন মাধ্যম ছিল না। তখন মতামত প্রদান ও কোন প্রতিনিধিদলের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের একমাত্র মাধ্যম ছিল বক্তৃতা।

বক্তৃতার এক আনুষঙ্গিক বিষয় ছিল বিতর্ক। তখন সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিতর্ক অনুষ্ঠান হত। সেখানে বহিরাগতরাও অংশগ্রহণ করতে পারতেন। ইবন রুশদ এবং ইবন যুহর সেসময়ের অন্যতম প্রখ্যাত বিতার্কিক ছিলেন।

তবে বার্বার শাসনামলে এসে বক্তৃতা সাহিত্য স্তিমিত হয়ে পড়ে। আবারো শুধু মসজিদে ওয়াজ- নসিহতের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।[১৮৭]

বক্তৃতার প্রকারঃ

মুসলিম স্পেনের শুরুর দিকে বক্তৃতা প্রধানত দুই ধরনের হলেও পরে তা আরো আঙ্গিকে প্রকাশ পায়। আনদালুসের বক্তৃতা সাহিত্যকে তিন ধরনে বিভক্ত করা যায়। যথা: রাজনৈতিক বক্তৃতা, সামাজিক বক্তৃতা ও ধর্মীয় বক্তৃতা।[১৮৮]

১.রাজনৈতিক বক্তৃতাঃ

বক্তৃতা সাহিত্যের অন্যতম প্রকরণ ছিল রাজনৈতিক বক্তৃতা। এ ধরণের বক্তৃতা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রদান করা হত। যেমন খলিফার কোন জারি করা রীতি নীতি মানুষের মধ্যে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হলে বা

[১৮৭] হান্না আল ফাখুরী, *তারীখুল আদাবিল আরব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২০

[১৮৮] আব্দুল আযীয মুহাম্মদ ঈসা, *আল আদাবুল আরাবী ফিল আনদালুস*, (কায়রো: মাতবাআতুল ইসতিকামা, ১৯৩৬), পৃ.৫৩

কাউকে কোন দলের প্রতি আকৃষ্ট করতে অথবা যেকোন ধরণের রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের প্রয়োজন সাপেক্ষে এসব বক্তৃতা প্রদান করা হত।

আবার বিভিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিদ্রোহ দমনে সেনাবাহিনীকে অনুপ্রেরণা ও দিক নির্দেশনা প্রদান ইত্যাদিও রাজনৈতিক বক্তৃতার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

নবগঠিত আনদালুসকে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করতে এসব রাজনৈতিক বক্তৃতার গুরুত্ব ছিল অনস্বীকার্য। হাজার হাজার মাইল দূরে থেকে দামেস্কের উমাইয়া খেলাফতের অধীনে এই মুসলিম সাম্রাজ্যের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান সুদৃঢ় করে এধরণের বক্তৃতা।

২. সামাজিক বক্তৃতাঃ

এ ধরনের বক্তৃতা সাধারনত কোন দলকে অভিনন্দন জানাতে বা যুদ্ধে জয়লাভ করলে বা সামাজিক কোন সভা-সমাবেশে প্রদান করা হত। আবার কোন মজলুম ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর পক্ষে সুপারিশও এ ধরনের বক্তৃতার মাধ্যমে দেয়া হত।

৩. ধর্মীয় বক্তৃতাঃ

ধর্মীয় বক্তৃতা ছিল মূলত ওয়াজ-নসিহত। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পরে আনদালুসের মানুষকে ইসলামের মৌলিক নীতি সম্পর্কে অবহিতকরণ, তাদেরকে ইসলামী জ্ঞান দান, ইসলামের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এ ধরনের বক্তৃতার উৎপত্তি হয়। এগুলো বিশেষ করে জুমুআ, ঈদ, বিশেষ কোন সময়ে প্রদান করা হতো। এ ধরনের বক্তৃতাই আনদালুসে সবচেয়ে বেশি প্রসার লাভ করে। এ ধারার অন্যতম বক্তা ছিলেন লিসানুদ্দীন ইবনুল খাতীব, কাযী মুনযির ইবন সাঈদ প্রমুখ। মুরাবিতীন ও মুওয়াহিদীনদের সময়ে বক্তাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি পায়। এ সময়ের প্রসিদ্ধ বক্তা ছিলেন আবুল হাসান ইবন শারীহ, কাযী আয়ায, আবু বকর আত তারতুশী প্রমুখ। খতীব কাযী আয়াযের বক্তৃতা মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল।

বক্তৃতা থেকে উপদেশমূলক বক্তৃতার উদ্ভব হয়। এটা সাহিত্যিকদের কাছে وصايا নামে পরিচিত। উপদেশমূলক বক্তব্যও বক্তৃতার মত করেই একই রীতি-নীতি নিয়ে বিকাশ লাভ করে। তবে প্রথমদিকে এতে কোন শব্দের বা বাক্যের বাহুল্য ছিল না, খুবই স্বল্প পরিসরে সর্বসাধারণের বোধগম্য করে বলা হত। পরবর্তীতে বক্তৃতার মত এতেও শব্দ বাহুল্য, ছন্দ, বাগ্মীতা ইত্যাদি এসে যোগ হয়। এমনকি সহজবোধ্য

স্বল্প পরিসর থেকে তারা এই উপদেশমূলক বক্তব্যকে বের করে আনে এবং প্রবাদ-প্রবচন, উপমাময় সুদীর্ঘ বক্তব্যে রূপ দেয়।[১৮৯]

আনদালুসের অধিবাসীদের কাছে বক্তৃতা ছিল জীবনের অভিব্যক্তি। বক্তারা তাঁদের নিপুণতা দিয়ে বক্তৃতার মাধ্যমে মূলত আনদালুসের জীবনযাত্রার নানান রূপই তুলে ধরতেন। বক্তৃতায় তাঁরা বিভিন্ন ধরণের উপমা এমনকি পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরা থেকেও উপমা দিতেন। বক্তৃতাকে তাঁরা এমনভাবে পরিবর্তন করেন যে প্রথম দিকের বক্তৃতার সাথে তার আর কোন মিলই অবশিষ্ট থাকেনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পত্র লিখন (الرسائل)

মুসলিম শাসনের কেন্দ্রবিন্দু দামেস্কে হওয়ায় আনদালুসের সাথে যোগাযোগের একমাত্র ও অন্যতম মাধ্যম ছিল চিঠি-পত্র। খলিফার কোন আদেশ জারি বা রাজ্যের কোন সংবাদ খলিফার কাছে প্রেরণ কিংবা কোন অভিযোগ জানানো সবকিছুই একমাত্র চিঠি-পত্রের মাধ্যমে করা হত।

আনদালুসের বিজয় পরবর্তী সময় থেকে শুরু করে প্রথম শতক পর্যন্ত পত্র সাহিত্যের অবস্থা একই রকম ছিল। এসময়ের পত্র সাহিত্য শুধু রাজনৈতিক ও তদানুরূপ পত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। বক্তৃতা সাহিত্যের প্রথম লগ্নের মত পত্র সাহিত্যের সূচনাও ছিল বাহুল্যবর্জিত। তখন এর ভাষা ছিল সংক্ষিপ্ত ও সহজে বোধগম্য।

[১৮৯] আব্দুল আযীয মুহাম্মদ ঈসা, *আল আদাবুল আরাবী ফিল আনদালুস*, প্রাগুক্ত, পৃ.৬১

পরবর্তীতে আনদালুসে যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার প্রসার শুরু হল এবং সার্বিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রা শুরু হল তখন থেকে চিঠি-পত্রের রূপ বদলে যেতে থাকল। সাধারণ চিঠি-পত্র থেকে তা তখন পত্র সাহিত্যের রূপ লাভ করল।

এসময়ে আনদালুসে যে লাইব্রেরীগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেগুলোতে বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন ভাষার বই-পুস্তক সংগ্রহ করে রাখা হত। এসব সংগৃহীত বইয়ের মধ্যে পত্রসাহিত্যের অনেক সংকলন গ্রন্থ ছিল। এ সমস্ত সংকলন আনদালুসের পত্র সাহিত্যের উপরে অনেক প্রভাব ফেলে। এছাড়াও জীবন যাত্রার উন্নয়ন, স্বাধীন শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন, পরিবেশগত প্রভাব ইত্যাদি ছিল পত্র সাহিত্যের অগ্রযাত্রার অন্যতম কারন।

এ সময়ে পত্র সাহিত্য এক স্বতন্ত্র সাহিত্যে রূপ নেয় এবং এর দুই ধারার উদ্ভব হয়। যথা: প্রাতিষ্ঠানিক (ديواني) ও সাহিত্যমূলক (ادبي)।[১৯০]

প্রাতিষ্ঠানিক (ديواني) পত্রসাহিত্য ছিল খলিফা, আমীর- ওমরাহ বা ও রাষ্ট্রের অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আদেশ, নিষেধ, ফরমান, অভিযোগ, অসিয়ত ইত্যাদি সম্বলিত পত্র যা শুধু দাপ্তরিক কাজে লিখিত হত। এর মধ্যে সাহিত্যের কোন ভাব না থাকলেও একে এক প্রকার সাহিত্য হিসেবে বিবেচনা করা হত। এর গন্ডি ছিল সীমাবদ্ধ। রাষ্ট্রীয় কাজ পরিচালনার উদ্দেশ্যেই এর প্রচলন ছিল। তবে আব্দুর রহমান আন নাসির একে সব ধরনের উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করেন। যখন বাগদাদ কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা দূর্বল হয়ে পড়ে এবং খলিফা আল মুকতাদির বিল্লাহ নিহত হন তখন তিনি এক পত্র লিখেন যা গতানুগতিক দাপ্তরিক পত্রের বাইরে ছিল।[১৯১]

আর সাহিত্যমূলক (ادبي) পত্রসাহিত্যই ছিল মূল সাহিত্যের অংশ। এতে সকল ধরনের লেখনী অন্তর্ভূক্ত ছিল। চিঠি-পত্র বলতে শুধু ব্যক্তিগত বা দাপ্তরিক পত্র বুঝায়। কিন্তু সাহিত্যমূলক পত্রসাহিত্যের সংজ্ঞাই ভিন্ন রকমের। এতে শুধু ব্যক্তিগত চিঠি-পত্রই নয়, বরং বিভিন্ন ধরনের লেখনী যেমন আলোচনা, সমালোচনা, গল্প, মাকামা ইত্যাদিও অন্তর্ভূক্ত ছিল। এধরনের পত্রসাহিত্যের বিষয়বস্তুতেও বিভিন্নতা ছিল। কবিতা বা গদ্যের মত এতেও প্রশংসা, নিন্দা, বর্ণনা, প্রণয়, শোকগাঁথা, বৈরাগ্য, অনুতাপ, গুণকীর্তন ইত্যাদি ফুটে উঠত।

[১৯০] হান্না আল ফাখুরী, *তারীখুল আদাবিল আরব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২১

[১৯১] আব্দুল আযীয মুহাম্মদ ঈসা, *আল আদাবুল আরাবী ফিল আনদালুস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

বর্ণনা ছিল এ ধারার অন্যতম বিষয়বস্তু। এর এক বিশাল অংশ জুড়ে ছিল এর অবস্থান। সাহিত্যিকরা তাদের লেখনীতে প্রকৃতি, শহর-নগর, নদ-নদী, গাছ-পালা, ভ্রমন, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদির বর্ণনা তুলে ধরতেন। শব্দের বিচিত্রতা, ছন্দময় বাক্যের ব্যবহার, বিভিন্ন ধরনের উপমা, আরবী প্রবাদ, কবিতার পংক্তি, বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা, কুরআন- হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনা তাঁরা তাঁদের লেখনীতে নিয়ে আসতেন। এসব সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রখ্যাত ছিলেন ইবন যায়দুন, ইবন শুহাইদ, ইবন বুরদ আল আসগর, ইবন আবদুন, ইবন ইদরীস, ইবনুল খতীব প্রমুখ।[১৯২]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
মাকামা (المقامة)

গদ্য সাহিত্যের অন্যতম বিষয়বস্তু হলো মাকামা। এটা এক বিশেষ ধরনের ছোট গল্প। এর উৎপত্তি হয় আব্বাসী আমলে বদীউজ্জামান আল হামাদানীর হাত ধরে। এ গল্পে সাধারণত দুটি চরিত্র থাকত। একজন লেখক নিজে, আরেক জন থাকত মূল নায়ক। এ ধরনের গল্পে লেখক বর্ণনাকারীর ভূমিকায় থাকতেন । প্রতি গল্পেই তাঁর সাথে কোন এক মজলিসে নায়কের দেখা হত। তিনি নায়কের সাথে দেখা হওয়া থেকে শুরু করে মজলিসের শেষ পর্যন্ত মাকামায় বর্ণনা করতেন। উভয় চরিত্রই ছদ্মনামে থাকত এবং একজন লেখক তাঁর সব মাকামায় একই নাম ব্যবহার করতেন।

[১৯২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২১

প্রথম মাকামা রচয়িতা বদীউজ্জামান আল হামাদানীর মাকামার সুখ্যাতি আরব- অনারব সব প্রান্তেই ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি তাঁর এই মাকামা সুদূর আনদালুসেও এসে পৌঁছায়। তাঁর "মাকামাতুল ইবলিসিয়্যাহ" অনুকরণে সর্বপ্রথম ইবনু শুহাইদ "আত তাওয়াবে' ওয়ায যাওয়াবে' " রচনা করেন। এতে জ্বিনদের উপত্যকায় কবি-সাহিত্যিকদের শয়তানের সাথে তাঁর সাক্ষাতের বর্ণনা দিয়েছেন। সেখানে লেখকের সাথে বদীউজ্জামানের শয়তানের সাক্ষাত হয়। এছাড়াও ইবন বাস্‌সাম তাঁর "যাখীরা" তে তিনটি মাকামার বর্ণনা নিয়ে এসেছেন। তবে এসব মাকামা বদীউজ্জামানের মাকামার মত ছিল না। এতে কোন একটি বা একাধিক বিষয়বস্তুর অবতারনা ছিল। আর এসব মাকামায় কোন ছন্দ, হাসি-ঠাট্টা ইত্যাদিও ছিল না যা বদীউজ্জামান বা অন্যান্য আব্বাসী সাহিত্যিকের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়।

ইবন বাস্‌সামের বর্ণিত তিনিটি মাকামার প্রথমটি ছিল আবু হাফস উমর ইবন শুহাইদ কর্তৃক রচিত। তিনি মু'তাসিম ইবন সুমাদিহ এর অন্যতম একজন কবি ছিলেন। এ মাকামায় তিনি তাঁর সফরের কাহিনী ও সফরে থাকাকালীন সময়ের প্রাকৃতিক অবস্থার বর্ণনা তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয়টি ছিল আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আযীযের মাকামা। আর তৃতীয়টি ছিল আবু মুহাম্মদ ইবন মালিক আল কুরতুবীর মাকামা। ইবন মালিক তাঁর মাকামায় আলমেরিয়ার শাসক আল মু'তাসিম ইবন সুমাদিহ ও তাঁর শাসনকার্য, সেনাবাহিনীসহ সবকিছুর প্রশংসা বর্ণনা করেন।[১৯৩]

হামাদানী পর্ব শেষ হলে আনদালুসীয়রা হারীরীর মাকামার দিকে ঝুঁকে পড়ে। হারীরী ছিলেন হিজরী পঞ্চম শতকের শেষ দিকে আব্বাসী যুগের দ্বিতীয় প্রধান মাকামা রচয়িতা। তাঁর মাকামার সুখ্যাতিও দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এর প্রভাব আনদালুসে এসেও পৌঁছায়। আনদালুস থেকে অনেকেই প্রাচ্যে গমন করতেন এবং হারীরীর মাকামা শুনতেন। এরপর তাঁরা আনদালুসে ফিরে তাঁর মাকামার কথা মানুষের কাছে পৌঁছাতেন। হারীরীর মাকামা সুদূর আনদালুস পর্যন্ত নিয়ে যেতে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আবুল কাসেম ঈসা ইবন জহুর আল কুরতুবী। তিনি হারীরীর মাকামা শুনে এসে তা মানুষের কাছে বর্ণনা করতেন। তাঁর নিকট থেকে যারা শুনেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আবুল আব্বাস আশ শারিসী। তিনি আরো অনেকের কাছ থেকেই হারীরীর মাকামা শ্রবণ করেন এবং তার ব্যাখ্যায় গ্রন্থ রচনা করেন।[১৯৪]

এ সময় একদল সাহিত্যিক হারীরীর মাকামার ব্যাখ্যা রচনা করেন এবং এর প্রচার, প্রসারের উপরে গুরুত্বারোপ করেন। অনেকে তাঁর মাকামার বিকল্প মাকামাও রচনা শুরু করেন। হামাদানীর মাকামা অনুসরণ করে যারা মাকামা রচনা করেছেন তাদের মতই এদের মাকামাও ভিন্ন ধাঁচের ছিল। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আবু আব্দুল্লাহ ইবন আবিল খিসাল। তিনি তাঁর দিওয়ানুর রাসায়েলে এক দীর্ঘ মাকামা

[১৯৩] শাওকী দ্বাইফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী 'আসরুদ দুওয়ালি ওয়াল ইমারাতিল আনদালুস* , প্রাগুক্ত, পৃ.৫১৮
[১৯৪] ড. মুহাম্মদ রিদওয়ান আদ দায়িয়্যা, *ফিল আদাবিল আনদালুসিয়া*, (দামেস্ক: দারুল ফিকর, ২০০০), পৃ. ২৫৭

রচনা করেন। এটা হারীরীর মাকামা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। এ ছাড়াও এ ধাঁচের আরেকজন প্রসিদ্ধ মাকামা রচয়িতা ছিলেন আবুত ত্বাহের মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ ইবন আব্দুল্লাহ আত তামিমী আল মাজিনী। তিনি তাঁর সময়ের একজন বড় মাপের লেখক ও কবি ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তবে তাঁর প্রসিদ্ধ মাকামা হলো "আল লুযূমিয়্যা"। এটা ছিল ৫০টি মাকামার সংকলন। তাঁর এই মাকামাগুলো ছিল ছন্দবদ্ধ ও তার অধ্যায়গুলো ছন্দের হিসাবে নামকরণ করা হয়েছিল। এই মাকামায় প্রধান দুই নায়ক ছিলেন আস সাইব ইবন তাম্মাম ও শায়খ আবু হাবীব।[১৯৫]

আনদালুসে মাকামা চর্চা জনপ্রিয়তা পাওয়ার পরে সেখানে দুই ধরনের মাকামা চর্চা লক্ষ্য করা যায়। এক ধরনের মাকামা ছিল পদ্য সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও পত্রসাহিত্যের বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত। আর দ্বিতীয় প্রকার মাকামা ছিল হামাদানী বা হারীরীর মাকামার অনুরূপ। প্রথম প্রকার মাকামার মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল মুহাম্মদ ইবন আয়াযের "আল মাকামাতুদ দাওহিয়্যা", মুহারিব ইবন মুহাম্মদ ইবন মুহারিব আল ওয়াদীর " আল মাকামাতুল 'ইয়াদিয়্যা", আবুল হাসান আন নাবাহীর " আল মাকামাতুন নাখলিয়্যা" ইত্যাদি। এ মাকামাগুলোর বিষয়বস্তু কবিতার বিষয়বস্তুর ন্যায়। যেমন প্রথমটি প্রণয়মূলক, দ্বিতীয়টি কাযী আয়াযের প্রশংসায় রচিত এবং তৃতীয়টি গৌরবগাঁথা ছিল।[১৯৬]

এ ছাড়াও এসময়ে অনেক সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয়মূলক মাকামাও রচিত হয়।

প্রখ্যাত আনদালুসীয় সাহিত্যিক লিসানুদ্দীন ইবনুল খতীবের মাকামা রচনায় বিশেষ অবদান রয়েছে। তিনি রাজনৈতিক মাকামা রচনা করেন। তাঁর মাকামায় তিনি বিভিন্ন রকম রাজনৈতিক উপদেশ, রাজ কর্মচারীদের কাজ- কর্ম, তাদের কষ্ট ইত্যাদি বর্ণনা করেছেন।

আর দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিল আবু ত্বাহের আল মাজিনী, ইবন আবী খিসাল প্রমুখের মাকামা যারা হারীরীকে অনুসরণ করেছেন।

মাকামা মূলত এমন এক ধরনের ছন্দযুক্ত গদ্যসাহিত্য যার মাধ্যমে কোন এলাকার পরিবেশ, পরিস্থিতি, ঘটনা প্রবাহ ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়। আনদালুসীয় সাহিত্যিকগণ তাঁদের মাকামায় আনদালুসের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিভিন্ন ভাবে তুলে ধরেছেন।

---

[১৯৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০

[১৯৬] শাওকী দ্বাইফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী 'আসরুদ দুওয়ালি ওয়াল ইমারাতিল আনদালুস* , প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২০

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভাষাবিজ্ঞান (علوم اللغة)

আনদালুসে সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি এর সহায়ক হিসেবে ভাষাবিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়। এর মধ্যে ব্যকরণ, অভিধান, বাগ্মীতা, সমালোচনা সাহিত্য ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত ছিল। কুরআন, হাদীস সহ অন্যান্য দ্বীনি জ্ঞান বিশুদ্ধভাবে জানার জন্যেই মূলত এ শাস্ত্রের উৎপত্তি। প্রথমদিকে ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় প্রাচ্যকে অনুসরণ করা হত। হিজরী তৃতীয় ও চতুর্থ শতকের দিকে আনদালুসীয় সাহিত্যিকগণ প্রাচ্য সহ নানান দিকে জ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করতেন এবং এসব এলাকার সাহিত্যিক ও ভাষাবিদদের রচনা অনুসরণ করার চেষ্টা চালাতেন।

আনদালুসে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে সেখানে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ জ্ঞান চর্চা করতে আসত। আনদালুসীয়রা প্রাচ্যে গিয়ে জ্ঞান অর্জন করে দেশে ফিরে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে মানুষকে শেখাতেন। আবার বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ এখানে পাঠদান করতেও আসতেন। এদের মধ্যে অনেক ভাষাবিদ ছিলেন।

তাঁদের মধ্যে আবুল আলী আল কালী, আবু বকর আয যুবাইদী, ইবনুত তাইয়ান প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য।

আবুল আলী কালী আব্দুর রহমান আন নাসিরের সময়ের প্রখ্যাত ভাষাবিদ ছিলেন। তিনি কর্ডোভার মসজিদে ভাষাবিজ্ঞানের পাঠদান করতেন। ভাষাতত্ত্বের উপরে তাঁর রচিত অনেক গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে "আল আমালী", "আল বারি' " উল্লেখযোগ্য। তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করে তাঁর অনেক ছাত্রও ভাষাবিজ্ঞানে অবদান রাখেন।
আবু বকর আয যুবাইদী ছিলেন আবুল আলীর ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম। ব্যকরণ ও ভাষায় তাঁর অগাধ পান্ডিত্য ছিল। আরবী ব্যকরণে তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ছিল "আল ওয়াদিহ"। এ ছাড়াও ইবন তাইয়ান নামক একজন প্রখ্যাত ভাষাবিদ ছিলেন। ভাষাবিজ্ঞানে তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ছিল "আল মাওইব"।[১৯৭]

হিজরী তৃতীয় শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদদের অন্যতম ছিলেন উছমান ইবনুল মুছান্না আল ক্বায়সী, সাঈদ ইবনুল ফারজ প্রমুখ। সাঈদ ইবনুল ফারজ তাঁর সময়ে আরবী ভাষায় সবচেয়ে পন্ডিতপ্রবর ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর প্রায় ৪০০০ খন্ডকবিতা (ارجوزة) মুখস্ত ছিল। তাঁর নিকট থেকে বহু মানুষ ভাষাতত্ত্বের জ্ঞান লাভ করেন।

আনদালুসে আরবী ভাষাতত্ত্বের প্রসার শুরু হয় মূলত হিজরী চতুর্থ শতক থেকে। এ সময়ে ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন দিক যেমন নাহু, সরফ, বালাগাত, অভিধান ইত্যাদি নিয়ে অনেক চর্চা হয়। এ সময়ের অন্যতম ব্যকরণবিদ ছিলেন ইবনুল কুতিয়্যাহ। তিনি ব্যকরণের বিভিন্ন নিয়ম-কানুনের উপরে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর পরবর্তী নাহুবিদ ছিলেন মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আয যুবাইদী। তিনি আবুল আলী আল ক্বালীর ছাত্র ছিলেন। তিনি যুগের একজন প্রখর পন্ডিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। খলিফা আল হাকাম তাঁকে স্বীয় পুত্রের শিক্ষক নিযুক্ত করেন। পরবর্তীতে তিনি তাঁকে কাযীর পদ সহ রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করেন।[১৯৮]

হিজরী পঞ্চম শতকের অন্যতম ভাষাবিদ ছিলেন আলী ইবন ইসমাঈল আদ দরীর। তিনি ভাষাতত্ত্বে অপরিসীম অবদান রাখেন। তাঁর রচিত দু'টি বড় অভিধান ছিল। সেগুলো হল: "আল মুহকাম"ও "আল মুখাস্সাস"। "মুহকাম" খলীল ইবন আহমদের "কিতাবুল আইন" এর মত উচ্চারণস্থলের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী সাজানো ছিল। আর "মুখাস্সাস" বিষয়বস্তু ও অর্থ অনুযায়ী সাজানো ছিল। এটা ১৭ খন্ডে রচিত ছিল। তাঁর সমসাময়িক ভাষাবিদ ছিলেন ইবন হাজম।[১৯৯] আনদালুসে যারা আরবী ভাষাতত্ত্বের চর্চাকে উঁচু জায়গায় পৌঁছে দেন তাঁদের মধ্যে এই দুই ভাষাবিদ ছিলেন অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব।

---

[১৯৭] হান্না আল ফাখুরী, *তারীখুল আদাবিল আরব*, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৪৮
[১৯৮] শাওকী দ্বাইফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী 'আসরুদ দুওয়ালি ওয়াল ইমারাতিল আনদালুস*, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৩
[১৯৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

আবু উবাইদ আল বিকরী ছিলেন অন্যতম একজন ভাষাবিদ। তিনি একই সাথে ভূগোলবিদ ও ছিলেন। তিনি আবুল আলী আল ক্বালীর "আল আমালী" এর ব্যাখ্যায় গ্রন্থ রচনা করেন।

নাহু শাস্ত্রের প্রচার-প্রসারে আনদালুসের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ছিল অনস্বীকার্য। হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে তাঁরা ভাষা শিক্ষার মতই নাহুও অধ্যয়ন করেন। এসময় নাহু সংক্রান্ত প্রাচ্যের বহু গ্রন্থ আনদালুসে নিয়ে আসা হয়। যেমন জুদী নামক এক ব্যক্তি বিখ্যাত নাহুবিদ কুসাই এর নাহু সংক্রান্ত গ্রন্থ সর্বপ্রথম আনদালুসে নিয়ে আসেন। নাহুবিদগণ এসব বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর উপরে ভিত্তি করে নাহু চর্চা করতেন। এসময় তাঁরা বেশ কিছু গ্রন্থও রচনা করেন।

তৃতীয় শতকের শেষ দিকে আনদালুসের অনেক নাহুবিদ যেমন মুহাম্মদ ইবন মূসা, মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া আর রাবাহী প্রমুখ ফুসতাতে জ্ঞান অর্জনের জন্যে গমন করেন এবং সেখানে সিবওয়াই কর্তৃক রচিত গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। এরপর তাঁরা কর্ডোভায় ফিরে এসে এই গ্রন্থের উপরে পাঠদান শুরু করেন। এছাড়াও এ বিষয়ের উপরে গ্রন্থও রচনা করেন। এসময়ে ইবনুস সাইদ আল বিতলুয়ুসী নামক একজন ভাষাবিদ ছিলেন। তিনি একাধারে ভাষাবিদ ও নাহুবিদ ছিলেন। নাহুর উপরে তাঁর রচিত অনেক গ্রন্থ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ" আল মাসাইল ওয়াল আজউইবা"। [২০০]
হিজরী সপ্তম শতকের প্রসিদ্ধ নাহুবিদদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন উমর ইবন মুহাম্মদ, ইবন মালেক মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ প্রমুখ। ইবন মালেক নাহু শাস্ত্রের উপরে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে "আলফিয়্যা" অন্যতম। তিনি ইবন হাজীব আল মিসরীর "আল কাফিয়া" এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর সমসাময়িক নাহুবিদ ছিলেন ইবনুদ দাই' আলী ইবনু মুহাম্মদ। তিনিও নাহু বিষয়ক অনেক গ্রন্থের ব্যাখ্যা মূলক গ্রন্থ রচনা করেন। এসময়ে আবু হাইয়ান মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ নামক আরো একজন প্রখ্যাত নাহুবিদ ছিলেন। তিনি ইবনুদ দাই' এর ছাত্র ছিলেন। তিনিও অন্য নাহুবিদদের মত অনেক গ্রন্থের ব্যাখ্যা রচনা করেন। এসব গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম ছিল সিবওয়াই এর নাহু, ইবন উসফুরের "মুকার্‌রব" ও " মুমাত্তা", ইবনু মালিকের "আলফিয়্যা" ইত্যাদি। এছাড়াও তাঁর স্বরচিত নাহু গ্রন্থ ছিল "ইরতিশাফুদ দ্বরব" ও "মুখতাসির"। প্রথম গ্রন্থটি ৬ খন্ডে বিভক্ত ছিল এবং দ্বিতীয়টির দু'টি খন্ড ছিল।[২০১]

ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম এক অংশ ছিল বালাগাত। বালাগাত শাস্ত্রের সাথে আরবী গদ্য ও পদ্যের এক নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। ফলে আনদালুসে সাহিত্যের বিকাশের সাথে সাথে বালাগাতেরও বিকাশ সাধিত হয়।

---

[২০০] শাওকী দ্বাইফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী 'আসরুদ দুওয়ালি ওয়াল ইমারাতিল আনদালুস*, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৬
[২০১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

হিজরী চতুর্থ শতকের শেষ অবধি আনদালুসে বালাগাত শাস্ত্রের চর্চা প্রাচ্যের বই-পুস্তকের উপরে নির্ভরশীল ছিল। তারা এর জন্যে আরবী গ্রন্থের উপরে যেমন নির্ভরশীল ছিল তেমনি গ্রীকদের গ্রন্থের উপরেও তাদেরকে নির্ভর করতে দেখা যায়। এসব গ্রীক গ্রন্থকে তারা আরবী বালাগাতের অন্যতম মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করত।

হিজরী পঞ্চম শতকে বালাগাতের উপরে বেশ কিছু গ্রন্থ রচিত হয়। এসব গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন আবিল হুসাইনের " আল ফাওয়াইদু ফিত তাশবীহ মিনাল আশআরিল আনদালুসিয়্যা", ইবনুল কুতানী আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদের "কিতাবুত তাশবীহাত মিন আশআরি আহলিল আনদালুস" ইত্যাদি। এ গ্রন্থ দু'টোতে আনদালুসের কবিতা বিষয়ক আলোচনা করা হয়েছে। ইবনুল কুতানী তাঁর গ্রন্থে কবিতায় বর্ণিত বিভিন্ন উপমা, স্থান, কাল, পরিবেশ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। আবুল ওয়ালিদ ইসমাঈল ইবন হাবীব আল হুমাইরী এই গ্রন্থের অনুরূপ " আল বাদী' ফী ওয়াসফির রাবী' " নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন।[২০২]

ভাষা বিজ্ঞানের অন্যতম অংশ ছিল সমালোচনা সাহিত্য। হিজরী পঞ্চম শতকের দিক থেকে এ সাহিত্য আনদালুসে তার যাত্রা শুরু করে। ইবনু শুহাইদের " আত তাওয়াবে' ওয়ায যাওয়াবে' " এর মাধ্যমে এর উদ্ভব বলে ধারনা করা হয়। হিজরী ষষ্ঠ শতকের সমালোচকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ইবনু খাফাজাহ। তিনি তাঁর দিওয়ানের ভূমিকায় সাহিত্য সমালোচনা নিয়ে আলোকপাত করেন। এ ছাড়াও সমালোচনার উপরে এসময়ে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়। তন্মধ্যে ইবনু বাস্সামের "আয যাখীরা ফী মাহাসিনি আহলিল জাযিরা" অন্যতম। এতে তিনি আনদালুসের কবি, কবিতা ও এর ভাব, ভাষা, অর্থ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন।এতে মুতানাব্বীর দার্শনিক কবিতা বা আবুল আলা মাআররীর কবিতার বিষয়ও স্থান পেয়েছিল।[২০৩]

আনদালুসের সর্বশেষ সাহিত্য সমালোচক হিসেবে হাজেম আল কিরতাজানীকে গণ্য করা হয়। সমালোচনা সাহিত্যে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "মিনহাজুল বুলাগা ওয়া সিরাজুল উদাবা"। তিনি এতে কবিতা রচনার ধরন, শব্দশৈলী, অর্থ, বৈশিষ্ট্য, শ্রোতাদের উপরে বাক্যের প্রভাব ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে একই সাথে আরবদের সাহিত্য ও সমালোচনা এবং গ্রীক সাহিত্য ও সমালোচনার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। তিনি যেমন ভাবে আরবী সাহিত্য ও তার রীতি- নীতি, বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোকপাত করেছেন তেমন গ্রীক সাহিত্যের রীতি-নীতি, বৈশিষ্ট্য নিয়েও আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর এই বিখ্যাত গ্রন্থে শরীফ আর রাদী, ইবনুল মু'তায, ইবনু খাফাজা, বুহতুরী, মুতানাব্বী, আবু তাম্মাম সহ অনেককে নিয়েই আলোচনা

[২০২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

[২০৩] আহমদ ইবন ইদরীস আল ক্বারাফী শিহাবুদ্দীন, *আয যাখীরা*, (বৈরুত: দারুল গারব আল ইসলামী, ১৯৯৪) ২য় খন্ড, পৃ. ৪৭৯

করেছেন। হাজেমের পরে আনদালুসে আর তেমন কোন সমালোচক পাওয়া যায় না। তাঁর মাধ্যমেই সেখানে সমালোচনা সাহিত্যের ইতি ঘটে।[২০৪]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ধর্মশাস্ত্র (علوم الدين)

আরবী সাহিত্যের সাথে ধর্মশাস্ত্র তথা কুরআন- হাদীস, ফিকহ, ধর্মের মৌলিক নীতিমালা ইত্যাদির এক নিগূঢ় যোগসূত্র ছিল। সাহিত্য অনেকাংশেই ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ের উপরে নির্ভর করত। আনদালুসের সূচনা লগ্ন থেকেই কবি সাহিত্যিকগণ কুরআনের অনেক সূরা মুখস্ত করতেন। সূচনালগ্নের এসব সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আল গাযী ইবন কায়স। তিনি আব্দুর রহমান আদ দাখিলের স্পেনে আগমনের পূর্বেকার সময়ের সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি জ্ঞান অন্বেষণের জন্যে প্রাচ্যের বিভিন্ন প্রান্তে গমন করেন। সাবউল কুরার একজন ক্বারী নাফে' এর নিকট থেকে তিনি ক্বিরাআত শিক্ষা করেন। তিনি প্রথম আনদালুসে এই ক্বিরাআত নিয়ে আসেন এবং মানুষের মাঝে তার প্রচার- প্রসার ঘটান। হিজরী চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের মাঝামাঝিতে ক্বিরাআতের উপরে গ্রন্থ রচনা করতে দেখা যায়। এসব রচনাকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আবু উমর আত তিলমানকী। তিনি প্রাচ্যে গমন করে সাত ক্বারীর ক্বিরাআত সম্পর্কে

[২০৪] শাওকী দ্বাইফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী 'আসরুদ দুওয়ালি ওয়াল ইমারাতিল আনদালুস*, প্রাগুক্ত, পৃ:১০৬

অধ্যয়ন করেন এবং কর্ডোভায় ফিরে এসে এর চর্চায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর রচিত ক্বিরাআত বিষয়ক গ্রন্থের নাম ছিল "আর রওদাহ"।[২০৫]

এছাড়াও এসময়ে উল্লেখযোগ্য ক্বারী ছিলেন আবু আমর উসমান ইবন সাঈদ আদ দানী। তিনি আনদালুসে ক্বিরাআতের প্রসারে অন্যতম প্রসিদ্ধ একজন ব্যক্তি ছিলেন। তিনিও অন্যদের মত প্রাচ্যের বিভিন্ন এলাকায় গমন করে ক্বিরাআত ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা করেন এবং কর্ডোভায় ফিরে অর্জিত জ্ঞান সর্বসাধারণের জন্যে কাজে লাগান। তিনি ক্বিরাআত, তাফসীর ও উলূমুল কুরআন বিষয়ক অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে "আত তাইসীর ফী ক্বিরাআতিস সাবই' ", "ইজাজুল বায়ান" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ।

আদ দানীর পরে প্রসিদ্ধ ক্বারী ছিলেন ইমাম আশ শাতিবী আদ দরীর আল কাসিম। তিনি ক্বিরাআতের উপরে "হারাযুল আমানী ওয়া ওয়াজহুত তাহানী ফিল ক্বিরাআত" শিরোনামে ১১৭৩ পঙক্তির কবিতা রচনা করেন।[২০৬]

আবু হাইয়ান নামক গ্রানাডার একজন ক্বারী ছিলেন যিনিও ক্বিরাআতের উপরে কবিতা রচনা করেন।

মহা গ্রন্থ আল কুরআনকে কেন্দ্র করে এসময়ে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়। এসব গ্রন্থ রচনা ও চর্চার কেন্দ্রবিন্দু ছিল উলুমুল কুরআন, কুরআন পাঠ পদ্ধতি, তাজবীদ, তাফসীর ইত্যাদি। আনদালুসে মুসলিম বিজয়ের পরে সেখানে ইসলামের প্রচার- প্রসারে ইসলামী জ্ঞান চর্চা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। তারা দৈনন্দিন জীবনে ধর্মীয় দিক থেকে বিভিন্ন বিষয়ের সম্মুখীন হতে থাকে। ফলে প্রয়োজনের তাগিদেই তাদের মধ্যে এসব জ্ঞান চর্চা ও গ্রন্থ রচনা শুরু হয়ে যায়। আনদালুসীয় আলেম- ওলামা, কবি- সাহিত্যিক সবাই এ ব্যাপারে সমান ভাবে ভূমিকা রাখেন।

তাফসীর বিষয়ক অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ছিল আল মক্কীর " আল হিদায়া ইলা বুলুগিন নিহায়া ফী মাআনিল কুরআনিল কারীম ওয়া তাফসীরিহী ওয়া আনওয়াই উলূমিহী"। এই তাফসীর গ্রন্থটি ৭০ খন্ডে বিভক্ত ছিল।[২০৭] এছাড়াও অন্যান্য প্রসিদ্ধ তাফসীরের মধ্যে অন্যতম ছিল ইবন আতিয়্যার " আত তাফসীরুল কাবীর", মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল কুরতুবীর "জামিউ আহকামিল কুরআন ওয়াল মুবীন লিমা তুদাম্মিনা মিনাস সুন্নাহি আওয়িল কুরআন", ইবন হাইয়ানের "বাহরুল মুহীত" ইত্যাদি।

[২০৫] প্রাগুক্ত, পৃ.১০৭
[২০৬] প্রাগুক্ত, পৃ.১০৭
[২০৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

ইবন হাইয়ানের বাহরুল মুহীত ছিল আটটি বিশাল খন্ডের এক রচনা। এর ভূমিকায়, কুরআন, হাদীস, তাফসীর, উলুমুল কুরআন, নাহু, বালাগাত, উসূলে ফিকহ সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ইলমের উৎস ও মৌলিক আলোচনা সন্নিহিত ছিল। শুধু তাই নয়, এতে আরবী ভাষাকেও সুনিপুণ ভাবে ফুটিয়ে তোলার অক্লান্তকর প্রয়াস ছিল।

হাদীস শাস্ত্রের প্রচার-প্রসারেও আনদালুসীয়দের অবদান ছিল অপরিসীম। হাদীস শাস্ত্র চর্চায় ও প্রচারে এখানে প্রথম ব্যক্তি হিসেবে মুআবিয়া ইবন সালেহকে বিবেচনা করা হয়। আনদালুস বিজয়ের প্রথম দিকে হাদীস শাস্ত্রেও তেমন প্রসার হয়নি। হিজরী তৃতীয় শতক থেকে এর ব্যাপক প্রচার-প্রসার, চর্চা শুরু হয়। এসময়ে যারা হাদীস শাস্ত্রের প্রসারে ভূমিকা পালন করেন তাঁদের মধ্যে বাকী ইবন মুখাল্লাদ অন্যতম। তাঁর "আল মুসান্নাফুল কাবীর" নামে হাদীসের একটি বড় সংকলন গ্রন্থ ছিল যাতে তিনি সাহাবাগণের নামের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী হাদীস সংকলন করেছিলেন। এরপর প্রত্যেক সাহাবার হাদীসকে বিষয়ভিত্তিক সাজিয়েছেন।[২০৮]

সাবিত ইবন আব্দিল আযীয সারাগোসী ও তাঁর পুত্র কাসিম ছিলেন মুসলিম স্পেনের অন্যতম হাদীস শাস্ত্র বিশারদ। তাঁরা দু'জনেই হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্যে প্রাচ্যে গমন করেন এবং শিক্ষা লাভ করে কর্ডোভায় ফিরে এসে হাদীস শাস্ত্রের প্রসারে মনোনিবেশ করেন।

হিজরী পঞ্চম শতকে হাদীস শাস্ত্রের চর্চা বেশ লক্ষণীয়। এসময়ের অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হুমাইদীর "আল জামউ বাইনাস সহীহাইন"। তবে সপ্তম শতকে হাদীস বিশারদদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রাযীন সারাগোসী। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "আত তাজরীদ"। এটা ইমাম মালেকের মুওয়াত্তা ও সিহাহ সিত্তার পাঁচটি তথা বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ এর সন্নিহিত রূপ। তাঁর এই গ্রন্থটি সব জায়গাতে এমনকি প্রাচ্যেও ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইবনে আছীর তাঁর "জামিউল উসূল" গ্রন্থের জন্যে এর উপরে নির্ভর করেছেন।

আনদালুসের সর্বশেষ হাদীস বিশারদদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আহমদ ইবন ফারহ সেভিলী। তিনি একাধারে কবি ও হাদীসবেত্তা ছিলেন। তিনি এক প্রণয়মূলক কবিতা রচনা করেন যাতে হাদীসের পরিভাষা সম্পৃক্ত অনেক পংক্তি ছিল।[২০৯]

আনদালুসে হাদীসশাস্ত্রের চর্চা এত ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল যে হাদীসের বিভিন্ন পরিভাষা ও শব্দ নিয়ে স্বতন্ত্র অভিধান রচিত হয়।

---

[২০৮] আল মাক্কার্‌রী, *নাফহুত তীব*, প্রাগুক্ত, ৩য় খন্ড, পৃ. ১৬৮

[২০৯] শাওকী দ্বাইফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী 'আসরুদ দুওয়ালি ওয়াল ইমারাতিল আনদালুস* , প্রাগুক্ত, পৃ.১১১

ফিকহ ও উসূলে ফিকহ নিয়েও এসময়ে ব্যাপক চর্চা লক্ষ্য করা যায়। আনদালুস বিজয়ের পরে প্রথম দিকে ফকীহরা সেখানে আগমন করেন এবং মানুষকে বিভিন্ন বিষয়ের ফতোয়া দিতে থাকেন। এসমস্ত ফকীহ ইমাম আওযায়ীর অনুসারী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সা'সা' ইবন সালাম। তিনি কর্ডোভা জামে মসজিদের প্রাঙ্গনে বসে মানুষদেরকে ফতোয়া দিতেন। পরবর্তীতে আনদালুসে মালেকী মাযহাবের প্রচার প্রসার শুরু হলে এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মসজিদে এসব ফিকহী কার্যক্রম পরিচালনা করা হত।

আব্দুর রহমান আদ দাখিল ও তাঁর পুত্র হিশাম মালেকী মাযহাবের ভক্ত ও অনুসারী ছিলেন। তাঁদের মাধ্যমেই মূলত আনদালুসে এ মাযহাবের প্রসার হয়। সর্বপ্রথম আল গাযী ইবন কায়স ইমাম মালেকের মুওয়াত্তাকে আনদালুসে নিয়ে আসেন বলে ধারণা করা হয়। তবে এ মাযহাবের প্রথম ফকীহ হিসেবে ঈসা ইবন দীনারকে গণ্য করা হয়।[২১০] এ মাযহাবের মতাদর্শ নিয়ে ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর রচিত গ্রন্থ "আল হিদায়া"।

এছাড়াও আনদালুসের বিখ্যাত ফকীহদের অন্যতম ছিলেন ইয়াহইয়া আল লাইসী, আব্দুল মালেক ইবন হাবীব, ইবন উতবা মুহাম্মদ ইবন আহমদ প্রমুখ। ইবন উতবা ইয়াহইয়া আল লাইসী ও আব্দুল মালেকের ছাত্র ছিলেন। ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "আল মুসতাখরিজা"। তাঁর সমসাময়িক ফকীহ ছিলেন ইয়াহইয়া ইবন মাযীন। তিনি ইমাম মালিকের মুওয়াত্তার ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ রচনা করেন।
হিজরী ষষ্ঠ শতকে প্রখ্যাত ফিকহবিদ ছিলেন ইবন রুশদ।তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ " বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ"।[২১১]

উল্লেখিত ব্যক্তিগণ মালেকী মাযহাবের ফকীহ ছিলেন। মুসলিম স্পেনে এই মাযহাবের অনুসারী সবচেয়ে বেশি ছিল। তবে হানাফী, শাফেয়ী, হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীরাও সেখানে বিদ্যমান ছিল। তবে তারা সংখ্যায় খুব অল্প ছিল।

[২১০] ইবন হাইয়ান, *আল মুকতাবিস*, (বৈরুত), পৃ. ৭৮, ৯৯
[২১১] শাওকী দ্বাইফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী 'আসরুদ দুওয়ালি ওয়াল ইমারাতিল আনদালুস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইতিহাস (التاريخ)

ইতিহাস রচনায় আনদালুসের মুসলমানগণ এক অনবদ্য স্বাক্ষর রেখে গেছেন। হিজরী তৃতীয় শতক থেকে মূলত স্পেনে ইতিহাস চর্চা শুরু হয়। মুসলিম স্পেনের ঐতিহাসিকগণ অন্যান্য আরবীয় ঐতিহাসিক বিশেষ করে মিসরীয় ঐতিহাসিকদের দ্বারা প্রভাবিত হন। তাঁদের মধ্যে ২য় আব্দুর রহমানের আমলে আব্দুল মালিক ইবন হাবীবের রচিত গ্রন্থকে প্রথম ইতিহাস হিসেবে গণ্য করা হয়। এতে সৃষ্টির শুরু থেকে শুরু করে হযরত আদম ও হাওয়া (আ:), ইবলিস, নবী রাসূলদের ঘটনা, আনদালুসের বিজয় থেকে সমসাময়িক সময়ের ইতিহাসও তাতে বর্ণিত ছিল। এ ছাড়াও ইবন হাজমের ইতিহাস বিষয়ক "নাকতুল উরূস ফী তাওয়ারিখিল খুলাফা ওয়া নাওয়াদিরি আখবারিহিম" নামক এক নিবন্ধের কথা জানা যায় যা পরবর্তীতে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য বিভাগের জার্নালে প্রকাশিত হয়।[২১২]

[২১২] প্রাগুক্ত, পৃ.১২৩

আনদালুসের ইতিহাস নিয়ে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়। এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল আহমদ ইবন মুহাম্মদ আর রাযীর " আখবারু মুলুকিল আনদালুস", ইবন ঈসার "আল মাওইব" ইত্যাদি।

আনদালুসের অন্যতম প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ছিলেন আবু বকর ইবন উমর ইবনুল কুতিয়াহ। তাঁর রচিত বিখ্যাত ইতিহাসমূলক গ্রন্থ "তারীখু ইফতিতাহিল আনদালুস"। এতে আনদালুসে মুসলিম বিজয় থেকে শুরু করে তৃতীয় আব্দুর রহমানের শাসনকাল পর্যন্ত সব ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। অন্যান্য ঐতিহাসিকদের জন্যে তাঁর এই গ্রন্থটি ছিল আনদালুসের ইতিহাসের এক নির্ভরযোগ্য উৎস। এমনকি বিখ্যাত ঐতিহাসিক পি. কে হিট্টিও তার "হিস্ট্রি অব দ্যা অ্যারাবস" রচনায় উক্ত গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন বলে স্বীকারোক্তি করেছেন।[২১৩]

তাওয়ায়েফ শাসনামলে অন্যতম প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ ছিলেন ইবন হাইয়ান। তাঁর পুরো নাম আবু মারওয়ান হাইয়ান ইবন খালফ। তাঁর রচিত ইতিহাসমূলক গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম ছিল "আল মাতীন" ও "আল মুকতাবিস ফি তারীখি রিজালিল আনদালুস"। আল মাতীন গ্রন্থটি ৬০ খন্ডে রচিত ছিল।

আল ফাতহ ইবন খাকান ছিলেন আরেকজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক। তিনি সেভিলের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর অন্যতম প্রসিদ্ধ দুইটি গ্রন্থ হলো সমসাময়িক আনদালুসের আমীর-ওমরাহ, বিচারক, কবি-সাহিত্যিক, জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গের ইতিহাস সম্বলিত "ক্বালাইদুল ইকয়ান" ও আলেম ও ফকীহদের নিয়ে "মাতমাহুল আনফুস ওয়া মাসরাহুত তাআন্নুস ফী মুলহি আহলিল আনদালুস"।

আনদালুসের ইতিহাসে অন্যতম অমর গ্রন্থ ইবন বাস্‌সামের " আয যাখীরাহ"। এটা হিজরী পঞ্চম শতকে আনদালুসের ইতিহাস ও তার সাহিত্য নিয়ে রচিত গ্রন্থ।[২১৪] এছাড়াও সে সময়ের আরো অন্যান্য প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ইবন হাজম, ইবনুল ফারাদী আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ, আল হুমাইদী প্রমুখ। ইবনুল ফারাদীর প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ ছিল তারীখু উলামাইল আনদালুস। তাঁর সব রচনার মধ্যে কেবল এটিকেই পাওয়া যায়।

নাসিরীয় যুগের অন্যতম ঐতিহাসিক ছিলেন লিসানুদ্দীন ইবনুল খতীব। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ছিল "আল লামহাতুল বাদরিয়্যাহ"। এটাতে মূলত গ্রানাডা শাসক গোষ্ঠী বনু আহমারের ইতিহাস অন্তর্ভূক্ত ছিল।[২১৫]

---

[২১৩] হিট্টি, পি. কে. *হিস্ট্রি অব দ্যা অ্যারাবস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৫

[২১৪] হান্না আল ফাখুরী, *তারীখুল আদাবিল আরব*, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৫১

[২১৫] শাওকী দ্বাইফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী 'আসরুদ দুওয়ালি ওয়াল ইমারাতিল আনদালুস* , প্রাগুক্ত, পৃ.১২৪

আনদালুসের সবচেয়ে খ্যাতিমান ঐতিহাসিক ছিলেন আব্দুর রহমান ইবন খালদুন। তিনি ইবনুল খতীবের সমসাময়িক ছিলেন। ইতিহাস চর্চায় তাঁর অবদান অপরিসীম। তাঁর জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ "আল মুকাদ্দামা" যা আরবী সাহিত্যে এক অনন্য স্থান দখল করে আছে। এর পুরো নাম " কিতাবুল ইবার ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদা ওয়াল খবর ফী আইয়ামিল আজম ওয়াল আরব"। আরব, পারসিক ও বার্বারদের ইতিহাসই ছিল এর মূল বিষয়বস্তু। গ্রন্থটি তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম ভাগ ছিল ভূমিকা, এরপর আরব ও তাদের আশে পাশের জাতি নিয়ে আলোচনা এবং সবশেষে বার্বার ও উত্তর আফ্রিকার মুসলমানদের ইতিহাস বর্ণিত।[২১৬]

তাঁর এই মুকাদ্দামা শুধু ইতিহাস গ্রন্থই ছিল না, বরং এতে সমাজ ও সভ্যতার উৎপত্তি ও বিকাশ, পারিবারিক, সামাজিক, ভৌগলিক অবস্থান ও রীতি-নীতি সব কিছুই বর্ণিত ছিল। এটা ছিল তৎকালীন সমাজের জন্যে এক বিশাল দর্পন স্বরূপ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দর্শনশাস্ত্র (الفلسفة)

আনদালুসের ইতিহাসের প্রথম দিকে দর্শন চর্চা তেমন জনপ্রিয় ছিল না। যারা দর্শনশাস্ত্রের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন তাঁরা ধর্মবেত্তাদের ভয়ে গোপনে এর চর্চা করতেন। পরবর্তীতে আব্বাসী আমলে প্রকাশ্যে মুসলমানদের মধ্যে দর্শন শাস্ত্রের চর্চা শুরু হয়। কর্ডোভার মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু মুসার্‌রাহকে এর প্রথম দ্রষ্টা হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁকে স্পেনে মু'তাজিলা দর্শনের প্রবক্তা হিসেবেও গণ্য করা হয়। বলা হয়ে থাকে, তিনি ২৯৯ হিজরীতে একবার মক্কা নগরীতে হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে গমন করেন। সেখানে তিনি একদল দার্শনিক এবং সুফীর সাথে দেখা করেন। এরপর দেশে ফিরে তিনি মু'তাজিলা দর্শনের প্রবর্তন করেন এবং তাঁর সঙ্গী- সাথীরা তাঁর সাথে যোগ দেয়।[২১৭]

[২১৬] হিট্টি, পি. কে. *হিস্ট্রি অব দ্যা অ্যারাবস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৮

[২১৭] শাওকী দ্বাইফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী 'আসরুদ দুওয়ালি ওয়াল ইমারাতিল আনদালুস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

তৃতীয় আব্দুর রহমানের শাসনামলে তিনি মুসলমানদেরকে ফিতনা এবং নিজেদের মধ্যে বিবাদ- বিশৃঙ্খলা থেকে দূরে থাকার জন্যে মু'তাজিলা দর্শন পরিহার করতে নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে তাঁর পুত্র আল মুসতানসিরের আমলে তারা আবার জনসমক্ষে আসে এবং তাদের মতবাদ প্রচার করতে শুরু করে।

হাজীব আল মানসুর যখন ক্ষমতায় আসেন তখন তিনি যারা ইবনু মুসাররার আদর্শ গ্রহণ করবে তাদের হত্যার নির্দেশ দেন। তখন তাদের অনেকেই তওবা করে ফিরে আসে।

আনদালুসের শাসন ব্যবস্থা যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায় তখন দর্শন চর্চা আবার নতুন উদ্যমে ফিরে আসে। এ সময়ে দর্শন শাস্ত্রের বিভিন্ন নতুন নতুন দিকের উদ্ভব হয়। মানতিক শাস্ত্রের চর্চা ছিল এদের মধ্যে অন্যতম। এ সময়ে মানতিক শাস্ত্রের চর্চায় যারা মনোনিবেশ করেন তাদের মধ্যে আবুল ওয়ালিদ আল ওয়াকশী, ইবনুল জাল্লাব আস সারাকাসতী প্রমুখ ছিলেন অন্যতম।

এ আমলে আনদালুসে অনেক ক্ষুদ্র রাজ্য হওয়ায় এবং সেখানে প্রায়ই বিশৃঙ্খলা লেগে থাকায় ধর্মীয় চেতনা উজ্জীবিত রাখার প্রচেষ্টা ছিল অনেক বেশি। এর ফলে সেখানে ধর্মবেত্তা, ফকীহ, দার্শনিকদের ফিকহ, মানতিক, দর্শন শাস্ত্র ইত্যাদি চর্চা বৃদ্ধি পায়।

মানতিক শাস্ত্রের অন্যতম রচয়িতা ছিলেন আবুস সালত উমাইয়া ইবন আব্দুল আযীয। তিনি মানতিক শাস্ত্রের উপরে গ্রন্থ রচনা করেন। ইবনুস সাঈদ আল বাতলুয়ুসী নামক একজন দার্শনিকের কথা জানা যায় যার কায়রোতে " কিতাবুল হাদাইক ফিল মাতালিবিল ফালসাফিয়্যাতিল উওয়াইসিয়া" নামক একটি লেখা প্রকাশিত হয়।এতে সৃষ্টিতত্ত্বের ধারাবাহিকতা, আল্লাহর গুণাবলী, মানুষ, সৃষ্টি ও মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান সম্পর্কিত মানতিকী তত্ত্ব ইত্যাদি বর্ণিত ছিল।[২১৮]

এ সময়ে অন্যতম একজন দার্শনিক ছিলেন ইবন তুফায়েল। তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবু বকর মুহাম্মদ ইবন আব্দিল মালিক। তিনি একই সাথে দর্শন এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের উপরে গ্রন্থ রচনা করেন। একই সময়ে সারাগোসায় আবু বকর মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া নামে একজন দর্শন শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ছিল " তাদবীর আল মুতাওয়াহহিদ"। দর্শন শাস্ত্রে তাঁর এত চর্চা ছিল যে অনেকের মতে তিনি ইবন সীনা ও আল গায্যালীকেও ছাড়িয়ে গেছেন।[২১৯]

তবে আনদালুসে দর্শন শাস্ত্রের সবচেয়ে প্রতিভাবান ও প্রখ্যাত দার্শনিক ছিলেন ইবন রুশদ। তাঁর পুরো নাম ছিল আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন রুশদ। তিনি ১১২৬ খ্রিষ্টাব্দে কর্ডোভায় জন্মগ্রহণ

[২১৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

[২১৯] ইমাম উদ্দিন, এস. এম. সাম *অ্যাসপেক্ট অব দ্যা সোশিও ইকোনমিক এন্ড কালচারাল হিস্ট্রি অব মুসলিম স্পেন ৭১১-১৪৯২*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

করেন। তাঁর বংশের অনেকেই কাযী ছিলেন। তিনিও ১১৬৯ খ্রি. (৫৬৫ হি.) তে সেভিলের কাযী নিযুক্ত হন এবং এর দুই বছর পরে কর্ডোভার কাযী হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি ২৫ বছর পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল থাকেন।

তিনি ফিকহ ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যয়নে জীবনের বেশির ভাগ সময়ই ব্যয় করেন। ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর অন্যতম গ্রন্থ ছিল " বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ"। এটা কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়।

সুলতান ইউসুফ ইবন আব্দিল মু'মিনের সাথে তাঁর একটি ভাল সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি এরিস্টস্টলের দর্শন শাস্ত্রের উপরে রচিত গ্রন্থের ব্যাখা রচনা করেন। তিনি এরিস্টস্টলের একজন সমর্থক ও একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। একারণে যখন তিনি এসব গ্রন্থের ব্যাখ্যা করেন অনেকেই তাকে যিনদিক বলে আখ্যায়িত করে এবং সুলতান ইয়াকুব ইবন ইউসুফের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি তাঁকে নির্বাসন দেন এবং পরে মারাকুশে কাযী পদে বহাল করেন।[২২০]

তিনি এরিস্টস্টলের বহু তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন। এসমস্ত ব্যাখ্যা সম্বলিত গ্রন্থ পরে গ্রীক, ল্যাটিন সহ বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠ্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়।

দ্বাদশ শতকে মুসলিম স্পেনের সবচেয়ে প্রতিভাবান দার্শনিক ছিলেন আবু বকর মুহাম্মদ ইবন আলী মহীউদ্দীন ইবন আল আরাবী।[২২১] দক্ষিণ স্পেনের মুরসিয়া নগরীতে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। কুরআন, হাদীস, ফিকহ, মানতিক, দর্শন সহ বিভিন্ন বিষয়ে তিনি পান্ডিত্য অর্জন করেন। তিসি সুফীবাদের দীক্ষা নিয়ে প্রাচ্যে চলে যান। এরপর আর কখনো তিনি স্পেনে ফিরে আসেননি।

প্রাচ্যে গিয়ে তিনি নব উদ্যমে দর্শন চর্চা শুরু করেন। তিনি মূলত মরমীবাদী দার্শনিক ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচশত। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল আল- ফুতুহাতুল মাক্কীয়্যাহ, ফুসুসুল হিকাম, আল ইসরা ইলা মাকামিল আসরা ইত্যাদি।

তবে আল ফুতুহাতুল মাক্কীয়্যাহ ছিল সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তিনি একবার মক্কায় গমন করেন এবং সেখান থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে এই গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি নবুওয়াত, রিসালাত, আল্লাহ, মানুষ, সৃষ্টি জগত, সৃষ্টির রহস্য, কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম, লওহে মাহফুজ ইত্যাদির নিগূঢ় তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা

[২২০] শাওকী দ্বাইফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী 'আসরুদ দুওয়ালি ওয়াল ইমারাতিল আনদালুস* , প্রাগুক্ত, পৃ.৮৭
[২২১] হিট্টি, পি. কে. *হিস্ট্রি অব দ্যা অ্যারাবস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৫

করেছেন। এছাড়াও তাঁর আল ইসরা ইলা মাকামিল আসরা গ্রন্থটি ছিল মহানবী (সা:) এর সপ্তম আসমানে ভ্রমণের ইতিবৃত্ত।[২২২]

[২২২] আব্দুল মওদুদ, *মুসলিম মনীষা*, (ঢাকা: ইফাবা, ১৯৮০), পৃ. ১৬৬

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

স্পেনীয় আরবী কবিতার প্রকরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বর্ণনামূলক কবিতা (الوصف)

আনদালুসীয় পদ্যের অন্যতম বিষয়বস্তু ছিল বর্ণনা। এটা পদ্য সাহিত্যের এক বিশাল স্থান জুড়ে ছিল। বর্ণনামূলক কবিতা বলতে কোন স্থান, ঘটনা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, পশু-পাখি, গাছ-পালা, শহর-বন্দর ইত্যাদি সবকিছুর বর্ণনা দেয়া বুঝায়। এটা মূলত কবিমনের অনুভূতির বহি:প্রকাশ। আনদালুসীয় কবিরা এ ধরনের কবিতায় আনদালুসের সামগ্রিক অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। তাদের বর্ণনায় বিভিন্ন ভাবে তারা বিভিন্ন শহর-নগর, স্থাপত্য, শিল্প, সামাজিক অবস্থা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, পাহাড়- পর্বত, নদ-নদী, গাছ-পালা, পশু-পাখি, বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা ইত্যাদি তুলে ধরেছেন।

বর্ণনামূলক কবিতা তাঁদের কাছে ছিল আনদালুসের দর্পণ স্বরূপ। এর মাধ্যমে তাঁরা আনদালুসের যাবতীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও সামাজিক ঘটনা তুলে ধরেছেন।

বর্ণনামূলক কবিতায় অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন ইবন খাফাজাহ। তিনি তাঁর কবিতায় নদ-নদীর বর্ণনা ফুটিয়ে তোলেন এভাবে:

لله نهر سال في بطحاء أشهى ورودا من لمى الحسناء
متعطف مثل السوار كأنه و الزهر يكنفه مجر سماء
قدرق حتى ظن قرصا مفرغا من فضة في بردة خضراء
و غدت تحف به الغصون كأنها هدب نحف بمقلة زرقاء

অর্থ: আল্লাহর জন্যে নদী প্রশস্ত হয়ে বয়ে চলেছে
উজ্জলা সৌন্দর্যের আভায় সুস্বাদু হয়েছে।
যেন তা চুড়ির ন্যায় বাঁকানো
এবং এমন ফুল যাকে আকাশের ব্যপ্তি ঘিরে আছে।
তা পাতলা হয়েছে যেন মনে হচ্ছে
সবুজ চাদরে রূপার শূন্য থালা ।
ডাল-পালাগুলো এর দ্বারা সুসজ্জিত হয়
যেন তা নীল নয়নার সুসজ্জিত চোখের পাতা। [২২৩]

রাজপ্রাসাদের নান্দনিক সৌন্দর্যের বর্ণনাও তাঁদের কবিতায় পাওয়া যায়। যেমন ইবন ইদরিস তাঁর এক কবিতায় আবু ইয়াহইয়া ইবনু আবি ইয়া'কুব ইবন আব্দিল মু'মিনের প্রাসাদের বর্ণনা দেন এভাবে:

الا حبذا القصر الذي ارتفعت به على الماء من تحت الحواجب أقواس
هو المصنع الأعلى الذي أنف الثرى و رفعه عن لثمه المجد و الناس
فأركب متن النهر عزا و رفعة و في موضع الاقدام لا يوجد الرأس

অর্থ: প্রাসাদ স্বাগত জানিয়েছে যা তাকে উন্নীত করেছে
পানির উপরে ও বক্র ললাটের নিচে
তা উচ্চ ভবন যা ধূলাকে অবজ্ঞা করেছে,
গরিমা ও মানুষের স্পর্শ তাকে উন্নীত করেছে

[২২৩] আব্দুল আযীয মুহাম্মদ ঈসা, *আদাবুল 'আরাবী ফিল আনদালুস*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১১৮

সম্মান ও উচ্চতার সাথে সে নদীর বুকে উঠেছে,
আর তার পায়ের স্থানে চূড়া পাওয়া যায় না। [২২৪]

বর্ণনামূলক কবিতার আরেক বিষয় ছিল মদ, বিভিন্ন খেল-তামাশা ও এসব ঘিরে অনুষ্ঠিত আড্ডার মজলিস। আনদালুসের কবিরা এসব বিষয় তাঁদের কবিতায় সুচারুরূপে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় ফুটিয়ে তুলতেন।

আনদালুসে বর্ণনামূলক কবিতার অন্যতম একটি বিশেষ দিক ছিল প্রকৃতির বর্ণনা। আরব কবিগণ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভাবে এ বিষয়ের বর্ণনা করেছেন, তবে আনদালুসে এ দিকটি কাব্য জগতের এক বিশেষ অংশ দখল করে ছিল। কবিরা তাঁদের কবিতায় বিভিন্ন ভাবে আনদালুসের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছেন। বিভিন্ন উপমা, ভাষাগত মাধুর্য, প্রাঞ্জল শব্দের ব্যবহার এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

ইবন খাফাজাহ আনদালুসের সৌন্দর্যকে জান্নাতুল খুলদের সাথে তুলনা করেছেন:

يا اهل الاندلس لله دركم ماء و ذل و انهار و اشجار
ما جنة الخلد الا في دياركم و لو تخيرت هذا كنتُ اختار

অর্থ: হে আনদালুস বাসী, আল্লাহর জন্যে তোমাদের বয়ে যাচ্ছে
পানি, ছায়া, নদ-নদী ও গাছ- পালা
তোমাদের আবাসেই তো জান্নাতুল খুলদ রয়েছে
যদি আমি নির্বাচক হতাম তবে এটাই তো বাছাই করতাম।[২২৫]

আনদালুসের প্রকৃতির বর্ণনায় তাঁরা সব দিকই তুলে এনেছেন। পাহাড়- পর্বত, উপত্যকা, আলো- ছায়া কোন কিছুই তাঁদের কবিতা থেকে বাদ যায়নি।

যেমন আবুল হাসান ইবনু নাযযারের কবিতায় পাওয়া যায়:

وادي الاشاتِ يهيجُ وجدي كلما أذكرتُ ما افضتُ بك النُعماء
لله ظلك و الهجيرُ مسلطٌ قد بردت لفحاته الانداء

অর্থ: বৃষ্টির উপত্যকা যা আমার অনুভূতিকে আকৃষ্ট করেছে
যখনই আমি স্মরন করি তখনই তোমাতে নিয়ামতরাজি পাই

[২২৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯
[২২৫] রাহমা ইমরান, *বাওয়া'ইছু শি'রুত ত্বিব'আতি ফিল আনদালুস ওয়া খাসাইসুহুল হাম্মা*, (পাকিস্তান জার্নাল অব ইসলামিক রিসার্চ, সংখ্যা:১৫, ২০১৫), পৃ:৩২৭

আল্লাহর জন্যেই তোমার ছায়া ও রোদ নিয়ন্ত্রিত
শিশিরের আগমনে তা প্রশমিত হয়েছে।[২২৬]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রণয়মূলক কবিতা (الغزل)

জাহেলী যুগ থেকেই আরবী পদ্য সাহিত্যের অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু ছিল গযল তথা প্রণয়কবিতা। জাহেলী যুগে কবিতা চর্চার একমাত্র প্রধান বিষয় ছিল এই প্রণয় কবিতা। এমনকি সাহিত্যের প্রত্যেক যুগেই কবিতার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল এটা। একই ধারাবাহিকতায় আনদালুসেও আরবী কবিতার উৎপত্তি হয় প্রণয় কবিতার মাধ্যমে।

তবে আনদালুসীয় কবিরা প্রণয় কবিতা রচনার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রাচীন পন্থা অবলম্বন করেন নি। কিছু সংখ্যক কবি প্রাচীন পন্থা অবলম্বন করলেও অন্যান্যদের কবিতায় গান-বাজনা প্রভাব ফেলে। কবিরা গানের

[২২৬] প্রাগুক্ত, পৃ: ৩২৮

সুরে প্রণয় কবিতা রচনা করতেন। এসময় প্রণয় কবিতা গুলো গানের উদ্দেশ্যেই রচিত হত। যেমন আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবন আইয়ুব আল মুরসীর প্রণয় কবিতায় পাওয়া যায়:

أنا سكران و لكن من هوى ذاك الفلانى
كلمت رمت سلؤا لم يزل بين عيانى

অর্থ: আমি নেশাগ্রস্ত, তবে তা ঐ অমুকের আসক্তিতে,
কথা বলেছি, নিক্ষিপ্ত হয়েছি, আমার দু' চোখের মাঝে তা প্রবাহমান।[২২৭]

প্রথম দিকের আনদালুসীয় প্রণয় কবিতার মধ্যে আমীর আব্দুর রহমান আল আওসাতের কবিতাকে অন্যতম বলে গণ্য করা হয়। তিনি জিলিকিয়া নামক জায়গায় এক অভিযানে গমন করে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করলে স্বীয় স্ত্রীর স্মরণে প্রণয়মূলক কবিতা রচনা করেন। এতে বীরত্ব ও প্রণয়ের সংমিশ্রণ ছিল। যেমন:

فقدتُ الهوى مُذ فقدتُ الحبيبا فما أقطع الليل إلا نحيبا
وإما بدت لي شمس النها ر طالعةً ذكّرتني طروبا
فيا طول شوقي إلى وجهها و يا كبدا اورثتْها نُدوبا
ويا أحسن الخلق في مقلتي و أوفرهم في فؤادي نصيبا

অর্থ: আমি আসক্তি হারিয়ে ফেলেছি তখন থেকে যখন আমার প্রেয়সীকে হারিয়েছি
আর যখনই আমার জন্যে দিনের সূর্য উদীত হয় আমাকে উৎফুল্ল চিত্তে মনে করিয়ে দেয়
তার পানে আমার ইচ্ছাগুলো দীর্ঘায়িত হয়েছে ও শোকগ্রস্ত হয়ে কষ্টকে চাপিয়ে দিয়েছে
ওহে আমার চোখে উত্তম চরিত্রের অধিকারী, আর আমার হৃদয়ে তা রোপন করে বাড়িয়ে দিয়েছে।[২২৮]

এ ছাড়াও রাজবংশের অনেকেই এ বিষয়ে প্রতিশযশা কবি ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আবু আইয়ুব সুলাইমান ইবনুল হাকাম ইবন সুলাইমান ইবন আব্দির রহমান আন নাসের, আল মুসতাঈন প্রমুখ।

তাওয়াইফ শাসনামলে রাজদরবারে কবিদের কবিতা চর্চার ক্ষেত্র প্রসারিত ও বৃদ্ধি পায়। এ সময় প্রণয় কবিতা চর্চাও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। এ ক্ষেত্রে যারা অবদান রাখেন তাদেঁর মধ্যে ইবন শুহাইদ,

[২২৭] আল মাকার্‌রী, *নাফহুত ত্বীব*, প্রাগুক্ত, ৩য় খন্ড, পৃ.২০৫
[২২৮] মুহাম্মদ রিদওয়ান আদ দাইয়া, *ফিল আদাবিল আনদালুসী* , প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

ইবন হাযম, ইবন যায়দুন, আল মু'তামাদ ইবন আব্বাদ, ইবন আম্মার, ইবন হাদ্দাদ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[২২৯]

তবে এ সময়ে সবচেয়ে বেশি অবদান ছিল মুহাম্মদ ইবনুল বাইন এর। তাঁর রচিত কবিতার মধ্যে অন্যতম হলো:

غصبوا الصباح فقسّمُوه خدودا و استَوهَبُوا قُضُبَ الأراكِ قُدودا
و رأوا حصى الياقوتِ دون محلّهم فاستبدلوا منه النجومَ عقودا
واستودعوا حدقَ المها أجفانهم فسَبَوا بهن ضراغما و أُسودا
لم يكفِ أن سلبوا الأسنّة و الظُّبا حتى استعانوا أعينا و نُهودا

অর্থ: তারা ভোরকে কেড়ে নিয়েছে এরপর তা কেটে ভাগ করেছে
আর ডালপালাগুলোকে তারা পরিমাপ করে দান করেছে
আর তারা গচ্ছিত রেখেছে বন্য গরুর চোখের পাতা ও দৃষ্টিকে
এদের দ্বারা কালো কেশরীকে তারা বন্দী করেছে।
তারা দন্ত বিকশিনী ও হরিণ লুণ্ঠন বাদ দেয়নি
এমনকি তারা দৃষ্টি সম্পন্ন ও সবলের সাহায্য চেয়েছে।[২৩০]

প্রণয়কাব্যে অন্যতম কবি ছিলেন ইবন যায়দুন। তিনি তাঁর প্রেমিকা ওয়াল্লাদা বিনতুল মুসতাকফী এর স্মৃতিচারণ করে প্রণয় কাব্য রচনা করেন। সাহিত্যিক ও সাহিত্য-সমালোচকদের দৃষ্টিতে তাঁর কবিতাকে এ সময়ের অন্যতম উৎকৃষ্ট প্রণয় কবিতা হিসেবে গণ্য করা হয়।

ইবনুল হাদ্দাদ আল ওয়াদী আশী নামক একজন কবি ছিলেন যিনি প্রণয় কাব্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। জামীলা (নুওয়াইরা) নামক এক খ্রিষ্টান তরুণীর প্রণয়ে তিনি কবিতা রচনা করেন। এতে তার বর্ণনা দিয়ে বলেন:

و الشمسُ شمس الحسن من بينهم تحت غمامات اللثماتِ
و ناظري مختلس لَمحَها و لُمحها يُضرم لوعتي
وفي الحشا نار نويريّة علّقتها منذ سُنِيّاتِ
لا نتطفي وقتا و كم رُمتُها **بل تلتَظي في كل أوقاتي**

[২২৯] প্রাগুক্ত, পৃ.৫৫
[২৩০] প্রাগুক্ত, পৃ.৫৭

অর্থ: আর তাদের মাঝে সূর্য হলো
মেঘের স্পর্শের নিচে সৌন্দর্যের সূর্য
আমার দৃষ্টি তার দৃষ্টিকে চুরি করেছে,
আর তার দৃষ্টি আমার ব্যথাকে প্রজ্জলিত করেছে।
আর অস্ত্রের মধ্যে অগ্নি, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ রয়েছে
তাকে বছরের পর বছর ধরে ঝুলিয়ে রেখেছে।
সময় অনুসরণ করিনি, আর কতই না অভিযোগ করেছি
বরং তা আমার প্রতিটি সময়ে প্রজ্জ্বলিত হয়েছে।[২৩১]

মুরাবিতীনদের আমলে প্রণয়কাব্যে প্রসিদ্ধ কবিদের অন্যতম ছিলেন আল আ'মা আততুতাইলী, ইবনু খাফাজাহ, ইবন ওয়াহবুন প্রমুখ। এবং মুওয়াহিদীন শাসনামলে এ বিষয়ের প্রখ্যাত কবি ছিলেন আবু জা'ফর ইবন সাঈদ, হাফসা আর রুকূনীয়া প্রমুখ।

আনদালুসীয় কাব্যের এ ধারা মুসলিম স্পেনের শেষ সময় পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। এমনকি গ্রানাডায় নাসিরীয় বংশের শাসকদের মধ্যেও কবিতা চর্চার প্রবণতা দেখা যায়। এ বংশের তৃতীয় শাসক আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ ছিলেন অন্যতম প্রসিদ্ধ একজন কবি।[২৩২]

আনদালুসীয় কবিদের প্রণয় কবিতা অন্যান্য যুগের ন্যায় বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপমা মন্ডিত হতে দেখা যায়। এসব কবিতায় কবিরা প্রকৃতির বিভিন্ন সৌন্দর্যের সাথে নারীর তুলনা করেছেন। অন্যান্য যুগের প্রণয় কবিতায় ন্যায় তাঁদের কবিতাতেও বাস্তবতা ও কল্পনা উভয় দিকই খুঁজে পাওয়া যায়।

তবে আনদালুসের প্রণয় কবিতার একটি বিশেষ দিক ছিল কবিরা শুধু প্রণয়মূলক বর্ণনার মধ্যেই সীমিত থাকেননি। এসব কবিতায় ধর্ম, দর্শন, সুফীবাদ ইত্যাদি বিষয়েরও তাঁরা অবতারণা করেন। যেমন সাফওয়ান ইবন ইদরিস কর্তৃক রচিত এক কবিতায় পাওয়া যায়:

تيمنى من طرفه مستضعف تراه كالمؤمن لينا هينا

অর্থ: আমার আশা আকাঙ্খা তার দিক থেকে দূর্বল
তুমি তাকে ক্ষীণকায় দূর্বল মু'মিনের মত দেখবে।[২৩৩]

---

[২৩১]প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

[২৩২] প্রাগুক্ত, পৃ:৬০

[২৩৩] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন মালেক আল আনসারী আল মারাক্বেশী, *আয যাইলু ওয়াত তাকমিলাহ লি কিতাবিল মাওসূল ওয়াস সিলাহ*, (তিউনিসিয়া: দারুল গারবিল ইসলামী, ২০১২) খন্ড: ৫/১, পৃ.৩৮০

ইবনুল জিনান আশ শাতবী তাঁর প্রণয় কবিতায় সুফীবাদ ও দর্শন এভাবে তুলে ধরেছেন:

أحبابنا ودعتم ناظري و أنتم بين ضلوعي نزول
حللتم قلبي و هو السدى يقول في دين الهوى بالحلول

অর্থ: আমরা ভালবেসেছি, আর তোমরা আমার দৃষ্টিকে তাড়িয়ে দিয়েছ
আর তোমরা তো সবলের মাঝে অবস্থানরত অবস্থায় রয়েছ।
আমার হৃদয়কে ভেঙ্গে দিয়েছ, আর তা তো নিষ্ফল,
উপস্থিতির মাধ্যমে তা ভালবাসার ধর্মের কথা বলে।[২৩৪]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রশংসাসূচক কবিতা (المدح)

প্রশংসামূলক কবিতা রচনাতেও আনদালুস অনেক সমৃদ্ধ ছিল। এর পরিধি ও ব্যপ্তি প্রাচ্যের প্রশংসামূলক কবিতার মতই ছিল। আনদালুসের উমাইয়া শাসক, আমীর-ওমরাহ, বরেণ্য ব্যক্তি প্রমুখকে নিয়ে এসব প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করা হত।

তন্মধ্যে হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষ দিকের অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন আবুল কাসেম আব্বাস ইবন ফিরানস। তিনি কবিতা চর্চার পাশাপাশি জ্ঞানের অন্যান্য শাখা যেমন রসায়ন, পদার্থ, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সঙ্গীত ইত্যাদিতে পারদর্শী ছিলেন।

[২৩৪] আল মাক্কাররী, *নাফহুত তীব*, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ: ১২২

তিনি যেসব শাসকদের প্রশংসা করেন তাঁদের মধ্যে আমীর মুহাম্মদ ছিলেন একজন। একবার তিনি তাঁর প্রশংসায় বলেন:

انّ القُفول الذي أوفى بعيدين مكرّمين على الدنيا عزيزين
قدوم أكرم من في الارض قاطبة قدوم فطر فكانا خير عيدين

অর্থ: নিশ্চয় প্রত্যাবর্তন সুসম্পন্ন হয়েছে দুই ঈদের মাধ্যমে
তারা দুনিয়ায় মহান ও সম্মানিত ।
পৃথিবীর সবার জন্যেই সম্মানের উপস্থিতি
আর ফাটলের উপস্থিতি, আর তারা তো উৎসবের সেরা।[২৩৫]

উমাইয়া খলিফাদের জন্যে প্রশংসাগাঁথা রচনায় অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন ইবন আব্দি রাব্বিহ। তিনি খলিফা, আমীর-ওমরাহ বিশেষ করে আব্দুর রহমান আন নাসিরের প্রশংসায় অনেক কবিতা রচনা করেন। এ সমস্ত প্রশংসা মূলক কবিতার অনেকাংশই ছিল আন নাসিরের বিভিন্ন সময়ের বিদ্রোহ দমন সহ নানা বীরত্বের বর্ণনা নিয়ে রচিত।

যেমন এক কবিতায় তিনি বলেন:

في غزوةٍ مئتا حصن ظفرت بها في كل حصن غواة للعناجيج
ما كان ملك سليمان ليدركها و المبتني سدّ يأجوج و مأجوج!

অর্থ: যুদ্ধে শত শত ঘোড়া, এর দ্বারা সফলকাম হয়েছে
প্রত্যেক ঘোড়ায় রয়েছে আকর্ষণের প্রলুব্ধতা।
বাদশাহ সুলাইমানও তা পায় নি
আর ইয়াজুজ মাজুজ ও ঘরের দরজা বন্ধ করেছে।[২৩৬]

তাঁর মূল কাব্যসংকলন টি খুঁজে পাওয়া যায়নি। ফলে বিভিন্ন ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মাধ্যম থেকে তাঁর কবিতাগুলো সংকলন করা হয়।

প্রশংসাগাঁথা রচনায় আরেকজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন আবু উমর আহমদ ইবনু দার্‌রাজ। তিনি মূলত হাজিব আল মানসুরের প্রশংসাতেই বেশি কবিতা রচনা করেন। তবে অন্যান্য শাসক যেমন তাঁর পুত্র আল মুজাফ্‌ফর আব্দুল মালিক, হাকাম প্রমুখকে নিয়েও তিনি প্রশংসাগাঁথা রচনা করেন।[২৩৭]

---

[২৩৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২
[২৩৬] ইবন আব্দি রাব্বিহ, *দিওয়ানু ইবন আব্দি রাব্বিহ* (তৃতীয় মুদ্রন), (দামেস্ক: দারুল ফিকর), পৃ. ৪৬-৪৭

এছাড়াও মুরাবিতীন শাসকদের নিয়ে প্রশংসাগাঁথা রচনায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন আল আ'মা আত তুতিলী, ইবনু খাফাজাহ, ইবনু ওয়াহবুন প্রমুখ কবিগণ। তাঁরা শুধু আমীর-ওমরাহদের প্রশংসা করেই ক্ষান্ত হন নি, বরং তাঁদেও পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, নিকটাত্মীয়দের নিয়েও প্রশংসাগাঁথা রচনা করেন।

আনদালুসে মুসলিম শাসনের শেষদিকে গ্রানাডায় বেশ কিছু সংখ্যক প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন যারা প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আবুল বাক্বা আর রুনদী, লিসানুদ্দীন ইবনুল খতীব, ইবন জুমরুক, ইবনুল জায়্যাব প্রমুখ। [২৩৮]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শোকগাঁথা (الرثاء)

সাহিত্যের অন্যান্য যুগের ন্যায় এ সময়েও শোকগাঁথা রচনা হত। একই ভাবে রচনার ধরণও ছিল দুই ধরনের। এক ধরনের শোকগাঁথা কবির পরিবার-পরিজন তথা বাবা-মা, ভাই-বোন, স্ত্রী, সন্তান, নিকটাত্মীয়, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব প্রমুখদের নিয়ে রচিত। আর দ্বিতীয় ধরনের শোকগাঁথা ছিল রাজনৈতিক ও সামাজিক স্তরের বিভিন্ন বরেণ্য ব্যক্তিদের নিয়ে রচিত।

শোকগাঁথা রচনায় কবিরা সাধারণত তিনটি বিষয় চিত্রায়ন করতেন। তা হলো:

---

[২৩৭] মুহাম্মদ রিদওয়ান আদ দাইয়া, *ফিল আদাবিল আনদালুসী* প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

[২৩৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

১.মৃত ব্যক্তির জন্যে ক্রন্দন, ২. তাঁর সম্মান, মর্যাদা বর্ণনাপূর্বক তাঁর মৃত্যুতে সমাজের ক্ষতির বর্ণনা, ৩. মৃত্যু যে অবধারিত একটি নিয়ম ও তা থেকে পলায়ন করা যায় না এসবের চিত্রায়ন করে সান্তনা প্রদান।[২৩৯]

শোকগাঁথা রচনায় অন্যতম কবি ছিলেন ইবন আব্দি রাব্বিহ। তাঁর দিওয়ানে বেশির ভাগ শোকগাঁথাই ছিল তাঁর সন্তান-সন্ততির মৃত্যুতে রচিত। এক কবিতায় বলেন:

قصد المنون له فمات فقيدا و مضى على صرف الخطوب حميدا
بأبي و أمي هالكا أفردْته قد كان في كل العلوم فريدا

অর্থ: নিয়তি তার জন্যে সংকল্প করেছে, ফলে সে মৃত্যুকে বরণ করেছে
আর বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রশংসিত হয়ে চলে গেছে।
আমার পিতা ও মাতার শপথ, আমি তাকে মৃত অবস্থায় আলাদা করেছি
সব জ্ঞানেই সে একাকী হয়ে গেছে।

এ বিষয়ে আরেকজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন আবু ইসহাক ইলবিরী। তিনি তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুতে শোকগাঁথা রচনা করেন। এতে তিনি তাঁর ভাল গুণাবলীর বর্ণনা করে তাঁর জন্যে ক্রন্দন করেন ও তাঁর জন্যে দোয়া করেন।

আনদালুসের আরেকজন অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি ইবনু খাফাজাহ। তিনিও শোকগাঁথা রচনায় বিশেষ অবদান রাখেন। তাঁর রচিত শোকগাঁথায় প্রাকৃতিক উপাদানের বর্ণনাও পাওয়া যায়। যেমন কবির দুঃখে প্রকৃতিও ভারাক্রান্ত, রাত অন্ধকারাচ্ছন্ন, নদী- সাগর শুষ্ক ইত্যাদি।[২৪০]
আনদালুসীয় আরবী সাহিত্যে প্রায় সব কবিই কম বেশি শোকগাঁথা রচনা করেছেন এবং বেশির ভাগ কবির দিওয়ানের বেশির ভাগ অংশ জুড়ে এর অবস্থান রয়েছে। এমনকি যেসব কবি প্রশংসাগাঁথা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন তাঁরা সেসব ব্যক্তির জন্যে শোকগাঁথাও রচনা করেন। এসময় সমাজের সব ধরণের গণ্যমান্য ব্যক্তি তথা রাজা-বাদশাহ থেকে শুরু করে আলেম- ওলামা, ফকীহ, দার্শনিক, সুফী-সাধক সহ সবার জন্যে কবিরা শোকগাঁথা রচনা করতেন। এসমস্ত কবিতায় তাঁদের বীরত্ব, মহত্ব, খোদাভীরুতা, সৎচরিত্র, দানশীলতা, বদান্যতা, সত্যবাদিতা, সততা সহ সব ভাল ভাল গুনের তাঁরা স্মৃতিচারণ করতেন।

ইবন যায়দুন একবার তাঁর এক বন্ধুর মৃত্যুতে শোকগাঁথা রচনা করেন:

يا قبرَة العطِر الذي لا يبْعدَن حُلوٌ من الفتيان فيك حلالُ
ما انت الا الجفن أصبح طيَّهُ فصلٌ عليه من الشباب صِقالُ

[২৩৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০
[২৪০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: হে সুগন্ধির কবর, যার মিষ্টতা
যুবকদের থেকে দূরে থাকে না, তোমাতে বৈধ (ব্যক্তি) রয়েছে
তুমি তো চোখের পাতা যার ভাঁজ স্পষ্ট হয়েছে,
তরুণদের মধ্য থেকে তার বিভাজন মসৃণ হয়েছে।[২৪১]

আরেক ধরণের শোকগাঁথা ছিল রাজা-বাদশা, আমীর-ওমরাহ শ্রেণীর ব্যক্তিদের নিয়ে রচিত। । এসমস্ত কবিতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবিরা স্বেচ্ছায় রচনা করতেন। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাজা-বাদশাহরা তাঁদের উপরে চাপিয়ে দিতেন। যেমন তাঁদের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনকে নিয়ে শোকগাঁথা রচনা। তখন তাঁরা শুধু দায়িত্ব পালনের জন্যেই সেসব কবিতা রচনা করতেন। তাতে কবিমনের প্রকৃত আবেগ-অনুভূতির কোন চিহ্ন থাকতনা।

খলিফা ইফসুফ ইবন আব্দুল মু'মিন একবার তাঁর পিতা আব্দুল মু'মিন ও মাহদীর ক্ববরের কাছে গমন করেন এবং তৎকালীন কবিদেরকে তাঁদের নিয়ে শোকগাঁথা রচনা করতে আদেশ দেন। তখন আবু মারওয়ান ইবন খালিদের একটি কবিতা পেশ করা হয়। তার কিছু অংশ নিম্নরূপ:

مجاري عيون المسلمين تسيل   دما و نجيعا و الدموع همول
ألم تر أن الدهر قد عم صرفه   ففي كل دار أنة و عويل
أحقا أمير المؤمنين إمامنا   محا القمر الديني منه أفول
أحقا مضى المنصور و اختر ربه   فليس مضى الايام منه فقول
أقام بأعلى (تينمال) وإنما   إلى جانب المهدي منه نزول

অর্থ: মুসলমানদের চক্ষু সিক্ত, তা থেকে
প্রবাহিত হয়েছে রক্ত এবং প্রবাহমান অশ্রুধারা
তুমি কি দেখো নাই যুগের কালচক্র ব্যাপক হয়েছে
ফলে প্রত্যেক গৃহেই বিলাপ ও ক্রন্দন বিদ্যমান।
আমীরুল মুমিনীন আমাদের যথার্থ নেতা ছিলেন
তাঁর সাথেই দ্বীনের চাঁদ অস্তমিত হয়েছে।
আল মানসুর চলে গেছেন, তাঁর প্রভু তাঁকে মনোনীত করেছেন
তবে যুগ থেকে তাঁর কথা চলে যায়নি।
তাঁকে উচ্চে স্থাপন করেছেন,
তিনি মাহদীর পাশে অবস্থানরত।[২৪২]

---

[২৪১]আলী আব্দিল আজীম, *দিওয়ানু ইবন যাইদুন*, প্রাগুক্ত,পৃ: ৫৩২-৫৩৩
[২৪২] ফাওযী ঈসা, *আশশি'রুল আনদালুসী ফী আসরিল মুওয়াহিদীন*, (আলেকজান্দ্রিয়া: দারুল ওফা, ২০০৭), পৃ. ১৬৭

এ সময়ের কবিদের শোকগাঁথার অন্যতম আরেক বিষয়বস্তু ছিল রাসূলুল্লাহ (সা) এর দৌহিত্র ইমাম হুসাইন ও তাঁর আহলে বাইতদের স্মরণ। মুওয়াহিদীনদের শাসনামলে আনদালুসের রাজনীতি ও ধর্ম অনেকাংশে শিয়া মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এর প্রভাব কবিতার উপরে এসেও পতিত হয়। কবিরা তাঁদের স্মরণে শোকগাঁথা রচনা করেন। এমনকি অনেক কবি তাঁদের উপরে গ্রন্থ রচনা করেন। এসব গ্রন্থের মধ্যে মুহাম্মদ ইবন সুলাইমান আত তাজীবীর "মানাকিবুস সাবতাইন আল হাসান ওয়াল হুসাইন", ইবনুল আব্বারের "মা'আদিনুল লাজীন ফী রছাইল হুসাইন" ও "দুরুরুস সামত ফী আখবারিস সাবত" উল্লেখযোগ্য।[২৪৩]

এ বিষয়ে কবিতা রচনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধি অর্জন করেন মুহাম্মদ ইবন সুলাইমান আত তাজীবী। তিনি ইমাম হুসাইন ও তাঁর আহলে বাইতের স্মরণে অনেক কবিতা রচনা করেন। তাঁর স্মরণে রচিত এক শোকগাঁথায় তিনি তাঁর জন্যে দোয়া করেন এভাবে:

قفوا ساعدونا بالدموع فإنها لتصغر في حق الحسين و يعظم
و مهما سمعتم في الحسين مراثيا تعبر عن محض الأسى و تترجم
فمدوا أكفا مسعدين بدعوة و صلوا على جد الحسين و سلموا

অর্থ: তোমরা দাঁড়াও, আমাদেরকে অশ্রু দ্বারা সাহায্য কর
তা হুসাইনের সম্মানের জন্যে অল্প
যখনই হুসাইনের ব্যাপারে শোকগাঁথা শুনবে
তখন নির্ভেজাল দু:খ ব্যক্ত করো ও ভাষান্তর করো
আর আহবানে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাও
আর হুসাইনের নানার প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করো। [২৪৪]

আনদালুসে মুসলিম শাসন যখন দূর্বল হয়ে পড়ে এবং খ্রিষ্টানরা সেভিল, কর্ডোভা, গ্রানাডার মত শহরগুলো একের পর এক দখল করতে থাকে তখন কবিরা নির্বাক হয়ে বসে থাকেন নি। তাঁরা তাঁদের দেশ ও শহর নিয়ে শোকগাঁথা রচনা করেন। এসব কবিতায় তাঁরা খ্রিষ্টানদের দখলদারিত্ব, মানুষের উপর অমানুষিক নির্যাতন, নিপীড়ন, অসহায় মানুষের দু:খ-কষ্ট গাঁথা তুলে ধরেন। এ ধরণের কবিতা তাঁদের কাছে মূলত দুই ধরণের ছিল। প্রথম প্রকার সমগ্র আনদালুসের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল। এতে কবিরা পুরো আনদালুসের সামগ্রিক অবস্থা তুলে ধরেছেন। আর দ্বিতীয় প্রকার ছিল আলাদা আলাদা করে প্রত্যেক শহরের অবস্থার বর্ণনা।

[২৪৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫
[২৪৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

ইবরাহীম ইবন ফারক্বাদ নামক এক কবি আনদালুসের শোকে এক দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন। তন্মধ্যে কিছু লাইন নিম্নরূপ:

ألا مسعد منجز ذو فطن فيبكى بدمع معين هتن
جزيرة أندلس حسرة ألا غالب من حقود الزمن؟
و كانت رباطا لأهل التقى فعادت مناطا لاهل الوثن
و كانت شجى في حلوق العدى فأضحى لهم ما لها محتجن

অর্থ: সৌভাগ্য সম্পন্ন বিচক্ষণতার অধিকারী নয় কি,
ফলে প্রবলভাবে বর্ষিত অশ্রুর মাধমে ক্রন্দনরত
আফসোস, আনদালুস উপদ্বীপ
যুগের বিদ্বেষে সেই কি প্রাধান্য পেয়েছে?
অথচ তা পরহেজগারদের জন্যে বন্ধন স্বরূপ ছিল
এখন তা প্রতিমা পূজারীদের জন্যে দায়িত্ব প্রাপ্ত।
শত্রুদের গলায় সে যন্ত্রণাদায়ক ছিল
এখন তাদের জন্যে সমর্থক হয়ে গেছে।[২৪৫]

শোকগাঁথামূলক কবিতার ক্ষেত্রে "নূনিয়া" রুনদীর একটি বিখ্যাত কবিতা। এ কবিতায় তিনি আনদালুসের প্রধান ও বিখ্যাত শহরগুলো যেমন সেভিল, কর্ডোভা, জায়ান প্রভৃতির পতন ও এসব এলাকার মানুষের কষ্ট ও দূর্ভোগের বর্ণনা ও এ থেকে মুক্তি কামনা করেন। এ কবিতায় শুরুতে তিনি অতীতের গৌরবোজ্জ্বল সময়কে স্মরণ করেছেন। এরপর তিনি আনদালুসের দূর্দিনে ইসলামের অপূরণীয় ক্ষতির কথা বলেছেন। হারিয়ে যাওয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান, জৌলুস, সৃষ্টিজগতের দু:খ- কষ্টের বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন:

دهى الجزيرة أمر لا عزاء له هوى له أحد و انهد ثهلان
أصابها العين في الإسلام فامتحنت حتى خلت منه أقطار و بلدان
فاسأل بلنسية ما شأن مرسية وأين شاطبة أم أين زيان
و أين قرطبة دار العلوم, فكم من عالم قد سما فيها له شان
و أين حمص و ما تحويه من نزه ونهرها الذب فياض و ملآن

অর্থ: উপদ্বীপে এমন বিষয় আপতিত হয়েছে যার সান্তনা নেই

[২৪৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

তার কামনা এক হয়েছে ও সমান হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে।
ইসলামের দৃষ্টিসমূহকে আঘাত করেছে, ফলে পরীক্ষার সামনে পড়েছে
এমনকি তা থেকে শহর- বন্দর খালি হয়ে গেছে।
বালানসিয়াকে জিজ্ঞেস করি, মুরসিয়ার কি অবস্থা
আর শাতবা কোথায় অথবা জায়ান কোথায়
জ্ঞানের ভূমি কর্ডোভা কোথায়, আর কতই না
জ্ঞানী তার অবস্থা উন্নীত করেছিলেন।
আর হামাস কোথায়, যাতে পরিচ্ছন্নতা ছিল
আর তার পরিপূর্ণ ও কূল উপচানো নদী। [২৪৬]

এছাড়াও এ কবিতায় তিনি পৃথিবীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সব মুসলমানকে এক হয়ে এসব বিপদ-আপদ দূর করার জন্যে আহবান জানিয়েছেন। একই সাথে তিনি আনদালুসে ইসলামের মৌলিকত্ব রক্ষা করার জন্যেও আহবান জানিয়েছেন। তিনি তাঁর এই দীর্ঘ কবিতায় তৎকালীন সামগ্রিক অবস্থা বিভিন্নরূপে তুলে ধরেছেন। তাঁর এই কবিতা অন্যান্য কবির কাছে অনুকরণীয় হয়ে ওঠে ও তাঁদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। একে উপজীব্য করে অন্যান্যরাও আনদালুসকে নিয়ে শোকগাঁথা রচনা শুরু করেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আধ্যাত্মিক কবিতা (التصوف/ الزهد)

আরবী পদ্য সাহিত্যের অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু আধ্যাত্মিক কবিতা বা বৈরাগ্যমূলক কবিতা। সাহিত্যের বিভিন্ন যুগেই এ ধরণের কবিতা চর্চা লক্ষ্য করা যায়। আনদালুসেও এ ধরণের কবিতার প্রসার ঘটে।

হিজরী ৫ম শতকের দিকে এ ধরনের কবিতা চর্চা দেখা যায়। এসময়ে বেশ কিছু কবি ছিলেন যাদের কাব্য সংকলনের সিংহভাগই ছিল বৈরাগ্যমূলক কবিতা।

[২৪৬] আল মাক্কাররী,*নাফহুত ত্বীব*, (বৈরুত: দারু সাদির) ৪র্থ খন্ড ,পৃ:৪৮৭

এ সময়ে বৈরাগ্যবাদের অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন আবুল কাসেম আস সুমাইসির। তিনি বৈরাগ্যবাদকে তাঁর কাব্যে প্রাধান্য দেন। তাঁর কবিতার মূল উপজীব্য ছিল দুনিয়া ও মানুষের জীবনের বাস্তব অবস্থান। যেমন তিনি বলেন:

لله في الدنيا و في اهلها معميات قد فككناها
من بشر نحن فمن طبعِنا نحب فيها المالَ و الجاها
دَعني من الناس و من قولِهم فانما الناسكُ خلاّها
لم تُقبل الدنيا على ناسكٍ الا و بالرحبِ تلقّاها

অর্থ: আল্লাহর পক্ষ হতে দুনিয়া ও তার বাসিন্দাদের জন্যে
রহস্য, আমরা তা মুক্ত করেছি।
মানুষের মধ্য থেকে আমরা, আমাদের স্বভাব
আমরা তার সম্পদ ও চাকচিক্যকে ভালবাসি।
মানুষ ও তাদের কথার মধ্যে আহবান কর
নিশ্চয় ইবাদতকারীই এসব থেকে মুক্ত।
ইবাদকারীর কাছে দুনিয়া গৃহীত হয়নি
এমনকি তার সাথে সাক্ষাতের পর স্বাগতও জানায়নি। [২৪৭]

কোন কোন কবির কাছে আধ্যাত্মিক কবিতা রচনার মৌলিক উৎস ছিল দর্শন। তাঁদের কবিতায় ধার্মিকতা বা খোদাভীতির কোন স্থান ছিল না। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ইবনুল হাদ্দাদ।

যেমন তাঁর এক কবিতায় বলেন:

لزمتُ قناعتي و قعدت عنهم فلستُ ارى الوزير و لا الأميرا
و كنتُ سمير أشعاري سَفاها فعُدْت لفلسفياتي سميرا

অর্থ: আমার পরিতৃপ্তির সাথে যথেষ্ট হয়েছি ও তাদের থেকে বিরত রয়েছি
ফলে আমি উযির, আমীর কিছুই দেখিনি।
আর আমি আমার অনুভূতির সাথী হয়েছি, তা দূর্বল হয়েছে
ফলে আমি আমার দর্শনের সাথী হয়ে ফিরেছি।[২৪৮]

[২৪৭] মুহাম্মদ রিদওয়ান আদ দাইয়া, *ফিল আদাবিল আনদালুসী* ,প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২
[২৪৮] প্রাগুক্ত, পৃ.৮৩

এ সময়ের অন্যতম প্রসিদ্ধ বৈরাগ্যবাদী কবি ছিলেন আবু ইসহাক আল ইলবিরী। এ বিষয়ে তাঁর স্বতন্ত্র একটি কাব্য সংকলন ছিল। তিনি নিজে এ বিষয়ে পন্ডিত ছিলেন তবে তাঁর নিজের বাস্তব জীবনে এর কোন প্রভাব ছিল না। দুনিয়াবী বিভিন্ন অসৎ কর্ম যেমন অপচয়, অপব্যয়, প্রবৃত্তির অনুসরণ, দুনিয়ার প্রতি মোহ ইত্যাদির বিমুখীকরণ ছিল তাঁর আধ্যাত্মিক কবিতার মৌলিক বিষয়। তাঁর ভাষায় দুনিয়া মানুষের জন্যে শত্রু। দুনিয়া বিমুখতা নিয়ে তিনি বলেন:

و ما آسى على الدنيا و لكن على ما قد ركبتُ من الذنوب

অর্থ: আর দুনিয়ার ব্যাপারে কোন আক্ষেপ নেই
তবে যে পাপের উপরে আরোহন করেছি তার ব্যাপারে।

তাঁর কবিতার আরেক উপাদান ছিল মৃত্যুর কথা স্মরণ। পৃথিবী যে এক সময় ধ্বংস হয়ে যাবে এবং মানুষ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে এসব তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক কবিতাগুলোতে তুলে ধরেছেন। যেমন তিনি বলেন:

نحن في منزل الفناء و لكن هو باب إلى البقاء و سُلّم
و رحى الموتِ تستديرُ علينا أبداً تطحن الجميعَ و تهشِمْ

অর্থ: আমরা ধ্বংসের আবাসে রয়েছি,
কিন্তু তা চিরস্থায়ী জীবনের দরজা ও সিঁড়ি।
আর মৃত্যুর চাকা আমাদের উপর অনবরত ঘুরছে
তা সব কিছুকে ভেঙ্গে চূর্ণ- বিচূর্ণ করছে।[২৪৯]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আল-মুওওয়াশ্শাহাত (الموشحات)

আনদালুসীয় আরবী কবিতার এক বিশেষ প্রকরণ আল মুওওয়াশশাহাত। আল মুওওয়াশ্শাহ শব্দটি **الوشاح** থেকে উৎপন্ন যার অর্থ মণি-মুক্তা খচিত এক ধরণের হার।[২৫০] এ বিশেষ ধরনের কবিতা কিছু **قفل** ও **غصن** এর সমন্বয়ে গঠিত এক নির্দিষ্ট ছন্দে রচিত হওয়ায় একে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

একটি মুওয়াশ্শাহাতের প্রধান তিনটি অংশ থাকে, যথা: قفل, بيت , خرجة

[২৪৯] প্রাগুক্ত, পৃ.৮৯
[২৫০] আবুল ফাদল জামালুদ্দীন ইবন মানজুর, *লিসানুল আরব*, (বৈরুত: দারু সাদির)

قفل হচ্ছে এমন পঙক্তি বা লাইন যা দিয়ে মুওয়াশশাহাতের সূচনা হয়ে থাকে। আবার এটা প্রতি بيت এর শুরুতে আসে।

بيت হচ্ছে এমন কিছু পঙক্তি বা লাইন যা দুই قفل এর মধ্যে আসে। একটি মুওয়াশ্শাহাতে সাধারণত ৫ টি فقرة থাকে। আর এর প্রতিটি فقرة কে بيت বলা হয়। যে কোন কবিতার পঙক্তিকেও بيت বলা হয়, তবে এই দুই بيت এর মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। কবিতায় একটি بيت এ মাত্র দুইটি شطر থাকে, আর মুওয়াশ্শাহাতের بيت এ অনেকগুলো شطر দেখতে পাওয়া যায়।[২৫১]

আর সর্বশেষ অংশটি হলো خرجة । এটা এমন লাইন যার মাধ্যমে মুওয়াশ্শাহাতটি শেষ হয়।

মুওয়াশ্শাহাতের সূচনা ও ক্রমবিকাশ:

মুক্বাদ্দাম ইবন মুআফী আল আনদালুসীকে মুওয়াশ্শাহাতের প্রণেতা হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে কখন তিনি প্রথম মুওয়াশশাহাত রচনা করেন তা নির্দিষ্ট করে পাওয়া যায় না। তাঁর জীবদ্দশার সময়কাল (২২৫-২৯৯ হি) গণনা করে বলা হয় হিজরী দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগ থেকে তৃতীয় শতকের মধ্যেই এই বিশেষ ধরনের গীতিকবিতার উৎপত্তি।[২৫২]

হিজরী ৩য় শতক তথা খ্রীষ্টিয় ৯ম শতক ছিল আমীর আব্দুল্লাহর শাসনামল। এ সময়ে প্রাচ্য ও আনদালুসে গান- বাজনার ব্যাপক প্রসার লক্ষণীয়। স্বভাবতই এর প্রভাব কবিতার উপরে পড়ে। ফলে গানের ছন্দ মিশ্রিত হয়ে কবিতার এক বিশেষ রূপের উৎপত্তি হয়।[২৫৩]

আনদালুসের নিজস্ব উদ্ভব হওয়া স্বত্ত্বেও সূচনালগ্ন থেকেই মুওয়াশ্শাহাত বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় রচিত হত।তবে এর শেষ লাইন خرجة এর ভাষা আনদালুসীয় আঞ্চলিক ভাষা নির্ভর ছিল। এসব কারণে মুওয়াশ্শাহাতে দুইটি দিক দেখতে পাওয়া যায়:

১. ছন্দের ক্ষেত্রে গীতিমূলক ভাবধারা,
২. ভাষাগত দিক থেকে বিশুদ্ধ ও আঞ্চলিক ভাষার সংমিশ্রণ।[২৫৪]

---

[২৫১] ড. আহমদ হাইকাল, আল *আদাবুল আনদালুসী মিনাল ফাতহি ইলা সুকুতিল খিলাফা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯
[২৫২] মুহাম্মদ রিদওয়ান আদ দাইয়া, *ফিল আদাবিল আনদালুসী* ,প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯
[২৫৩] ড. আহমদ হাইকাল, *আল আদাবুল আনদালুসী মিনাল ফাতহি ইলা সুকুতিল খিলাফা*, প্রাগুক্ত পৃ. ১৪৩
[২৫৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

মুওয়াশ্শাহাতের প্রথম উদ্ভব ও প্রণেতার নাম আমাদের কাছে পৌঁছলেও এর প্রথম কবিতার অস্তিত্ব বিদ্যমান নেই। তবে হিজরী ৩য় শতকের পর থেকে এর প্রসার লক্ষণীয়। মুওয়াশশাহাত থেকে আরেক ধরণের গীতি কবিতার উপস্থিতিও আনদালুসে লক্ষ্য করা যায়। একে زجل নামে নামকরণ করা হয়। মুওয়াশ্শাহাতের خرجة ব্যতীত সব পঙক্তিই বিশুদ্ধ আরবী ভাষা নির্ভর ছিল। কিন্তু زجل সম্পূর্ণই আনদালুসের আঞ্চলিক ভাষায় রচনা করা হত।[২৫৫]

আনদালুসের এই বিশেষ ধরণের গীতি কবিতা শুধু আনদালুসেই সীমিত থাকেনি, বরং সুদূর প্রাচ্যেও এ বিশেষ রীতি প্রবর্তিত হয়। এ ছাড়াও ইউরোপীয় সাহিত্যও এই বিশেষ ধারা কর্তৃক প্রভাবিত হয় এবং একে অনুসরণ করে নতুন ধারার উদ্ভব ঘটায়। দক্ষিণ ফ্রান্সে Troubadour নামক গীতি কবিতার উদ্ভব হয়। ইতালীয় কবিতায়ও এই মুওয়াশশাহাতের প্রভাবে নতুন ধারার উৎপত্তি হয়। সেখানে দুই ধরণের গীতি কবিতর অস্তিত্ব পাওয়া যায়: ধর্মীয় ভাবধারার গীতিকবিতা যাকে Laudos বলা হত এবং সাধারণ গীতিকবিতা যা Ballata নামে পরিচিত হয়।[২৫৬]

মুওয়াশশাহাতের বিষয়বস্তুঃ

প্রথম দিকে মুওয়াশশহাত সাধারণত দু'টি বিষয়কে ঘিরেই রচিত হত। তা হলো: প্রণয় ও প্রকৃতির বর্ণনা। পরবর্তীতে এটা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রচিত হতে থাকে। আরবী কবিতার অন্যান্য বিষয়বস্তু যেমন প্রশংসা, শোকগাঁথা, নিন্দা, দেশপ্রেম, বৈরাগ্যবাদ ইত্যাদি বিষয়েও মুওয়াশশাহাত রচনা হতে দেখা যায়।

বৈরাগ্যবাদ ও সুফীবাদ নিয়ে যারা মুওয়াশশাহাত রচনায় অবদান রাখেন তাঁদের মধ্যে শায়খ মুহিউদ্দীন ইবন আরাবী, আবুল হাসান আশ শুশতারী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[২৫৭]

মুওয়াশশাহাতের প্রসিদ্ধ কবি যারা এর প্রসারে ও চর্চায় বিশেষ অবদান রাখেন তাঁদের মধ্যে ইফসুফ ইবন হারুন আর রমাদী, উবাদাহ ইবন মা আসসামা, মুহাম্মাদ ইবন উবাদাহ আল ক্বাজ্জাজ, আবু বকর মুহাম্মাদ

[২৫৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০
[২৫৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০
[২৫৭] মুহাম্মদ রিদওয়ান আদ দাইয়া, *ফিল আদাবিল আনদালুসী* ,প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

ইবন আহমাদ আল আনসারী, আবু বকর ইবনুল লুবানা, আ'মা আত তুতিলী, আহমদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন হুরাইরা আল ক্বাইসী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[২৫৮]

[২৫৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

মুসলিম স্পেনের আরবী সাহিত্যের গঠনশৈলী

প্রথম পরিচ্ছেদ

গদ্য সাহিত্যের গঠনশৈলী

আনদালুসীয় আরবী গদ্য সাহিত্যের বিকাশের ক্ষেত্রে আমীর- ওমরাহ ও সাহিত্যিকদের মধ্যে বিশেষত কবিদের ভূমিকাই প্রণিধানযোগ্য। আনদালুসে ইসলামের জয়যাত্রা তারিক বিন যিয়াদের মাধ্যমে সূচিত হয় এবং তাঁর প্রদত্ত ভাষণকে যদিও গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথম ধরা হয় তবুও নিরেট সাহিত্য হিসেবে

অন্যান্য যুগের ন্যায় আনদালুসেও পদ্য সাহিত্যই প্রথম যাত্রা শুরু করে। এর পাশাপাশিই গদ্য সাহিত্যের যাত্রাও সূচিত হয় বলা যায়।

পদ্য সাহিত্যের ন্যায় গদ্য সাহিত্য একই সমান্তরালে তিনটি পর্যায় পার করেছে।

প্রথম পর্যায়ে আনদালুসীয়রা গদ্য রচনার ক্ষেত্রে প্রাচীনপন্থী হতে পারেনি। তারা উমাইয়া যুগের শেষ ভাগ কিংবা আব্বাসী যুগের প্রথম ভাগ কোনটাই অনুসরণ করতে পারেনি। তাদের কাছে আব্দুল হামিদ আল কাতিব কিংবা ইবনুল মুক্বাফ্ফার মত সাহিত্যিকরা তখনো অজ্ঞাত ছিলেন। আনদালুসে প্রথম যিনি গদ্য রচনা করেন আবু 'আলী আনক্বালী, তিনি প্রাচ্যের অধিবাসী ছিলেন।

তবে তাঁর পরবর্তীতেই আনদালুসীয় সাহিত্যিক ইবন আব্দি রাব্বিহ "আল ইকদুল ফরীদ" রচনা করেন যা আনদালুসীয় গদ্য সাহিত্যের এক মূল্যবান সম্পদ। ইবন আব্দি রাব্বিহ শুধু গদ্যকারই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত কবি।

এ পর্যায়ের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল ভাষাবিদদের অবদান। আনদালুসীয় গদ্য সাহিত্যে ভাষাবিদরা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেন। এর যাত্রা শুরু হয় আবু আলী আল ক্বালীর মাধ্যমে, এবং পরবর্তীতে ইবনুল কুতিয়্যার মত ভাষাবিদরা এতে অবদান রাখেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে গদ্য সাহিত্য ব্যাপকতা লাভ করে। এসময়কাল ছিল রাজা- বাদশাহ, আমীর-ওমরাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় পুষ্ট সাহিত্যের। এসময়ে দরবারী লেখক- সাহিত্যিকের প্রভাব বেশি লক্ষণীয়। চিঠি-পত্র, দাপ্তরিক লেখনী ইত্যাদি সহ বিভিন্ন রচনা ও তাতে দক্ষতার ছাপ পরিলক্ষিত হয়। এসময়ের গদ্য সাহিত্য বিভিন্ন রীতি-নীতি, শাব্দিক মাধুর্যতা, ভাষাগত পেলবতা ইত্যাদি নানাবিদ উৎকর্ষতার ছোঁয়া পায়।[২৫৯]

আর শেষোক্ত পর্যায়ে গদ্য সাহিত্য উৎকর্ষতার চরম পর্যায়ে অবস্থান করে।

আনদালুসীয় গদ্য সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারা ছিল মাকামা। যদিও মাকামা সাহিত্য প্রাচ্যীয় আরবী সাহিত্যের একটি রূপ তবুও আনদালুসীয় সাহিত্যিকরা এ ক্ষেত্রে প্রাচ্যকে পুরোপুরি অনুসরণ করেননি। বিশেষ করে এতে কাহিনী বর্ণনার ক্ষেত্রে বিভিন্নতা আনেন।

প্রাচ্যীয় মাকামার ক্ষেত্রে একটি মাকামায় একটি বিষয়ের অবতারণা থাকত। আর আনদালুসীয় মাকামায় একটিতে বিভিন্ন বিষয় আনা হতো। এমনকি গদ্য ও পদ্যের মিশ্রিত রূপ ও এতে পাওয়া যায়।

[২৫৯] জাওযীফ আল হাশেম, *আল কিতাবুল মুফীদ ফিল আদাবিল 'আরাবী* ,(বৈরুত: দারুল ইলম আল মালায়িন,১৯৯৯) পৃ: ৬৫৩

এছাড়াও আনদালুসীয় গদ্য সাহিত্যে রিসালাত তথা চিঠি-পত্রের ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। এ সমস্ত চিঠি-পত্র শুধু রাজা- বাদশাহদের দরবার বা কোথাও প্রেরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারা রূপে প্রকাশ পায়। এতে কল্পনার মাধ্যমে ভাবের জগতে বিচরণ করে বিভিন্ন ভাবে লেখা হত। প্রাণীজগত, শয়তান প্রভৃতির কাছেও লেখা হত। এতে শাব্দিক ও ভাবের প্রকাশ ই ছিল প্রণিধান যোগ্য। যেমন رسالة الهزلية ও অনুরূপ আরো অন্যান্য রিসালাত।

সর্বোপরি বলা যায়, আনদালুসীয় আরবী সাহিত্যের যাত্রা প্রাচ্যীয় আরবী সাহিত্যের প্রভাবে হলেও তথাকার সাহিত্যিকগণ প্রতিটি বিষয়ই নিজস্ব স্টাইলে রূপায়ন করার চেষ্টা করেছেন। এবং এখানেই আনদালুসীয় সাহিত্য বিশেষ ভাবে বিশেষায়িত হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পদ্য সাহিত্যের গঠনশৈলী

আনদালুসে কবিতা চর্চার পেছনে শাসকশ্রেণীর অসামান্য অবদান রয়েছে। তাঁদের অনেকেই কবি ও কবিতার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অনেকে নিজেই কবি- সাহিত্যিক ছিলেন। যেমন আব্দুর রহমান আদ দাখিল

কবি ছিলেন, তাঁর পুত্র হিশাম সাহিত্যিক ছিলেন। আরেক শাসক আল মুসতানসির ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। এছাড়াও প্রায় সবাই কম বেশি কবি- সাহিত্যিকদের বিভিন্ন ভাবে উৎসাহ- উদ্দীপনা দিতেন।

আনদালুসে আরবী কাব্য চর্চার বিপ্লব ঘটার পেছনে বেশ কিছু কার্যকরণ রয়েছে। তা হলো:

১.আনদালুসের প্রকৃতি ও তার মনলোভা সৌন্দর্য্য।
২.আমীর-ওমরাহদের সহায়তা।
৩.আনদালুসের ভূমিতে অনেক আরবের উপস্থিতি ও বসবাস।[২৬০]

আনদালুসীয় কবিরা কবিতা রচনার ক্ষেত্রে প্রাচ্যের আরবী কবিদের অনুসরণ করতেন। আনদালুসীয় কবিতার বিষয়বস্তু ও গঠনশৈলীতে প্রাচ্যের আরবী কবিতার সরাসরি প্রভাব বিদ্যমান। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কবিরা নিজস্ব বিষয় ও শৈলীর অবতারণা করেছেন।

আরবী কবিতার মৌলিক বিষয়বস্তুগুলো যথা বর্ণনা, প্রণয়গাঁথা, শোকগাঁথা, প্রশংসা, বৈরাগ্যগাঁথা ইত্যাদি বিষয়ে আনদালুসীয় কবিরাও কবিতা রচনা করেছেন। তাঁরা এসব বিষয়ের অনেকাংশেই আরবদের অনুসরণ করেন। তবে বর্ণনামূলক কবিতার ক্ষেত্রে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে আরবদের অনুসরণ করেছেন।[২৬১] তাঁরা কবিতায় কোন কিছুর বর্ণনাই বাদ দেন নি। আনদালুসীয় কবিরা তাঁদের কবিতায় দেশের নদ- নদী, পাহাড়- পর্বত, গাছ-পালা, বন-জঙ্গল, জীব-জন্তু, রাজ-প্রাসাদ, ঐতিহাসিক স্থাপনা, শহর-নগর, ইতিহাস-ঐতিহ্য, আমীর-ওমরাহ, জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি সব কিছুর বর্ণনা করেছেন।

আনদালুসীয় কাব্য সাহিত্যে কবিরা যে সব নতুন বিষয়কে নিজস্ব বিষয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করান সেগুলো হলো[২৬২]:

১.শহর- নগর নিয়ে শোকগাঁথামূলক কবিতা:

এ বিষয়টি আনদালুসেই সর্বপ্রথম চর্চা করা হয়। এর আগে আরবী সাহিত্যে শোকগাঁথামূলক কবিতা বলতে নিজের পরিবার- পরিজন, আত্মীয়- স্বজন, বন্ধু- বান্ধব, আমীর- ওমরাহ, আলেম- ওলামা প্রমুখের মৃত্যুতে রচিত কবিতাকে বুঝাতো। কিন্তু আনদালুসে শোকগাঁথার এক নতুন দিক সংযোজিত হয়। এখানে মুসলিম

[২৬০] ড. মুহাম্মদ আব্দুল মুন'ইম খাফাজী, *আল আদাবুল আনদলুসী তাতউইর ওয়া তাজদীদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭
[২৬১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮
[২৬২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯

শাসন যখন স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং খ্রিষ্টানরা একের পর এক সাম্রাজ্যগুলো দখল করে নিতে থাকে তখন কবি- সাহিত্যিকগণ নিজ জন্মভূমির এই করুণ দূর্দশা তাঁদের শোকগাঁথার মাধ্যমে তুলে ধরেন।

২.সাহায্য প্রার্থনামূলক কবিতাঃ

আমীর- ওমরাহ, সৎকর্মশীল, নেককার ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য করে তাঁদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে এ ধরণের কবিতা লেখা হত। এটা সম্পূর্ণই নতুন একটি বিষয় যার আগে কখনোই প্রচলন ছিল না। হিজরী অষ্টম ও নবম শতকে আনদালুসে এর প্রসার ঘটে।

৩. জ্ঞান- বিজ্ঞান নিয়ে রচিত কবিতাঃ

এটাও আনদালুসীয় আরবী কবিতার সম্পূর্ণ নতুন ও নিজস্ব একটি বিষয়।

আনদালুসীয় কবিরা তাঁদের কবিতায় সহজবোধ্য শব্দের প্রয়োগ করেছেন। যেসব শব্দ দূর্বোধ্য ও সর্বসাধারণের বুঝতে কষ্ট হয় সে শব্দগুলো তাঁরা পরিহার করেছেন এবং যে শব্দগুলো বহুল প্রচলিত ও প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হয় সেগুলোকেই তাঁরা কবিতার ভাষা হিসেবে নিয়ে আসতেন।[২৬৩]

আনদালুসীয় আরবী কবিতায় অর্থগত তেমন কোন জটিলতাও ছিল না। কবিরা কবিতা রচনায় প্রজ্ঞাপূর্ণ চিন্তা-ভাবনা ও দার্শনিকতার গভীর তত্ত্ব থেকে বিরত থেকেছেন। তাঁদের কবিতায় শুধু কবিমনের স্বভাবসুলভ আবেগের প্রকাশ ঘটেছে।

আনদালুসে আরবী কবিতার উৎপত্তি ও গঠনশৈলীতে আরবদের ভূমিকা অপরিসীম। আরবদের কাছে কবিতা ছিল দুই ধরণের- গ্রাম্য জীবন ও নগর জীবনের ভাবধারা নিয়ে রচিত কবিতা।যখন তারা আনদালুসে এসে বসতি স্থাপন করে তখন তাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, জীবন-ধারা ইত্যাদি দেখে এর বাসিন্দারা আকৃষ্ট হয় এবং তাদেরকে সর্বাত্মকরণে অনুসরণ করার চেষ্টা করে। এরই ফল স্বরূপ আনদালুসীয় আরবী কবিতাতে নগর জীবনে গ্রাম্য প্রাকৃতিক ভাবাবেগের ছাপ পরিলক্ষিত হয়। এসব কবিতা ছিল কবিমনের নি:স্বার্থ অনুভূতির বহি:প্রকাশ।

পরবর্তীতে আনদালুসের আমীর-ওমরাহগণ কবি ও কবিতা চর্চাকে বিভিন্ন ভাবে উৎসাহ প্রদান করতে শুরু করেন। এমনকি শাসকশ্রেণীর মধ্যে অনেকে কবিতা চর্চাও করেন। তাঁরা আনদালুসে কবিদেরকে কাব্যচর্চার যথেষ্ট সুযোগ করে দেন। এমনকি এর জন্যে তাঁদেরকে তাঁরা উপঢৌকনও প্রদান করতেন।

[২৬৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০

ফলে তখন থেকে কবিরা কবিতাকে উপার্জনের একটি মাধ্যম হিসেবে গণ্য করে আমীর ওমরাহদের প্রশংসাগাঁথা, শোকগাঁথা ইত্যাদি রচনা করে তাঁদের আস্থাভাজন ব্যক্তিতে পরিণত হওয়ার চেষ্টা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুসলিম স্পেনের কবি- সাহিত্যিক

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইবনু আব্দি রাব্বিহ

মুসলিম স্পেনের অন্যতম প্রখ্যাত কবি ছিলেন ইবন আব্দি রাব্বিহ।তাঁর পুরো নাম আবু উমর আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আব্দি রাব্বিহ। তিনি ইবন আব্দি রাব্বিহ নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষ

সালেম হিশাম ইবন আব্দির রহমান আদ দাখিলের দাস ছিলেন। তিনি ২৪৬ হিজরীতে(৮৬০ খ্রি.) কর্ডোভায় জন্মগ্রহণ করেন এবং আনদালুসেই তিনি বেড়ে ওঠেন।

অল্প বয়স থেকেই তিনি জ্ঞান চর্চা শুরু করেন। প্রথম দিকে তাঁর পিতা তাঁকে এক মকতবে ভর্তি করেন। সেখানে লেখাপড়া শেষ হলে তাকে কর্ডোভার বড় মসজিদে জ্ঞান অর্জনের জন্যে প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি অনেক বড় বড় জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির কাছে ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বাকী ইবন মুখাল্লাদ, ইবন ওয়াদ্দাহ প্রমুখ।[২৬৪] এছাড়াও তিনি জ্ঞানার্জনের জন্যে প্রাচ্য সহ বিভিন্ন এলাকায় গমন করেন যার বর্ণনা তাঁর বিভিন্ন লেখায় পাওয়া যায়।

তাঁর সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ ঘটে আমীর মুহাম্মদের সময়ে। তবে তাঁর সাহিত্য চর্চার বেশির ভাগই ছিল তাঁর পুত্রদের শাসনামলে। তিনি প্রথম থেকেই রাজ-রাজরা ও আমীর- ওমরাহদের দরবারী কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ লাভ করেন। অন্যান্য আরব কবিদের ন্যায় তিনিও রাজা- বাদশাহ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে প্রশংসা, বীরত্ব, শোকগাঁথা ইত্যাদি রচনা করতেন।

তিনি তাঁর জীবদ্দশায় আমীর মুহাম্মদ ও তাঁর দুই পুত্র মুনযির ও আব্দুল্লাহ এবং আব্দুর রহমান আন নাসিরের শাসনামলের কিছু সময় অতিবাহিত করেন। ফলে স্বভাবতই তিনি তাঁদের সাথে গভীর ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি খলিফদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। এমনকি উক্ত রাজ-দরবারের আমীর-ওমরাহ, উযীর, সেনাপতি সহ বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে নিয়েও প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করতেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সেনাপতি আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবী উবাদাহ, আবুল আব্বাস আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবী উবাদাহ, ফকীহ আবু সালেহ আল মুআফিরী প্রমুখ।[২৬৫]

আমীর মুহাম্মদের মৃত্যুর পরে আনদালুসের সিংহাসনে আরোহন করেন তাঁর পুত্র মুনযির। তখন কবি ইবনু আব্দি রাব্বিহ তাঁর কাছের কবিতে পরিণত হন। মুনযির আমীর হওয়ার পরে তিনি তাকে নিয়ে অনেক প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করেন। যেমন:

بالمنذر بن محمد شرقَتْ بلادُ الاندلس
فالطير فيها ساكنٌ و الوحشُ فيها قد أنِس

অর্থ: আল মুনযির ইবন মুহাম্মাদের দ্বারা আনদালুস সম্মানিত হয়েছে

[২৬৪] ড. শাওকী দ্বাইফ, *তারীখুল আদাবিল আরাবী*, *'আসরুদ দুওয়ালি ওয়াল ইমারাতিল আনদালুস* , প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮
[২৬৫] ড. মু. রিদওয়ান আদ দাইয়া, *ফীল আদাবিল আনদালুসী*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩০২

পাখিরাও তাতে বসবাসরত, আর বন্যরাও তাতে অভ্যস্ত।[২৬৬]

তিনি খলিফা আবদুর রহমান আন নাসিরের শাসনকাল অতিবাহিত করেন এবং তাঁরও দরবারী কবি হিসেবে পরিগণিত হয়ে যান। তাঁর প্রশংসাতেও তিনি প্রচুর কবিতা রচনা করেন। তিনি যখন ইবন হাফসুনকে দমন করেন তখন তাঁর প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন:

قد اوضح الله للاسلام منهاجا و الناسُ قد دخلوا في الدين افواجا
و قد تزيّنت الدنيا لساكنها كأنما أُلبستْ وشيا و ديباجا
يا ابن الخلائف إن المُزن لو علمتْ نداك ما كان منها الماء ثجّاجا
و الحربُ لو علمت بأساً تصول به ما هيَّجتْ من حُمياك الذي اهْتاجا
مات النفاقُ و أعطى الكفرُ دمّتهُ و ذلّت الخيلُ إلجاما و إسراجا

অর্থ: আল্লাহ ইসলামের জন্যে রীতি নীতি স্পষ্ট করেছেন
আর মানুষ দলে দলে দ্বীনে প্রবেশ করেছে।
আর দুনিয়া তার বাসিন্দাদের জন্যে সুশোভিত হয়েছে
যেন তা নকশাদার রেশমী বস্ত্র পরিধান করে রয়েছে।
হে প্রতিনিধিদের পুত্র, মেঘ যদি আপনার সিক্ততা জানত
তবে তা থেকে মুষলধারে বৃষ্টি হত না
আর যুদ্ধ যদি কষ্টের কথা জানত তবে ঝাঁপিয়ে পড়ত তাতে
যা আপনার উত্থিত ক্রোধকে প্রজ্জ্বলিত করেছে ।
কপটতা মৃত্যুবরণ করেছে ও কুফরী তার রঙকে দান করেছে
আর ঘোড়াগুলো জিন ও লাগাম পড়ানো অবস্থায় বশ্যতা স্বীকার করেছে।[২৬৭]

জীবনের প্রথমদিকে তিনি অনেক আয়েশী ও লাগামহীন জীবন যাপন করেন। তিনি মদপান ও খেলতামাশায় মগ্ন থাকতেন এবং সেসব নিয়ে কবিতা রচনা করতেন। জীবনের শেষভাগে উপনীত হয়ে নিজের ভুল বুঝতে পেরে তওবা করেন এবং বৈরাগ্যের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং এ বিষয়ে কবিতা রচনাও শুরু করেন।[২৬৮] এ কবিতাগুলোকে "মুমাহহিসাত" বলা হত।

[২৬৬] ড. ইহসান আব্বাস, *তারীখুল আদাবিল আনদালুসী 'আসরু সিয়াদাতি কুরতুবা* ,প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮
[২৬৭] ড. মু. রিদওয়ান আদ দাইয়া, *ফিল আদাবিল আনদালুসী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩

[২৬৮] ড. আহমদ হাইকাল, *আল আদাবুল আনদালুসী মিনাল ফাতহি ইলা সুকুতিল খিলাফাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৪

এ বিষয়গুলো ছাড়াও অন্যান্য কবির মত তিনি প্রশংসাগাঁথা, শোকগাঁথা, প্রণয় সহ বিভিন্ন বিষয়ে কবিতা শুরু করেন। তাঁর কবিতাগুলো বিশাল দিওয়ানে সন্নিবেশিত ছিল। এ দিওয়ান ২০ টির ও বেশি খন্ডে বিভক্ত ছিল। তবে তা পরবর্তীতে আর খুঁজে পাওয়া যায় না এবং বিভিন্ন মাধ্যম দিয়ে অল্প কিছু কবিতা টিকে থাকে। এসব কবিতা পরবর্তীতে বিভিন্ন সংকলন ও সাহিত্যের গ্রন্থ যেমন ইবন আব্দি রাব্বিহ এর "আল-ইকদুল ফরীদ", ছা'লাবীর "ইয়াতিমাতুদ দাহর", ইবন হায়্যান এর "আল-মুকতাবিস", ইবনু দাহিয়্যা এর "আল-মুতরাব" ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।[২৬৯]

ইবন আব্দি রাব্বিহ এর কাব্যের প্রধান বিষয় ছিল প্রণয় কবিতা। তিনি তাঁর বেশির ভাগ কবিতাতেই যে কোন উপায়ে প্রণয়ের বর্ণনা নিয়ে এসেছেন। কখনো কোন দীর্ঘ কবিতার শুরুতে, কখনো খন্ড কবিতায়, আবার কখনো স্বতন্ত্র কবিতা হিসেবে এ বিষয়ের অবতারণা করেছেন।

তাঁর কবিতার অন্যতম আরেক বিষয় ছিল হিজা তথা নিন্দামূলক কবিতা। এটাও তাঁর জীবনের প্রথম দিকের বিষয়বস্তুগুলোর মধ্যে একটি। এ বিষয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহের বর্ণনা দিয়ে কবিতা রচনা করেন।

শোকগাঁথা ছিল তাঁর কবিতার অন্যতম বিষয়বস্তু। তার দুই পুত্র তাঁর জীবদ্দশাতেই মারা যায়। একজন শিশুকালে ও আরেকজন প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে মারা গেলে তিনি তাদের স্মরণে শোকগাঁথা রচনা করেন।[২৭০]

আনদালুসের আরবী কবিতার বিশেষ প্রকরণটি ছিল মুশাওওয়াহাত। ইবন আব্দি রাব্বিহ এ বিষয়েও কবিতা রচনা করেন। তবে এ বিষয়ে তিনি অন্যদের মত তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারেন নি, এমনকি এ বিষয়ে তাঁর তেমন কবিতাও পরবর্তীতে পাওয়া যায়না।

আল-ইকদুল ফরীদঃ

ইবন আব্দি রাব্বিহ কর্তৃক রচিত অন্যতম গ্রন্থ "আল-ইকদুল ফরীদ"। দূর্লভ ঘটনা ও গল্পের সংকলনের ক্ষেত্রে এটাকে প্রাচীন গ্রন্থের একটি হিসেবে গণ্য করা হয়। এতে তিনি এমন অনেক বিষয়ের অবতারণা করেছেন যেগুলো ইতিপূর্বে কেউ নিয়ে আসেনি। এতে তিনি গদ্য, পদ্য, দূর্লভ ঘটনা, ইতিহাস-ঐতিহ্য,

[২৬৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১

[২৭০] ড. মু. রিদওয়ান আদ দাইয়া, *ফিল আদাবিল আনদালুসী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯

প্রবাদ-প্রবচন, উপদেশ, নসীহত সহ বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যমূলক বিষয় সন্নিবেশিত করেছেন।

গ্রন্থটিকে তিনি মোট ২৫ টি অধ্যায়ে এবং আটটি খন্ডে বিভক্ত করেছেন। তিনি বিভিন্ন মূল্যবান পাথরের নামে অধ্যায়গুলোর নামকরণ করেছেন। যেমন প্রথম অধ্যায়ের নাম "আল-লুঅলুআতু ফিস সুলতান", অষ্টম অধ্যায়ের নাম "আয যামরাদাতু ফিল মাওয়াইয ওয়াল যুহদ" ইত্যাদি।

তিনি এর আটটি খন্ডকে বিষয়ভিত্তিক সাজিয়েছেন। ১ম খন্ডে শাসক-গোষ্ঠী, যুদ্ধ-বিগ্রহ, প্রতিনিধিদল ইত্যাদির বর্ণনা এসেছে। ২য় খন্ডে তিনি সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাম্রাজ্যের বক্তৃতার বর্ণনা এনেছেন। ৩য় খন্ডে প্রবাদ-প্রবচন, উপদেশ, বৈরাগ্য, শোকগাঁথা, বংশগৌরব ইত্যাদি, ৪র্থ খন্ডে আরবদের বাণী, বক্তৃতা, তাওকী'আত, লেখনী ইত্যাদি, ৫ম খন্ডে খলিফা, যিয়াদ, হাজ্জাজ, বারমুকা প্রভৃতির বর্ণনা, ৬ষ্ঠ খন্ডে আরবদের ইতিহাস, দিনলিপি, তাদের ঘটনা, ৭ম খন্ডে নারী, শিশু, কৃপণ, মানুষ ও পশু-পাখির অবস্থা, দেশের মর্যাদা প্রভৃতির বর্ণনা ও সর্বশেষ অষ্টম খন্ডে খাদ্য, পানীয়, উপঢৌকন, ক্রীড়া-কৌতুক ইত্যাদির বর্ণনা এসেছে।

তাঁর এই গ্রন্থটি আরবী সাহিত্যের এক মহামূল্যবান মৌলিক গ্রন্থ। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবন খালদুন একে আরবদের কাব্য ও ঘটনাবলীর সংরক্ষক হিসেবে অভিহিত করেছেন।[২৭১]

পরবর্তীতে বিভিন্ন লেখক তাঁদের গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে মৌলিক উৎস হিসেবে "আল-ইকদুল ফরীদ" এর সাহায্য গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে ক্বালকাশান্দীর "সুবহুল আ'শা", বাগদাদীর "খাজানাতুল আদাব", ইবন খালদুনের আল-মুক্বাদ্দামা অন্যতম।[২৭২]

এই আনদালুসীয় কবি শেষ বয়সে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হন এবং এতেই ৩২৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইবনু হানী

মুসলিম স্পেনের অন্যতম কবি ছিলেন ইবনু হানী। তাঁর পুরো নাম আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনু হানী আল আযদী। তবে তাঁর নাম মুহাম্মদ হওয়া স্বত্ত্বেও পিতার নামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষের

[২৭১] হান্না আল ফাখুরী, *তারীখু আদাবিল আরব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২৭
[২৭২] প্রাগুক্ত, পৃ.৮২৮

বংশধারা আল মুহাল্লাব ইবন আবী সফরা এর সাথে সম্পৃক্ত ছিল। তাঁর পিতা হানী সর্বপ্রথম আফ্রিকার দক্ষিণে কোন এক গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেন। এরপর সেখান থেকে আনদালুসে গমন করেন এবং বসতি স্থাপন করেন। সেখানেই ৩২০ মতান্তরে ৩২৬ হিজরীতে সেভিলে ইবনু হানী জন্মগ্রহণ করেন।[২৭৩]

তিনি কর্ডোভার দারুল উলূমে ভর্তি হয়ে সেখানে বিভিন্ন জ্ঞান চর্চা শুরু করেন। তাঁর পিতা একজন কবি ছিলেন। ফলে তিনি ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যের অনুকূল পরিবেশে বেড়ে ওঠেন এবং এ ব্যাপারে জ্ঞানার্জনও শুরু করেন। তিনি আরবদের কাব্য, ইতিহাস ও ঘটনাবলীর সংরক্ষণ করেন। পাশাপাশি নিজেও কবিতা চর্চা শুরু করেন। তাঁর কাব্য প্রতিভার জন্যে তাঁকে "প্রাশ্চাত্যের মুতানাব্বী" বলা হত।[২৭৪]

ইবনু হানী বেশিদিন আনদালুসে থাকতে পারেননি। ফাতেমীয়দের আন্দোলন ও দার্শনিক চিন্তাধারার কিছুটা তাঁর কবিতায় প্রকাশ পেলে সেভিলের অধিবাসীরা তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং ফাতেমীয়দের সাথে তাঁর সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ এনে তাঁর নামে সেভিলের শাসকের কাছে নালিশ করে। তখন সেভিলের শাসক তাঁকে আনদালুস ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্যে নির্দেশ দেন। তখন তিনি নিজ মাতৃভূমি ছেড়ে মাত্র ২৭ বছর বয়সে আফ্রিকার উত্তরে চলে যান।[২৭৫]

উত্তর আফ্রিকায় যাওয়ার পরে সেখানে জাওহার আসসিকিলীর সাথে তাঁর যোগাযোগ হয়। তিনি তাঁর প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। এরপর সেখানে তিনি আরো বেশ কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাথে পরিচিত হন এবং তাদের নিয়ে প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করে বিনিময়ে উপঢৌকন লাভ করেন। পরিশেষে আল মুঈয লি দীনিল্লাহ আল ফাতেমীর কাছে তাঁর ব্যাপারে খবর পৌঁছায়। তিনি তাঁর সম্পর্কে জানার পর তাঁকে ডেকে পাঠান।কবি তখন আল মুঈযের দরবারে গমন করেন এবং সেখানেই অবস্থান করে তাঁদের দরবারী কবিতে পরিণত হন। এখানেই ৩৬২ হিজরীতে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৪২ মতান্তরে ৪৬ বছর।[২৭৬]

কাব্য-প্রতিভাঃ

ইবনু হানী ছিলেন আনদালুসের অন্যতম একজন প্রতিশযশা কবি। তিনি মুতানাব্বীর কবিতা ও ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত হন এবং এই প্রভাবকে নিজের কাব্য-চর্চায় কাজে লাগান। এর সাথে তিনি তাঁর নিজস্ব

[২৭৩] ড. আহমদ হাইকাল, *আল আদাবুল আনদালুসী মিনাল ফাতহি ইলা সুকুতিল খিলাফাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৩
[২৭৪] বুতরুস বুসতানী, *উদাবাউল আরাব ফিল আনদালুস ওয়া 'আসরিল ইনবিআস*, (লেবানন: দারু নাজীর আবুদ,)পৃ. ৮৪
[২৭৫] ড. আহমদ হাইকাল, *আল আদাবুল আনদালুসী মিনাল ফাতহি ইলা সুকুতিল খিলাফাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩
[২৭৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫

বৈশিষ্ট্যেও ও প্রতিফলন ঘটান। এছাড়াও তিনি বুহতুরী ও আবু তাম্মামের কবিতা ও ধরণ সম্পর্কে অবগত ছিলেন। এগুলো দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হন।

ইবনু হানী তাঁর কবিতায় অর্থের চেয়ে শব্দ চয়নের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতেন। এক্ষেত্রে তিনি জটিল জটিল শব্দের প্রয়োগ করতেন। একই সাথে তিনি বিভিন্ন প্রতিশব্দেরও ব্যবহার করতেন।

যেমন তাঁর এক কবিতায় বলেন:

للناس إجماعٌ على تفضيله، حتى استوى اللُّؤماءُ و الكُرَماءُ
و اللُّكَنُ و الفُصحاءُ و البُعداءُ و الـ قُرباءُ و الخُصَماءُ و الشُّهداءُ

অর্থ: মানুষের জন্যে তার মর্যাদার একত্রীকরণ
এমনকি সমান হয়েছে নিন্দুক ও সম্মানিত ,
তোতলা ও স্পষ্টভাষী, দূরবর্তী ও নিকটবর্তী,
ঝগড়াটে ও সাক্ষীগণ।[২৭৭]

অন্যান্য কবির মত তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুও ছিল বিভিন্ন ধরনের। তবে তাঁর কবিতার এক বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে প্রশংসামূলক কবিতা। তাঁকে শুরুর দিকে ফাতেমী আন্দোলনের কবি হিসেবে গণ্য করা হত। এরপর তিনি উত্তর আফ্রিকায় গমনের পরে আল মুঈয এর দরবারী কবিতে পরিণত হন। ফলস্বরূপ অন্যান্য দরবারী কবিদের ন্যায় রাজ-রাজরাদের তোষামোদে তিনি অনেক প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করেন। তবে তাঁর রচিত এ ধরণের কবিতার বেশির ভাগই ছিল আল মুঈযকে নিয়ে। এসব কবিতার ধরণ ও ভাব আব্বাসী কবিতার মত ছিল।

আল মুঈযকে নিয়ে তিনি অনেক প্রশংসাগাঁথা রচনা করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে هذا امين الله শিরোনামে একটি কবিতা। এর উল্লেখযোগ্য কিছু চরণ হলো:

ملك اذا نطقت علاه بمدحه **خرس الوفود و** افهم الخطباء
هو علة الدنيا و من خلقت له و لعلت ما كانت الاشياء
من صفو ماء الوحي و هو مجاجه من حوضه الينبوع و هو شفاء
من ايكة الفردوس حيث تفتقت ثمراتها و تفيا الافياء

[২৭৭] বুতরুস বুসতানী, *উদাবাউল আরাব ফিল আনদালুস ওয়া 'আসরিল ইনবিআস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

অর্থ: শাসক, যখন (তাঁর ব্যাপারে) বলা হয়েছে প্রশংসা দ্বারা উঁচুতে তোলা হয়েছে
প্রতিনিধি দল নির্বাক হয়ে গেছে এবং বক্তারা বুঝে গিয়েছে।
তিনি দুনিয়ার হেতু, আর তাঁর জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে
এবং সম্ভাব্য করা হয়েছে সকল বিষয়।
ঐশী পানির স্বচ্ছতা হতে যা তার লালা
আর তার ঝর্ণার জলাধার হলো আরোগ্য।
ফিরদাউসের তৃণভূমি হতে, যাতে ফেটে গেছে
তার ফলগুলো, এবং ভারে ঝুঁকে পড়েছে। [২৭৮]

এছাড়াও তিনি মুঈযের প্রশংসায় আরো অনেক কবিতা রচনা করেন। তিনি আরো অন্য গণ্যমান্য ব্যক্তির জন্যেও প্রশংসাগাঁথা রচনা করেন। তবে তা কোনভাবেই আল-মুঈযের প্রশংসার কাছাকাছি পৌঁছতে পারেনি।তিনি তাঁদের বীরত্বগাঁথা, গুণাবলী ইত্যাদির প্রশংসা করে কবিতা রচনা করতেন। যেমন তিনি ইবরাহীম ইবন জা'ফর, ইয়াহইয়া ইবন আলী, আবুল ফারজ আশশায়বানী প্রমুখের প্রশংসায় বলেন:

هم اماتوا حاتما في طيئ ميتة الدهر و كعبا في اياد
و هم كانوا الحيا قبل الحيا و عهاد المزن قبل العهاد

অর্থ: তাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন ত্বাই এর হাতেম হয়ে
যুগের মরণ ও শক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে।
তাঁরা জীবিতের পূর্বেও জীবিত ছিলেন
এবং বৃষ্টির পূর্বেও মেঘের বৃষ্টি স্বরূপ ছিলেন। [২৭৯]

শোকগাঁথা:

অন্যান্য কবির ন্যায় ইবনু হানীর কাব্য সম্ভারেরও এক বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে শোকগাঁথা। এ বিষয়ে তিনি দুটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন যা তাঁর দিওয়ানে পাওয়া যায়।তার একটি ইবরাহীম ইবন জা'ফর ইবন আলীর পুত্রকে নিয়ে আর অন্যটি জা'ফর ও ইয়াহইয়া ইবন আলীর মাকে নিয়ে রচিত। প্রথম কবিতাটিতে তিনি ব্যক্ত করেছেন:

مات من لو عاش في سربالـه غلب النور عليه فانفد
سيد قوبل فيه معشر ليس في ابنائهم من لم يسد

[২৭৮] *দিওয়ানু ইবন হানী*, পৃ. ১২
[২৭৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

অর্থ: যে মারা গেছে সে যদি তার আচ্ছাদনে জীবিত থাকত
সে আলোর উপরে বিজয়ী হত ও তা নি:শেষ হয়ে যেত।
তার ব্যাপারে জনসমাজে গৃহীত হয়েছে
সে ঐ সব ছেলের মত নয় যারা উপযোগী নয়।[২৮০]

২য় টিতে বলেন:

صدق الفناء و كذب العمر و جل العظاتو بالغ النذر
انا وفي آمل انفسنا طول وفي اعمارنا قصر
لنرى باعيننا مصارعنا لو كانت الالباب تعتبر

অর্থ: মৃত্যু সত্য এবং জীবনকাল মিথ্যা
শিক্ষা বড় হয়েছে এবং প্রতিজ্ঞা উপনীত হয়েছে।
আমি ও আমাদের ব্যাপরে আশা দীর্ঘ
অথচ আমাদের জীবনকাল সংক্ষিপ্ত।
আমরা আমাদের চক্ষু দিয়ে আমাদের ধ্বংস দেখছি
যদি প্রজ্ঞা থেকে উপদেশ নেয়া হতো।[২৮১]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইবনু যায়দুন

[২৮০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১
[২৮১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬

ইবন যায়দুন আনদালুসের অন্যতম প্রখ্যাত কবি ছিলেন। তাঁর পুরো নাম আবুল ওয়ালিদ আহমদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ ইবন গালিব ইবন যায়দুন আল মাখযুমী আল আনদালুসী। তিনি হিশাম ইবনুল হাকাম ইবন আব্দুর রহমান আন নাসিরের আমলে ১০০৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহন করেন। সেসময় যদিও হিশাম ক্ষমতায় ছিলেন তারপরও শাসনকার্য মূলত ন্যাস্ত ছিল মুজাফফর ইবন হাজিব মুহাম্মদ ইবন আবী আমের আল মানসুরের উপর।[২৮২]

তিনি তাঁর পিতা এবং অন্যান্য জ্ঞানী - গুণী ব্যক্তির কাছে জ্ঞান চর্চা শুরু করেন। তিনি অসংখ্য কবিতার পঙক্তি, প্রবাদ-প্রবচন, গল্প, ঘটনা ইত্যাদি মুখস্ত করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি নিজেও কবিতা চর্চা শুরু করেন। ২০ বছর বয়সের মধ্যেই তিনি কবিতা রচনায় সুখ্যাতি অর্জন করেন।

একসময় তিনি তাওয়ায়েফ শাসক ইবন জহুরের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। তিনি তাঁকে দরবারী লেখক হিসেবে নিয়োগ দেন। এরপর তিনি ক্রমান্বয়ে উযীরের পদে আসীন হন।[২৮৩]

এক সময়ে ইবন যায়দুন ওয়াল্লাদা বিনতুল মুসতাকফীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তিনি ছিলেন খলিফা-কন্যা এবং তৎকালীন সময়ের প্রসিদ্ধ একজন মহিলা কবি। ৫ম আব্দুর রহমানের মৃত্যুর পরে তাঁর পিতা খেলাফতে আসীন হন।[২৮৪]

ওয়াল্লাদাকে আবু আমের ইবন আব্দুস ও ভালবাসতেন। একবার ইবন আব্দুস ওয়াল্লাদাকে নিজের মনের অনুভুতি ও তাঁর নিজের সম্পর্কে জানাতে তাঁর কাছে এক মহিলাকে চিঠি দিয়ে প্রেরণ করেন। বিষয়টি ইবন যায়দুন জানতে পারেন। তখন তাঁর উত্তর পৌঁছানোর আগেই তিনি ওয়াল্লাদার ভাষায় ইবন আব্দুসের কাছে এক পত্র লিখেন। উক্ত চিঠিতে তিনি ইবনু আব্দুসের নিন্দা করেন। ইবনু আব্দুস এটা বুঝতে পারেন এবং প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে আবুল হাজম ইবন জহুরের শরনাপন্ন হন। এ ব্যাপারে ওয়াজিদী গোত্রের কিছু লোকও তাঁকে সহায়তা করে। তারা আবুল হাজমের কছে তাঁর ব্যাপারে খিয়ানতসহ বেশ কিছু ব্যাপারে মিথ্যা অভিযোগ পেশ করলে তিনি রাগান্বিত হন এবং ইবন যায়দুনকে জেলে প্রেরণ করেন। তিনি জেল থেকে বের হওয়ার জন্যে বহু রকমের চেষ্টা করেন। প্রথমে আবুল হাজমের মন গলাতে তাঁর প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। কিন্তু এতে তিনি ব্যর্থ হন। এরপর তিনি তাঁর পুত্র আবুল ওয়ালিদের শরনাপন্ন হন এবং তাঁর কাছে সুপারিশ চাওয়ার চেষ্টা করেন। তিনি তাঁর জন্যে তাঁর পিতার কাছে জেলমুক্তির জন্যে

[২৮২] বুতরুস আল বুসতানী, *উদাবাউল আরাব ফিল আনদালুস ও আসরিল ইনবিআস*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৪
[২৮৩] ড. মু. আব্দুল মুনইম খাফাজী, *আল আদাবুল আনদালুসী আত তাতাউর ওয়াত তাজদীদ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৭০
[২৮৪] বুতরুস আল বুসতানী, *উদাবাউল আরাব ফিল আনদালুস ও আসরিল ইনবিআস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

সুপারিশ করেন। কিন্তু তা কোন কাজে লাগেনি। আবুল হাজম মারা গেলে যখন আবুল ওয়ালিদ ক্ষমতায় আসেন তখন ইবন যায়দুন মুক্তি লাভ করেন।[২৮৫]

কাব্যপ্রতিভাঃ

ইবনু যায়দুনের অধিকাংশ কবিতাই ছিল প্রণয়মূলক, প্রশংসা, শোকগাঁথা ও অভিযোগমূলক। তবে তাঁর প্রসিদ্ধ ও সুন্দর কবিতাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ওয়াল্লাদাকে নিয়ে রচিত ও জেলে বসে ও বের হয়ে রচিত কর্ডোভা সম্পর্কিত বেশ কিছু কবিতা। এসমস্ত কবিতায় তাঁর কষ্ট-ক্লেশ ইত্যাদির বর্ণনা পাওয়া যায়। তাঁর কবিতাগুলো ছিল নিজ জীবন বা পারিপার্শিকতা সংশ্লিষ্ট। তিনি কবিতা রচনার ক্ষেত্রে কখনো কোন প্রচলিত পন্থা অনুসরণ করেননি। নিজের জীবন সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকেই তিনি কখনো প্রশংসা, কখনো প্রণয়, কখনো আবার অভিযোগ আকারে কবিতায় বিভিন্নভাবে রূপায়ন করেছেন।

ইবন যায়দুনের প্রণয়মূলক কবিতাগুলো ছিল তাঁর প্রেমিকা ওয়াল্লাদাকে নিয়ে রচিত। তিনি প্রণয় কবিতা রচনার ক্ষেত্রে প্রাচীনত্বকে অনুসরণ করেছেন। প্রাচীনপন্থী কবিদের বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁরা প্রণয় কবিতা বাস্তুভিটার বর্ণনা দিয়ে শুরু করতেন। এবং সেখানে প্রশংসামূলক বর্ণনাও থাকত। ইবন যায়দুন ও একই পদ্ধতি অনুসরণ করেন।[২৮৬]

ইবন যায়দুনের কাব্য সংকলন তথা দিওয়ানে কবিতার সব ধরণের বিষয় যেমন প্রশংসা, শোকগাঁথা, প্রণয়, বর্ণনা, অভিযোগ, তুষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে রচিত কবিতাই স্থান পেয়েছে। তবে প্রণয়মূলক কবিতাই সবচেয়ে বেশি অংশ জুড়ে রয়েছে।এ ধরণের কবিতাগুলো তাঁর দিওয়ানে বিভিন্ন নামে সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ একটি হলো نونية ।[২৮৭]

প্রশংসা ও শোকগাঁথাঃ

অন্যান্য কবিদের মত ইবন যায়দুন ও এই দুই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। অন্যদের ন্যায় তিনিও শাসকশ্রেণীর প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। তাঁদের মধ্যে হাজম ইবন জহুর, তাঁর পুত্র আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ, মু'তাদিদ ইবনুল আব্বাদ ও তাঁর পুত্র মু'তামাদ প্রমুখের প্রশংসায় তিনি সবচেয়ে বেশি কবিতা রচনা করেন। এছাড়াও তাওয়ায়েফ গোত্রের শাসক, আমীর- ওমরাহদের মধ্যে যাদের সাথে তাঁর ওঠা-বসা ছিল তিনি তাঁদের প্রশংসায়ও কবিতা রচনা করেন।

---

[২৮৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

[২৮৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

[২৮৭] ড. মু. আব্দুল মুনইম খাফাজী, *আল আদাবুল আনদালুসী আত তাতাউর ওয়াত তাজদীদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৫

শোকগাঁথা রচনার ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করেন। যেমন আবুল হাজম ইবন জহুর, আল-মু'তাদাদ ও তাঁদের পরিবার- পরিজনকে নিয়ে তিনি শোকগাঁথা রচনা করেন।

আবুল হাজমকে নিয়ে রচিত তাঁর শোকগাঁথায় পাওয়া যায়:

ابا الحزم قد جابت عليك من الأسى قلوب مناها الصبر **لوساعد الصبر**
دع الدهر يفجع بالذخائر اهله فما لنفيس مذ طواك الردى **قدر**

অর্থ: আবুল হাজম, আপনার ব্যাপারে কষ্টকে আলাদা করা হয়েছে
অন্তরসমূহ ধৈর্যকে নিষেধ করেছে, যদি ধৈর্য সাহায্য করত।
যুগ আহবান করেছে তার বাসিন্দাদের সম্পদের মাধ্যমে কষ্ট দিতে
সব ব্যক্তির জন্যেই মৃত্যু অতিক্রম করাই ভাগ্য।[২৮৮]

প্রশংসামূলক কবিতা রচনার ক্ষেত্রে ইবন যায়দুন প্রাচীনত্বকে অনুসরণ করেন। এ বিষয়ে তার প্রাচীনত্ব অনুসরণ এত বেশি পরিমাণে ছিল যে তা তাঁর প্রণয়কাব্যের প্রাচীনত্বকেও ছাড়িয়ে গেছে।

কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থাতেও ইবন যায়দুন আবুল হাজমের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। এখানে তিনি কিছু অংশে নিজের অবস্থার বর্ণনা দেন এভাবে:

من يسأل الناسَ عن حالي فشاهدُها مَحْضُ العِيَان الذي يُغني عن الخبَر
لم تَطوِ بُردَ شبابي كَبرَةٌ، و أرى برْقَ المشيبِ اعتلى في عارض الشَّعَر

অর্থ: যারা মানুষকে আমার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তার সাক্ষী হলো
খাঁটি চোখসমূহ যা অভিজ্ঞতার ব্যাপারে অমুখাপেক্ষী।
আমার তারুণ্যের চাদরকে বার্ধক্য ভাঁজ করেনি
আর আমি কেশের অগ্রভাগে শুভ্রতার ঔজ্জ্বল্য দেখি। [২৮৯]

ইবন যায়দুন যাদেরকে নিয়ে প্রশংসাগাঁথা রচনা করেন তাঁদের মধ্যে মু'তামাদ ইবনু আব্বাদ অন্যতম। তিনি নিজেও একজন কবি ও সাহিত্যপ্রেমী ছিলেন। ফলে ইবন যায়দুন তাঁকে অন্যরকমের ব্যক্তিত্ব ও বন্ধুভাবাপন্ন হিসেবে পান। এতে তাঁকে নিয়ে রচিত প্রশংসাগাঁথা অন্যরূপে প্রকাশ পায়। এমনকি তাঁদের

[২৮৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৫
[২৮৯] বুতরুস আল বুসতানী, *উদাবাউল আরাব ফিল আনদালুস ও আসরিল ইনবিআস*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৪

দু'জনের মধ্যে কবিতা চর্চার প্রতিযোগিতাও লক্ষ্য করা যায়। যেমন একবার মু'তামাদ ইবন যায়দুনকে লেখেন:

أيها المُنحط عني مجلسا و له في القلب أعلى مجلس
بفؤادي لك حب يقتضي أن تُرى تُحملُ فوق الأرْؤس

অর্থ: ওহে আসরে আমার থেকে নিচু ব্যক্তি,
আর তার অন্তরে উঁচু আসর বিদ্যমান।
আমার অন্তরে তোমার জন্যে ভালবাসা বিদ্যমান,
তুমি দেখবে তা শীর্ষে বহন করে নিয়ে যাবে।

তখন তিনি উত্তরে লেখেন:

يا نَدى يُمنى ابي القاسم غِمْ، يا سنا شمس المُحيّا أشمِس
ا بهجَ الخُلُق العَذبِ ابتَسِمْ، يا مَهيجَ الانفِ الصعبِ اعبِس

অর্থ:হে মেঘের সিক্ততা, আবুল কাসেমের জন্যে বর্ষিত হও,
হে উদিত সূর্যের ঔজ্জ্বল্য, কিরণ ছড়াও,
হে মিষ্ট সৃষ্টির হাসি, মুচকি হাসো,
ওহে দুশ্চিন্তাার অস্থিরতা, মলিন হও।[২৯০]

কাব্য-শৈলী:

ইবন যায়দুনের কবিতাগুলোতে আকর্ষণীয় মাধুর্য ও পেলব গাঁথুনীর ছাপ পাওয়া যায়। অর্থগত দিক থেকেও প্রাঞ্জলতার ছাপ বিদ্যমান ও সহজে বোধগম্য। তিনি যা রচনা করেছেন তাতে কবি- মনের গভীর অনুভূতিই ফুটে উঠেছে এবং এ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। আনদালুসীয় অন্যান্য কবির ন্যায় তাঁর কল্পনায় ও ভাবে আনদালুসীয় প্রকৃতির মাধুর্যই চিত্রিত হয়েছে।[২৯১]

ইবন যায়দুনের কাব্য চর্চায় বুহতুরীর ভাবধারার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এজন্য তাঁকে পশ্চিমের বুহতুরী নামে অভিহিত করা হয়।[২৯২]

[২৯০] প্রাগুক্ত, পৃ.১৪০
[২৯১] ড. মু. আব্দুল মুনইম খাফাজী, আল *আদাবুল আনদালুসী আত তাতাউর ওয়াত তাজদীদ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৭২
[২৯২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭২

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মু'তামাদ ইবনু 'আব্বাদ

মু'তামাদ ইবনু আব্বাদ একাধারে একজন কবি ও শাসক ছিলেন। তাঁর পুরো নাম মু'তামাদ আলাল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল মু'তাদিদ ইবনু আব্বাদ। তিনি ১০৩৯ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আল মু'তাদিদ বিল্লাহর মৃত্যুর পরে তিনি সেভিলের ক্ষমতায় আসীন হন।

মু'তামাদ ছোটবেলা থেকেই প্রাচুর্য ও শান- শওকতের মধ্যে বড় হন। পিতা মু'তাদিদ কবি ছিলেন, ফলে তিনি সাহিত্যের পরিবেশে বেড়ে ওঠেন এবং এর প্রভাব তাঁর উপরে পড়ে। পিতার তত্ত্বাবধায়নে লালিত পালিত হওয়ায় তিনিও ছোট বেলা থেকে কবিতা চর্চা শুরু করেন।
তিনি নিজে কবিতা চর্চা করতেন। একইসাথে তাঁর দরবারে কবিদের আসর বসত। সেখানে তিনি তাঁদের কাছে কবিতা শুনতেন ও তাঁদের পুরস্কৃত করতেন। তিনিও তাঁদেরকে কবিতা রচনা করে শুনাতেন।

মু'তামাদ ইবনু আব্বাদ রাজপরিবারের হওয়ায় তাঁকে কখনো কোন দু:খ- কষ্ট স্পর্শ করতে পারেনি। ফলে তাঁর কবিতাতে তার কোন প্রভাব পড়েনি। তাঁর কাব্য চর্চা মূলত ছিল প্রকৃতির বর্ণনা, মদ, খেল-তামাশা এসব বিষয়-কেন্দ্রিক।

যেমনটি তাঁর এক কবিতায় পাওয়া যায়:

و لقد شربت الراح يسطع نورُها و الليلُ قد مدّ الظلامَ رداء
حتى تبدى البدر في جوزائه مسلكا تناهى بهجة و بهاء

অর্থ: আর আমি মদ পান করেছি, তার আলো বিচ্ছুরিত হয়েছে,
আর রাত তার অন্ধকারের চাদর দীর্ঘায়িত করেছে।
এমনকি তার চক্রের পথে পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হয়েছে,
ঔজ্জ্বল্য ও দীপ্তি পরিপূর্ণ হয়েছে।[২৯৩]

তিনি রাজপ্রাসাদের প্রাচুর্যে লালিত পালিত হওয়ায় তাঁর বেশির ভাগ কবিতাই ছিল দু:খ- কষ্ট ও গভীর আবেগ- অনুভূতি শূন্য। খুব কম সংখ্যক কবিতাতে তাঁর হৃদয়ের গভীর অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে।

[২৯৩] বুতরুস আল বুসতানী, *উদাবাউল আরাব ফিল আনদালুস ও আসরিল ইনবিআস*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৯

যেমন এক কবিতায় পাওয়া যায়:

أيا نفس لا تجزعي ، و اصبري و إلا فإن الهوى مُتلِف
حبيب **جفاكِ، وقلب عصاكِ**، وَلاحٍ لَحَاق و لا يُنصِف
شُجُونٌ مَنَعنَ الجُفونَ الكرى و عوضنها أدمُعا تَنزَفُ

অর্থ: হে অন্তর, উদ্বিগ্ন হয়ো না, ধৈর্যধারণ করো,
আর আকাঙ্খা তো খারাপ বস্তু।
বন্ধু তোমার শত্রু, আর হৃদয় তোমার অবাধ্য,
আর উদ্ভাসিত বস্তুও নাগালে উপনীত হয়নি।
দুশ্চিন্তা চোখের নিদ্রাকে বাধা দিয়েছে
আর অশ্রু নি:শেষিত হয়ে এর প্রতিদান দিয়েছে।[২৯৪]

আবার তাঁর বেশ কিছু কবিতায় প্রকৃতির বর্ণনাও পাওয়া যায়। যেমন:

مضى زمن و المُلكُ مُسْتأنِسٌ به، و أصبح منه اليومَ و هو نَفورُ
فيا ليتَ شعري هل أبيتنّ ليلةً، أمامي و خلفي روضة و غديرُ
بِمُنِيبة الزيتون ، مُورثةِ العُلى، يُغنِي حمام ، أو تدُنُّ طيورُ

অর্থ: যুগ অতিবাহিত হয়েছে, আর রাজত্বও তাতে ঘনিষ্ঠ হয়েছে
আর আজ থেকে যা প্রকাশ পেয়েছে তাও বিতৃষ্ণ।
হায় আমার কবিতা, তা কি রাত যাপন করেছে,
আমার সামনে ও পেছনে বাগান ও ছোট নদী,
জলপাইয়ের বাগান , উচ্চতার উত্তরাধিকারী,
পায়রার গান, অথবা পাখির গুনগুন করা।[২৯৫]

মু'তামাদ ইবনু আব্বাদ ছিলেন প্রশংসা গাঁথার কবি। তিনি কখনো কাউকে নিয়ে নিন্দামূলক কবিতা রচনা করতেন না। তাঁর সাথে মানুষের বিশেষ করে কবি- সাহিত্যিক ও সাহিত্যের সমঝদারদের সুসম্পর্ক বিরাজমান ছিল। তিনি তাঁর দরবারে কবি- সাহিত্যিকদের ডেকে আনতেন ও তাঁদের কবিতা শুনতেন। তিনি নিজে যা রচনা করতেন তাও তাঁদেরকে শুনাতেন।

[২৯৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০
[২৯৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

মু'তামাদ ইবনু আব্বাদ চার বছর কারারুদ্ধ থাকেন এবং সে অবস্থায় ১০৯৫ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে নিজের জন্যে শোকগাঁথা রচনা করেন ও সেই পঙক্তিগুলো তাঁর সমাধির দেয়ালে লিখতে অসিয়ত করে যান। কবিতাটির কিছু অংশ নিম্নরূপ:

قبر الغريب سقاك الرائح الغادي حقا ظفرت بأشلاء ابن عباد
بالحلم بالعلم بالنعمى إذا اتصلت بالخصيب إن أجدبوا بالري **للصادي**
بالطاعن الضارب الرامي إذا اقتتلوا بالموت أحمر بالضرغامة العادي
بالدهر في نقم بالبحر في نعم بالبدر في ظلم بالصدر في النادي
نعم هو الحق حاباني به قدر من السماء فوافاني لميعاد

অর্থ: আগন্তুকের কবর, তোমাকে প্রস্থানকারীকে পান করিয়েছে
সত্যই তুমি ইবন 'আব্বাদের দেহের উপরে বিজয়ী হয়েছ।
স্বপ্নের দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা, প্রাচুর্যের দ্বারা,
শিকারীর জন্যে যদি অনুর্বর হও তবে সেচের দ্বারা উর্বর হয়েছ,
প্রবীণ আঘাতকারী তীরন্দাযের দ্বারা, যখন লড়াই করেছে
মৃত্যুর সাথে, শত্রুর থাবায় রঞ্জিত হয়েছে।
প্রতিশোধে যুগের দ্বারা, প্রাচুর্যতায় সাগরের দ্বারা,
অন্ধকারে পূর্ণচন্দ্র দ্বারা, আহবানে হৃদয় দ্বারা।
হ্যাঁ, এটাই সত্যি, ভাগ্য এর দ্বারা আমার পক্ষপাতিত্ব করেছে,
আসমান থেকে, ফলে আমার জীবনকাল পূর্ণ হয়েছে।[২৯৬]

[২৯৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
ইবনু খাফাজাহ

তাঁর পুরো নাম আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনু খাফাজাহ আল আনদালুসী। শাকার নামক স্থানে তিনি ৪৫০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন সেই সময়কাল ছিল আনদালুসে সাহিত্য সাধনার চরম উৎকর্ষতার সময়। সে সময় রাজা- বাদশাহ ও আমীর - ওমরাহদের ঘরগুলো ছিল কবি- সাহিত্যিক, জ্ঞানী- গুণীদের অবাধে বিচরণের জায়গা।

ইবনু খাফাজাহ ছিলেন প্রকৃতির কবি। তিনি মানুষ ও প্রকৃতির রূপে বিভোর ছিলেন। ফলে তাঁর কবিতা গুলোয় বিভিন্ন উপমা ব্যবহার করে মানুষ ও প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বর্ণনা করেন। তাঁর কবিতাগুলো তাঁর নিজ জীবনের হাসি- আনন্দ ও প্রাচুর্যের প্রতিচ্ছবি ছিল।[২৯৭] তিনি অন্যান্য কবির ন্যায় বিভিন্ন বিষয় যেমন প্রশংসা, শোকগাঁথা, নিন্দা, অভিযোগ ইত্যাদি বিষয়েও কবিতা চর্চা করতেন, তবে প্রকৃতির বর্ণনাই তাঁর কবিতার ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর কবিতায় রূপক শব্দ ও উপমার প্রয়োগ করতেন। এ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর চারপাশে যা দেখতেন তা থেকেই উপাদান সংগ্রহ করতেন ও নিজের কল্পনার মিশ্রণ ঘটাতেন। যেমন এক কবিতায় বলেন:

و قد ضحِك الصباح بمجتلاه وراء الليل عن ثغر شنيب
أشيم به سنا برق يمان يحفزني إلى المرعى الخصيب

অর্থ: ভোর হেসেছে তার দিকে তাকিয়ে
রাতের আড়ালে, দাঁতের ফোকর দিয়ে,
এর দ্বারা দাঁত প্রকাশ পেয়েছে, জাজ্বল্যমান হয়ে,
আমাকে খোঁচা দিচ্ছে উর্বর তৃণভূমির দিকে।[২৯৮]

তাঁর অধিকাংশ বর্ণনামূলক কবিতায় রাতের অন্ধকারাচ্ছন্নতা, ভোরের শুভ্রতা, ফল-ফুল, গাছ-পালা, পানি, মাটি ইত্যাদির বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি এসব বিষয়কে তাঁর আবেগ ও কল্পনার মিশেলে কবিতায় অতি সূক্ষ্মভাবে উপস্থাপন করেছেন।

---

[২৯৭] ড. মু. আব্দুল মুনইম খাফাজী, *আল আদাবুল আনদালুসী আত তাতাউর ওয়াত তাজদীদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৪
[২৯৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৫

ইবন খাফাজাহ তাঁর সব ধরণের কবিতাতেই বর্ণনা নিয়ে আসতেন। এমনকি শোকগাঁথাতেও এমনটি দেখতে পাওয়া যায়:

في كل نادٍ منك روض ثناء و بكل خد فيك جدول ماء
و لكل شخص هزة الغصن الندى غب البكاء ورنة **المكاء**

অর্থ তোমার প্রত্যেক মজলিসেই রয়েছে প্রশংসার বাগান,
আর তোমার জন্যে প্রতি কপোলেই রয়েছে পানির ধারা,
প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যেই রয়েছে সিক্ত ডালপালার উচ্ছাস,
ক্রন্দনের পরিণতি ও শিষধ্বনির আহাজারি।[২৯৯]

তাঁর কবিতায় দেশপ্রেমের নমুনাও লক্ষনীয়। যেমন তাঁর এক কবিতায় পাওয়া যায়:

يا اهل اندلس لله دركم ماء و ظل و انهار و اشجار
ما جنة الخلد الا في دياركم و لو تخيرت هذا كنت اختار
لا تخشوا بعد ذا ان تدخلوا سقرا فليس يدخل بعد الجنة النار

অর্থ: হে আনদালুস বাসী, আল্লাহর জন্যে তোমাদের বয়ে যাচ্ছে
পানি, ছায়া, নদ-নদী ও গাছ- পালা,
তোমাদের আবাসেই তো জান্নাতুল খুলদ রয়েছে
যদি আমি নির্বাচক হতাম তবে এটাই তো বাছাই করতাম ।
সাক্বারে প্রবেশ করবে এটা ভেবে ভয় পেয়ো না,
জান্নাতের পরে কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করেনা।[৩০০]

অন্যান্য আনদালুসীয় কবিদের মত তিনিও আমীর- ওমরাহদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। যেমন উযির আল হাসান ইবন রহীমের প্রশংসায় বলেন:

و صرخت: يا لبني رحيم صرخة فالتقت الانجاد حولي عسكرا
من كل طلق الوجه شاه جواده زهوا بعزة ربه فتبخترا
طلق المحيا واليدين كأنه قمر تطلع في غمام امطرا
ليس الرداء من الثناء مطرزا فوق القميص من الحياة مصفرا

[২৯৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৬
[৩০০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১২

অর্থ:আমি চিৎকার করে বললাম: হে রহীমের পুত্র,
আমি সাহায্যের সাক্ষাত পেয়েছি, আমার চারপাশে সৈন্য
প্রত্যেক চেহারার প্রফুল্লতায় তার দানশীলতার রাজত্ব,
তার প্রভুর সম্মানে সে আলোকিত হয়েছে, ফলে গর্ব করেছে।
চেহারা ও দু'হাত উদ্ভাসিত হয়েছে, যেন তা
বৃষ্টিমুখর মেঘের মাঝে উদীত সূর্য।
প্রশংসার চাদর নকশাদার নয়,
জীবনের জামার উপরে তা হাস্যোজ্জ্বল।[৩০১]

বৈরাগ্যবাদ ও আধ্যাত্মিকতামূলক কবিতার ক্ষেত্রেও ইবন খাফাজাহর রচনা দেখতে পাওয়া যায়। যেমন তাঁর এক কবিতায় এসেছে:

ألا قصر كل بقاء ذهب و عمران كل حياة خراب
و لا خطة غير احدى اثنتين فإما نعيم وو إما عذاب
فرحماك يا من عليه الحساب وزلفاك يا من إليه المآب

অর্থ: প্রত্যেক টিকে থাকা প্রাসাদই চলে যাবে
আর প্রত্যেক জীবনকালই শেষ হয়ে যাবে।
একমাত্র এক ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় পরিকল্পনা থাকবেনা
তা নিয়ামত হোক আর শাস্তি হোক।
ফলে আপনার রহমত তার, যার পক্ষে হিসাব
আর আপনার নৈকট্যও, যার দিকে প্রত্যাবর্তন। [৩০২]

জাহেলী যুগ থেকে শুরু করে আরবী সাহিত্যের প্রতিটি যুগে প্রতিটি কবিরই অন্যতম এক মুখ্য বিষয়বস্তু ছিল প্রণয়মূলক কবিতা। কবি ইবনু খাফাজাহ ও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। এ বিষয়ে তিনি অনেক কবিতা রচনা করেন। তাঁর এক কবিতায় পাওয়া যায়:

و لرب ليل قد صدعـ ـت ظلامه بجبين بدرك
و لهوت فيه بدرة مكنونة في حق خدرك

[৩০১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৩
[৩০২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৩

অর্থ: আর রাতের প্রভুর শপথ, তার অন্ধকার
বিদীর্ণ হয়েছে তোমার পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতি দ্বারা
আর তাতে বিনোদিত হয়েছে পূর্ণ চন্দ্র,
তোমার অন্ত:পুরে আচ্ছাদিত থেকে।[৩০৩]

ইবন খাফাজাহ তাঁর কবিতায় একই সাথে বিভিন্ন ধরণের কাব্যিক শৈলীর রূপায়ন করেছেন। তাঁর কবিতায় বর্ণনা, কল্পনা, রূপকার্থের প্রয়োগ ইত্যাদির সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। শব্দ ও ভাষার দিক থেকে তিনি সব সময় বোধগম্য, সহজ ও প্রাঞ্জল শব্দ ব্যবহার করতেন।[৩০৪]

গদ্যে অবদান:

ইবন খাফাজাহ শুধু কবিই ছিলেন না, আনদালুসীয় আরবী গদ্যেও তাঁর অবদান লক্ষণীয়। গদ্য সাহিত্যে তাঁর বেশ কিছু লেখনী দেখতে পাওয়া যায়। এসব রচনার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর কবিতার ন্যায় কল্পনা ও বর্ণনাকে অনুসরণ করেছেন। আর শৈলীর ক্ষেত্রে ইবনুল আমীদ ও আল হামাযানীর গদ্য শৈলীর সাথে মিল পাওয়া যায়।[৩০৫]

গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বা বড় কোন রচনা পাওয়া যায় না। তবে তিনি প্রবন্ধাকারে কিছু গদ্য রচনা করেন যাতে তাঁর শৈল্পিক বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। এগুলোকে তাঁর পদ্যের গদ্যরূপও বলা যেতে পারে। যেমনটি তাঁর এক লেখনীতে পাওয়া যায়:

ذهبت في لمة من الأخوان، نستبق لى الراحة ركضا، و ظوى للفرج أرضا، فلا ندفع إلا الى غدير نمير.

অর্থ: আমি গিয়েছি ভ্রাতৃবৃন্দের সমাবেশে, বিশ্রামের জন্যে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছি, মাটি বিদীর্ণ করতে উপোস থেকেছি, স্বচ্ছ পুকুর ছাড়া আর কিছু প্রদান করতে পারিনি। [৩০৬]

[৩০৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৮
[৩০৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৯
[৩০৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২০
[৩০৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২০

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

লিসান উদ্দীন ইবনুল খাতীব

আনদালুসের একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব লিসানুদ্দীন ইবনুল খাতীব। তাঁর পুরো নাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন সাঈদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবনুল খাতীব আস সালমানী। তাঁকে লিসানুদ্দীন উপাধী দেয়া হয়।

তিনি ৭১৩ হিজরীতে গ্রানাডার পার্শ্ববর্তী শহর "লাওস" এ জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি গ্রানাডায় গমন করেন। তাঁর পিতা গ্রানাডার রাজদরবারে দরবারী লেখক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি পিতার কাছে চলে আসেন ও তাঁর তত্বাবধায়নে লালিত পালিত হন।[৩০৭] সেখানে তিনি অনেক বড় বড় পন্ডিত প্রবরের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন।

শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি শেষে পিতার পাশাপাশি তিনিও দরবারী দেওয়ানী লেখক হিসেবে নিয়োগ পান। বলা হয়ে থাকে, তিনি সুলতান আবুল হাজ্জাজ ইউসুফের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। এতে সুলতান মুগ্ধ হয়ে তাঁকে দেওয়ানী লেখক হিসেবে নিয়োগ দেন। পরবর্তীতে তাঁর উস্তাদ আবুল হাসান ইবনুল জাইয়াব মৃত্যুবরণ করলে গ্রানাডার সুলতান আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ তাঁর স্থানে লিসানুদ্দীন ইবনুল খাতীবকে প্রধান লেখক হিসেবে নিয়োগ দেন।[৩০৮]

৭৫৫ হিজরীতে সুলতান আবুল হাজ্জাজের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র আল গনী বিল্লাহ গ্রানাডার সুলতান হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। তিনি সিংহাসনে আসীন হওয়ার কিছুদিন পরে তাঁর সালতানাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়। এসময় সুলতান আল গনী সুলতান আবু আনান আল মারয়ানীর শরণাপন্ন হন। তখন ইবনুল খতীব সুলতানকে সঙ্গ দেন ও তাঁর পাশে থাকেন। এরপর যখন সুলতান ফিরে আসেন তখন তাঁকে "যুল ওযারাতাইন"(লেখনী ও তরবারী) উপাধি দেন।[৩০৯]

পরবর্তীতে গ্রানাডায় ইবনুল খাতীবের বেশ কিছু শত্রু তৈরী হয়। তিনি সেখানে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়ে ফেজ নগরীতে সুলতান আবু আনান আল মারয়ানীর কাছে চলে যান। এতেও শত্রুরা তাঁর পিছু ছাড়েনা। তারা সুলতান আলগনীর কাছে গিয়ে ইবনুল খতীবের নামে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ করে এবং তাঁর তাছাউফ বিষয়ক গ্রন্থ "রওদ্বাতুত তা'রীফ" এর কারণে তাঁকে যিনদীক অপবাদ দেয়। ফলে সুলতান তাঁর উপরে রাগান্বিত হন। এরই মধ্যে সুলতান আবু আনান মারা যান এবং তাঁর স্থানে আবু সালেম আল মারয়ানী স্থলাভিষিক্ত হন। তখন সুলতান আল গনী তাঁর সাহায্যে ইবনুল খতীবকে কারাদন্ড প্রদান করেন। কিন্তু

---

[৩০৭] ড. মুহাম্মদ রিদওয়ান আদ দাইয়া, *ফিল আদাবিল আনদালুসী*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৬৭

[৩০৮] প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৬৯

[৩০৯] শাওকী দ্বাইফ, *তারীখু আদাবিল আনদালুস* , প্রাগুক্ত, পৃ: ৪১৮

ইবনুল খতীবের শত্রুরা এতেও শান্ত হয়নি। তারা "রওদ্বাতুত তা'রীফ" গ্রন্থ থেকে বেশ কিছু লাইন সুলতানের সামনে পেশ করে। ফলে তাঁকে অন্য কারাগারে প্রেরণ করা হয় এবং পরবর্তীতে তাঁকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়।[৩১০]

তিনি একাধারে একজন রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক ও কবি ছিলেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য-সংস্কৃতির উপরে প্রচুর গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে:

১. আল ইহাত্বাতু ফী আখবারি গারনাতা। এটা ইতিহাস ও জীবনীমূলক গ্রন্থ। এবং এটা ৩ খন্ডে রচিত। এতে আনদালুসের ইতিহাস ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গ, তাঁদের জীবনী, কর্ম ইত্যাদি বর্নিত হয়েছে।
২. জাইশুত তাওশীহ। এটা ইবনুল খাতীবের মুওয়াশশাহাত সংকলন। উল্লেখ্য, তিনি আনদালুসীয় সাহিত্যের বিশেষ কাব্য মুওয়াশশাহাত রচনায়ও অবদান রাখেন।
৩. রওদাতুত তা'রীফ বিল হুব্বিশ শরীফ, এটা তাঁর রচিত তাছাউফ বিষয়ক গ্রন্থ।
৪. রকমুল হিলাল ফী নাজমিদ দুওয়াল, এটা ইতিহাসমূলক গ্রন্থ। এটা তিউনিসিয়ায় ১৩১৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।
৫. আল লামহাতুল বাদরিয়্যা ফিদ দাওলাতিন নাসরিয়্যা। এটাও ইবনুল খতীব কর্তৃক রচিত ইতিহাসমূলক গ্রন্থ। এতে ৭৬৫ হিজরী পর্যন্ত গ্রানাডার আমীরদের ইতিহাস বর্ণিত রয়েছে।
৬. আল-হিলাল আল মারকুমা, এতে তিনি প্রাচ্য, আনদালুস ও আফ্রিকার খলিফাদের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। এর কিছু অংশ ল্যাটিন ভাষাতে অনুদিত হয়েছে।
৭. আত তাজুল মাহাল্লী ফী মুসাজালাতিল ক্বদহিল মা'আল্লী। এতে গ্রানাডায় বনু আহমার রংশের গোড়াপত্ন থেকে শুরু করে তাঁর সময়কাল পর্যন্ত আনদালুসের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে।
৮. রাইহানাতুল কিতাব ওয়া নাজ'আতুল মুনতাব। এটা ইবনুল খতীবের পত্র সংকলন। [৩১১]

কবিতায় অবদান:

ইবনুল খতীবের কবিতায় দুটি দিক পাওয়া যায়। যেমন:

১. নিজস্ব আবেগ- অনুভূতির বহিপ্রকাশ যেমন প্রশংসা, প্রণয় কবিতা, প্রকৃতির বর্ণনা, আশা নিরাশা ইত্যাদি।

[৩১০] প্রাগুক্ত, পৃ: ৪১৯
[৩১১] জুরজী যাইদান, *তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যা*,(মিসর: দারুল হিলাল), ৩য় খন্ড, পৃ:২৩২

২. যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কবিতাকে ব্যবহার করা যেমন বিভিন্ন উৎসব, সমসাময়িক ঘটনা, বাস্তব বিষয় ইত্যাদি নিয়ে রচিত প্রশংসা বা বর্ণনামূলক কবিতা।

তাঁর প্রশংসামূলক কবিতার বেশির ভাগই ছিল সুলতানদের নিয়ে রচিত। তিনি আবুল হাজ্জাজ, আল-গনী ও আবু আনানের জন্যে অনেক কবিতা রচনা করেন। যেমন আবু আনানকে নিয়ে রচনা করেন:

خليفة الله ساعد القدر * عُلاك ما لاحَ الدجى قمرُ
و دافعت عنك كفّ قدرتهِ* ما ليس يسطيع دفعه البشر

অর্থ: আল্লাহর প্রতিনিধি, ভাগ্য সহায়তা করেছে
আপনার মহত্ত্বকে, চাঁদ অন্ধকারকে আলোকিত করেনি।
তার ক্ষমতার থাবা থেকে আপনাকে রক্ষা করেছে
তাকে প্রতিহত করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।[৩১২]

[৩১২] ড. মুহাম্মদ রিদওয়ান আদ দাইয়া, *ফিল আদাবিল আনদালুসী*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৭১

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আল-জারিয়া আল-আজফা

আল জারিয়া আল আজফা ছিলেন আনদালুসের প্রথম মহিলা কবি। তাঁর প্রকৃত নাম জানা যায় না। এমনকি তাঁর জন্ম ও মৃত্যুসাল সম্পর্কেও কিছুই জানা যায় না। তবে তিনি জারিয়া আল আজফা নামেই সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন এবং আব্দুর রহমান আদ দাখিলের সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি আনদালুসের বাসিন্দা ছিলেন না। তিনি ছিলেন প্রাচ্য থেকে খরিদকৃত একজন দাসী। তাঁর মনিব ছিলেন জাহরা গোত্রের মুসলিম ইবন ইয়াহইয়া।[৩১৩] তিনি হতদরিদ্র একজন ব্যক্তি ছিলেন।

জারিয়া আল আজফা তাঁর মনিবের অধীনে থেকেই কবিতা চর্চা শুরু করেন। হতদরিদ্র জীবনের কষ্ট-ক্লেশ থেকেই তাঁর কাব্যিক অনুভূতির জাগরণ যা তিনি তাঁর কবিতা চর্চার মাধ্যমে ব্যক্ত করতেন। কবিতা চর্চার পাশাপাশি তিনি গানও করতেন। ফলে তাঁর কবিতাগুলো ছিল গীতিকবিতাধর্মী। যেমন এক কবিতায় তিনি বলেন:

برح الخفاء فأيما بك تكتم و لسوف يظهرما تسر فيعلم
مما تضمن من عزيز قلبه يا قلب إنك **بالحنان لمغرم**

অর্থ: গোপনীয়তা সরে গিয়েছে, ফলে যাই গোপন করো না কেন,
অচিরেই যা গোপন করছ তা প্রকাশ পাবে, ফলে তা জানতে পারবে।
যা কিছু নিহিত আছে তার অন্তর মাঝে,
হে অন্তর, নিশ্চয় তুমি অনুরাগীর জন্যে সমবেদনা।[৩১৪]

জারিয়া আল আজফা সুললিত কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। মূলত তিনি তাঁর হত দরিদ্র মনিবকে আর্থিক সহায়তা দানের উদ্দেশ্যেই গীতি কবিতা রচনা ও গানের পন্থাকে বেছে নেন। এবং এ থেকেই তাঁর কবিতা রচনার প্রথম যাত্রা শুরু হয়।

তাঁর একেক কবিতা একেক সুরে ও স্টাইলে রচিত ছিল। যেমন আরেক ভিন্ন সুরে রচিত এক কবিতায় বলেন:

يا طول ليلي أعالج السقما **أدخل كل الأحبة الحرما**
ما كنت أخشى فراقكم أبدا فاليوم أمسى فراقكم عزما

[৩১৩] আল মাক্কাররী, *নাফহুত তীব*, ৩য় খন্ড, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৪১-১৪২
[৩১৪] ড.মুস্তফা আশ শাকআ', *আল আদাবুল আনদালুসী*, (দারুল ইলম লিল মালায়িন) পৃ. ১২০

অর্থ: হে রাতের দীর্ঘতা, রোগের প্রতিষেধক,
প্রত্যেক ভালবাসাকে নিরাপত্তায় প্রবেশ করাও।
আমি তোমাদের চিরস্থায়ী বিচ্ছেদে ভীত নই,
আজকের দিন গত হয়েছে তোমাদের দৃঢ় বিচ্ছেদে। [৩১৫]

জারিয়া আল আজফার কবিতাগুলো সহজ ও বোধগম্য ভাষায় রচিত ছিল। অর্থগত দিক থেকেও তিনি মাধুর্যপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করতেন। তিনি যে কবিতাই রচনা করতেন তাকে গানে রূপায়ন করতেন ও মানুষকে তা শুনাতেন। সেগুলোর ভাষা, ভাব ও মাধুর্যতা মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যেত।

জারিয়ার মনিব মুসলিম ইবন ইয়াহইয়ার বাড়িতে তাঁর কবিতা ও গানের আসর বসত। সেখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক-সমাগম হত। একবার আল-আরক্বামী ও আবুস সায়েব তাঁর আসরে আগমন করেন ও তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হন। তিনি তাঁদের সামনে সাহয হাযালীর একটি কবিতা গান আকারে পেশ করেন। তার কিছু অংশ নিম্নরূপ:

بيد الذي شغف الفؤاد بكم تفريج ما القى من الهم
هم من اجلك ليس يكشفه إلا مليك جائر الحكم

অর্থ: যার হাতে তোমাদের হৃদয়ের আকৃষ্টতা
যা কিছু পাঠানো হয়েছে তা লাঘব স্বরূপ,
এসব তোমার সীমার মধ্যে, তাকে উদঘাটন করেনি
নীতির বিধায়ক একমাত্র মালিক ছাড়া।[৩১৬]

তাঁর কাব্যপ্রতিভার সুনাম চারদিক ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি আব্দুর রহমান আদ দাখিলের কাছে তাঁর কাব্যপ্রতিভার সংবাদ পৌঁছায়। তিনি তাঁর কাছে লোক প্রেরণ করেন এবং তাঁকে খরিদ করেন এবং আনদালুসে নিয়ে আসেন। আব্দুর রহমান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে তিনি রাজদরবারেই বসবাস করেন এবং কবিতা রচনা করেন। তবে আনদালুসে আগমনের পর থেকে তাঁর কবিতার তেমন কিছু সংরক্ষিত হয়নি। ফলে সেগুলো খুঁজে পাওয়া যায় না।

আনদালুসের এই প্রথম মহিলা কবি জারিয়া আল আজফার মৃত্যুর সময়কাল সম্পর্কেও কিছু জানা যায় না। তবে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত সময়কাল রাজপ্রাসাদেই অতিবাহিত করেন।

---

[৩১৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০-১২১
[৩১৬] আল মাক্কাররী, *নাফহুত তীব*, প্রাগুক্ত, ৩য় খন্ড, পৃ: ১৪১

অষ্টম পরিচ্ছেদ

হাসানা আত-তামীমীয়া

হাসানা আত তামীমীয়া ছিলেন আনদালুসের দ্বিতীয় মহিলা কবি। তবে জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন প্রথম মহিলা কবি। তাঁর পুরো নাম হাসানা বিনত আবিল হুসাইন।তাঁর পিতা আবুল হুসাইন আনদালুসের একজন স্বনামধন্য কবি ছিলেন। কন্যা হাসানা জন্মগতভাবেই পিতার নিকট থেকে কাব্যপ্রতিভার অধিকারী হন।

হাসানার জীবনকাল ছিল হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষ দিক থেকে তৃতীয় শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত। এসময়ে তিনি কাব্যচর্চায় সুখ্যাতি অর্জন করেন। ছোটবেলা থেকে পিতার পরিচর্যায় বড় হওয়ায় তিনি সাহিত্য চর্চার সুযোগ লাভ করেন। তাঁর পিতা আবুল হুসাইন আনদালুসের আমীরদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করতেন। তিনি মৃত্যুবরণ করলে হাসানা এই প্রশংসামূলক কবিতা রচনা শুরু করেন। তিনি প্রথমে হাকাম ইবন হিশামের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। পরবর্তীতে হাকামের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের প্রশংসায় কবিতা লেখা শুরু করেন।

তিনি একবার খলিফা হাকামকে নিয়ে প্রশংসাগাঁথা রচনা করেন যাতে তাঁর নিজের দু:খ-কষ্ট সম্পর্কে অভিযোগ ও পেশ করেন। উক্ত কবিতার কিছু অংশ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

إني إليك أبا العاصي موجعة أبا الحسين, سقته الواكف القديم
قد كنت ارتع في نعماه, عاكفة فاليوم آوي إلى نعماك يا حكم
أنت الإمام الذي انقاد الأنام له و ملكته مقاليد النهى الأمم

অর্থ: হে আবুল ‘আসী, আমি আপনার দিকে ব্যথিত অবস্থায়
হে আবুল হুসাইন, পুরাতন অশ্রু তাকে পান করিয়েছে।
আমি তার প্রাচুর্যে বিচরণ করেছি, বাসিন্দা হিসেবে
ফলে আজ আপনার দয়ার মুখাপেক্ষী, হে হাকাম।
আপনি নেতা, সৃষ্টিজগত যার বশ্যতা স্বীকার করে,
আর জাতির বুদ্ধিমত্তার চাবিকাঠির ও শাসক যিনি।[৩১৭]

হাকাম তাঁর এ অভিযোগে সাড়া দেন এবং তাঁর এলাকার গভর্নরকে তাঁর ধন- সম্পদ ফিরিয়ে দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করতে আদেশ দেন।

[৩১৭] ড.মুস্তফা আশ শাকআ', *আল আদাবুল আনদালুসী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১-১২২

এরপর যখন হাকাম ইন্তেকাল করেন তখন এলবেরার সেই গভর্নও জাবের ইবন লাবীদ তাঁর কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করেন, হাসানার সাথে খারাপ ব্যবহার করেন ও তাঁর মর্যাদা আবার কমিয়ে দেন। তখন দ্বিতীয় আব্দুর রহমান আমীর হন। কবি তাঁর দরবাওে উপস্থিত হন এবং আগের মত করেই তাঁর কাছে অভিযোগ-অনুযোগ মিশ্রিত প্রশংসাগাঁথা রচনা করেন। তখন তিনি হাকামের পন্থা অবলম্বন করেই গভর্নরকে একই আদেশ প্রদান করেন এবং তাঁকে গভর্নরের পদ থেকে চ্যুত করেন। এবং সেই সাথে কবিকে উপঢৌকন প্রদান করেন।

হাসানা আব্দুর রহমানের কাছে যে প্রশংসাগাঁথা রচনা করেছিলেন তার কিছু অংশ নিম্নরূপ:

إلى ذي الندى و المجد سارت ركائبي على شحط تصلى بنار الهواجر
ليجبر صدعي إنه خير جابر و يمنعني من ذي الظلامة جابر
فإني و أيتامي بقبضة كفه كذي ريش اضحى في مخالب كلسر
جدير بذكري أن يقال مروعة لموت ابي العاصي الذي كان ناصري
سقاه الحيا، لو كان حيا لما اعتدى عليّ زمان باطش بطش قادر

অর্থ: দয়া ও সম্মানের অধিকারীর প্রতি,আমার বাহন দূরে চলেছে
ভর দুপুরের তাপের আগুন তাতে পৌঁছেছে।
আমার ভাঙ্গনে জোর করেছে, সে তো ভাল জবরদস্তিকারী,
আর আমাকে বিরত রাখবে অত্যাচারী জবরদস্তিকারী থেকে।
আমি ও আমার অনাথরা তার হাতের থাবায়,
ঐ সম্পদের মালিকের ন্যায়, ধ্বংসকারীর প্রতারণায় যে উৎসর্গ করেছে।
আমার কথা উল্লেখ্য যে চারণভূমির কথা বলতে,
আবুল 'আসীর মৃত্যুতে, যিনি আমার সাহায্যকারী ছিলেন।
তিনি জীবিতকে তৃপ্ত করেছেন, তিনি যদি জীবিত থাকতেন
তবে সময় আমার উপরে শক্তিশালী পাকড়াওকারী হয়ে ফিরে আসত না।[৩১৮]

হাসানা আত তামীমিয়া রাজদরবার থেকে ফিরে এসে আব্দুর রহমানের শানে আরেকটি প্রশংসাগাঁথা রচনা করে প্রেরণ করেন।

[৩১৮] আল মাক্কার্‌রী, *নাফহুত ত্বীব*, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৪৩৮

যার কিছু পঙক্তি নিম্নরূপ:

ابن الهشامين خير الناس مأثرة وخير منتجع يوما لرواد
ان هز يوم الوعنى أثناء صعدته روّى أنابيها من صرف فرصاد
قل للإمام أيا خير الورى نسبا مقابلا بين **اباء و أجداد**

অর্থ: হিশামের পুত্র, মানব শ্রেষ্ঠ ও পদচিহ্ন অনুসরণকারী,
এবং আজকের উত্তম আশ্রয়দাতা।
নিশ্চয় আজ উচ্ছসিত হয়েছে তার কাজের মাধ্যমে
তার বিচক্ষণতা বর্ণিত হয়েছে, তুঁত বিতারণের মাধ্যমে।
নেতার জন্যে বলো, হে উত্তম পথপ্রদর্শক,
পিতা ও দাদাদের মধ্যে বংশে, তুলনায় (উত্তম)।[৩১৯]

হাসানা আত তামীমীয়া প্রাচ্যের উমাওয়ী আরবী সাহিত্যের ভাবধারা কর্তৃক লালিত ছিলেন এবং এই মতাদর্শেরই অধিকারী ছিলেন। তিনি বিশুদ্ধ আরবী ভাষা ও উমাওয়ী কবিদের রীতিতে কবিতা রচনা করতেন। এছাড়াও তিনি তাঁর পূর্বসূরী জারিয়া আল আজফার পথ অনুসরণ করেন।

হাসানা আত তামীমিয়ার প্রতিটি কবিতাই ছিল উৎকৃষ্ট মানের ও প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত। তাঁর রচিত কবিতায় প্রশংসা ও অভিযোগই মূলত প্রাধান্য পেয়েছে। এবং তাঁর অধিকাংশ কবিতাই আমীর- ওমরাহদের নিয়ে রচিত।

এই প্রসিদ্ধ কবিরও মৃত্যু সম্পর্কে তেমন স্পষ্ট কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে বলা হয়ে থাকে, আব্দুর রহমানের দরবার থেকে ফিরে আসার পরে তিনি নিজ জন্মভূমি আলবিরেই সম্মান ও মর্যাদার সাথে বসবাস করেন এবং হিজরী ৩য় শতকের শুরুর দিকে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। তবে কেউ কেউ বলেন, তিনি ২৩০ হিজরীর দিকে মৃত্যুবরণ করেন।[৩২০]

[৩১৯] আল মাক্কাররী, *নাফহুত ত্বীব*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১৬৮
[৩২০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭-১৬৮/ ড.মুস্তফা আশ শাকআ', *আল আদাবুল আনদালুসী*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১২১-১২৫

Dhaka University Institutional Repository

নবম পরিচ্ছেদ

হাফসা বিনতু হামদুন আল-হেজারিয়া

আনদালুসের অন্যতম প্রখ্যাত আরেকজন মহিলা কবি ছিলেন হাফসা বিনতু হামদুন আল হেজারিয়া। তাঁর জন্মসাল সম্পর্কেও কিছু জানা যায় না। তবে তিনি হিজরী চতুর্থ শতকের একজন স্বনামধন্য কবি ছিলেন। প্রথম মহিলা কবি হিসেবে তিনি প্রণয়মূলক কবিতা রচনা করেন। এজন্য তাঁকে মহিলা কবিদের মধ্যে প্রণয়কবিতার প্রণেতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

তাঁর রচিত এক প্রণয় কবিতায় বলেন :

لي حبيب لا ينثني بعتاب وإذا ما تركته زاد تيها
قال لي : هل رأيت لي من شبيه ايضا و هل ترى لي شبيها

অর্থ: আমার প্রেমিকের জন্যে নিন্দা দ্বারা ঝুঁকে পড়া নয়,
আর যখন আমি তাকে ছেড়ে গিয়েছি তা বৃদ্ধি পেয়েছে।
সে আমাকে বলেছে: তুমি কি আমার জন্যে দেখতে পেয়েছ তার মত,
আরো এবং তুমিও আমার জন্যে তার মত দেখতে কি পাও। [৩২১]

হাফসা বিনতু হামদুন বিত্তশালী ও সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে ছিলেন। তাঁর অনেক দাস- দাসী ছিল। একবার তাদের আচার-আচরণ নিয়ে অভিযোগ করে তিনি কবিতা রচনা করেন:

يا رب إني من عبيدي علي جمر الغضا ما فيهم من نجيب
إما جهول أبله متعب أو فطن من كيده لا يجيب

অর্থ: হে প্রভু, আমার এক দাসী, আমার উপরে
ক্রোধের পাথর, তাতে কোন আভিজাত্য নেই।
অজ্ঞ, নির্বোধ, ক্লান্ত হোক
বা তার ফন্দিতে বিচক্ষণ হোক, তাও আবশ্যক নয়। [৩২২]

[৩২১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭
[৩২২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

প্রণয়মূলক কবিতা রচনার পাশাপাশি হাফসা প্রশংসামূলক কবিতা রচনাতেও অবদান রাখেন। অন্যান্য কবিদের মত তিনিও সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের জন্যে প্রশংসাগাঁথা রচনা করেন। তখন আনদালুসে ইবনু জামীল নামক এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। হাফসা তাঁকে নিয়ে রচিত এক প্রশংসাগাঁথায় বলেন:

رأى ابن جميل ان يرى الدهر مجملا فكل الورى قد عمهم سيب نعمته
له خلق كالخمر بعد امتزاجها و حسن فما أحلاه من حين خلقته

অর্থ: ইবন জামীল দেখেছেন যুগকে সুন্দর দেখতে
প্রত্যেক দর্শনীয় বস্তুই তার নিয়ামতের ব্যাপারে ব্যাপক হয়েছে।
তার জন্যে সৃষ্টি রয়েছে, মিশ্রিত মদের ন্যায়,
আর সৌন্দর্য, তাকে সৃষ্টির সময় থেকেই মুক্ত করা হয়েছে।[৩২৩]

হাফসার কবিতায় শাব্দিক গঠনগত ও অর্থগত প্রাচুর্যতা লক্ষ্য করা যায়। শব্দ, অর্থ ও ভাবার্থ নিবার্চনের ক্ষেত্রে তিনি সব সময় অন্যদের থেকে এগিয়ে ছিলেন। তিনি তাঁর সমসাময়িক মহিলা কবিদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাঁচের ছিলেন। সমসাময়িক মহিলা কবিদের মধ্যে তিনি একমাত্র এবং সর্বপ্রথম প্রণয়মূলক কবিতা রচনা করেন। এদিক থেকে তিনি আনদালুসীয় মহিলা কবিদের মধ্যে প্রণয় কবিতার প্রণেতা ছিলেন।

হাফসা বিনতু হামদুন যখন কবিতা রচনা করতেন স্বীয় মনের গভীর ভাবাবেগ দিয়ে তা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করতেন। ফলে তাঁর কবিতাগুলোতে গভীর মাধুর্যতার ছাপ ও উন্নত মানের শব্দ পরিলক্ষিত হয়।

এই স্বনামধন্য মহিলা কবির জন্মসালের মত তাঁর মৃত্যুসাল সম্পর্কেও কোন কিছু জানা যায় না।

[৩২৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭

দশম পরিচ্ছেদ
ওয়ালাদা বিনতু আল মুসতাকফী

ওয়াল্লাদাকে আনদালুসের প্রখ্যাত কবিদের একজন হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি শুধু মহিলা কবি হিসেবেই প্রসিদ্ধ ছিলেন না বরং সমস্ত কবির মধ্যেই প্রখ্যাত ছিলেন। তাঁকে আনদালুসের মহিলা কবিদের সম্রাজ্ঞী নামে আখ্যায়িত করা হয়। হিজরী পঞ্চম শতকের এই প্রসিদ্ধ কবি রাজপরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁর পিতা মুহাম্মদ আল মুসতাকফী ইবন আব্দুর রহমান ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান আন নাসির একাধারে একজন শাসক ও কবি ছিলেন।

ওয়াল্লাদা যখন বেড়ে ওঠেন তখন আনদালুসে রাজনৈতিকভাবে টানা-পোড়েনের সময় ছিল। তাঁর পিতা আল মুসতাকফী কিছু দূর্বলতার কারণে ১৮ মাসের বেশি ক্ষমতায় টিকতে পারেননি।[৩২৪] এরপর উমাইয়াদের থেকে শাসনক্ষমতা বনু জহুরের কাছে চলে যায় এবং বিভিন্ন দ্বন্দ্ব, কোন্দলের উৎপত্তি হতে থাকে। তিনি এসব দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে বেড়ে ওঠেন।

তাঁর সাহিত্যিক জীবনের কারণে তাঁর প্রাসাদে কবি- সাহিত্যিক, জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির আনাগোনা আরো বেড়ে যায়। তাঁর প্রাসাদে সাহিত্য চর্চার আসর বসত। সেখানে অনেক বড় বড় কবি- সাহিত্যিকের আগমন ঘটত। এসব আসরে ওয়াল্লাদা নিজে কবিতা রচনা করতেন। তাঁর কবিতায় অনেকেই মুগ্ধ হন। তাঁদের মধ্যে ইবন যায়দুন ও ইবন আব্দুস অন্যতম। তাঁরা উভয়েই ওয়াল্লঅদার প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রেমে পড়ে যান।

ইবন যায়দুন আনদালুসের একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। একই সাথে তিনি বনু জহুরের উযীর ছিলেন। একবার তাঁর বন্ধুরা তাঁকে ওয়াল্লাদার সাহিত্য- আসরে আমন্ত্রণ করেন। তিনি সেখানে গমন করেন ও ওয়াল্লাদার প্রতিভা, রূপে-গুণে মুগ্ধ হয়ে যান ও তাঁর প্রেমে পড়েন। অন্যদিকে ওয়াল্লাদাও তাঁর প্রতি মুগ্ধ হয়ে পড়েন।[৩২৫]

ওয়াল্লাদা ও ইবন যায়দুনের মধ্যে প্রণয়ের সম্পর্কগুলো গভীর হলে তাঁরা গোপনে উভয়েই একজন আরেকজনকে কবিতা লিখতেন। এর ফলে এ কবিতাগুলো থেকে তেমন কিছুই পাওয়া যায়না। তবে এ

[৩২৪] মুহাম্মদ হাসান ক্বাজ্জার, *মাহাত্তাতু আনদালুসিয়্যা*, (জেদ্দা: দারু সাউদিয়া লিন নাশর ওয়াত তাওযী', ১৯৮৫ খ্রি), পৃ:১১১
[৩২৫] প্রাগুক্ত, পৃ:১১৪

বিষয়ে বিচ্ছিন্ন কিছু কবিতা দেখতে পাওয়া যায়। যেমন ইবন যায়দুন ওয়াল্লাদাকে নিয়ে রচিত এক কবিতায় বলেন:

أصونك من لحظات الظنون و أعليك من خطرات الفكر
و أحذر من لحظات الرقيب و قد يستدام الهوى بالحجر

অর্থ: সন্দেপ্রবণের দৃষ্টি থেকে তোমাকে রক্ষা করেছি
তোমার উপরে আছে কি উদ্বেগের আশঙ্কা
আর আমি সতর্ক থেকেছি পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি থেকে
তারা পাথর (নিক্ষেপের) মাধ্যমে আগ্রহ অব্যাহত রেখেছে।[৩২৬]

ওয়াল্লাদাও ইবন যায়দুনের জন্যে কবিতা রচনা করেন। তিনি এতে বলেন:

ترقب إذا جن الظلام زيارتي فإني رأيت الليل أكتم للسرّ
و بي منك ما لو كان بالبدر ما بدأ و بالشمس لم تطلع و بالنجم لم يسر

অর্থ: তুমি পর্যবেক্ষণ করবে আমার ভ্রমণের, যখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়.
আমি তো রাতকে গোপন বিষয়ের গোপনীয়তা রক্ষাকারী হিসেবে দেখি।
তোমার পক্ষ থেকে আমার জন্যে যদি তা উদিত চন্দ্র হয়,
সেই সূর্যের যা উদিত হয় নি, আর সেই তারকার যা লুকায়িত হয়নি।[৩২৭]

এর উত্তরে ইবন যায়দুন বলেন:

إن غبت لم ألق إنسانا يؤانسني و إن حضرت فكل الناس قد حضروا

অর্থ: যদি তুমি বোকামি করো, আমি মানুষকে অর্পণ করিনি, যা আমাকে খুশি করবে
আর যদি উপস্থিত হও, তাহলে সব মানুষই উপস্থিত হবে।[৩২৮]

কবি ইবন আবদুস ও ওয়াল্লাদাকে পছন্দ করতেন। তিনিও ইবন যায়দুনের ন্যায় একাধারে কবি ও উযীর ছিলেন। ইবন আবদুস ও ওয়াল্লাদার এই সম্পর্কের কথা জানতে পেরে ইবন যায়দুন রাগান্বিত হন।

[৩২৬] প্রাগুক্ত, পৃ:১১৫
[৩২৭] প্রাগুক্ত, পৃ:১১৫
[৩২৮] প্রাগুক্ত, পৃ:১১৫

একবার তিনি ওয়াল্লাদার ভাষায় ইবন আবদুসের কাছে তাঁর নামে নিন্দাজ্ঞাপক পত্র প্রেরণ করেন। ইবন আবদুস এটা বুঝতে পারেন এবং তাঁকে শাস্তি দেয়ার জন্যে বনু জুহুরের শরণাপন্ন হন। তাঁকে বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত করে কারাদন্ড প্রদান করা হয়।[৩২৯]

তবে এসময় ওয়াল্লাদা ইবন যায়দুনের পাশে দাঁড়াননি। বরং তিনি তাঁকে নিয়ে নিন্দামূলক কবিতা রচনা করেন এবং তাঁকে"**مسدس**" নামে অভিহিত করেন। এ কবিতায় তিনি বলেন:

و لُقبتُ المسدس و هو نعت تفارقك الحياة ولا يفارق

অর্থ: আর মুসাদ্দাস উপাধি দেয়া হয়েছে, আর তা এমন বিশেষণ
যা তোমাকে জীবন থেকে আলাদা করেছে, অথচ তা আলাদা হয় না।[৩৩০]

ওয়াল্লাদার বেশিরভাগ কবিতাই ছিল ইবন যায়দুন ও ইবন আবদুসকে নিয়ে। এদের দুইজনকে নিয়ে কখনো তিনি প্রণয়মূলক কবিতা রচনা করেছেন, কখনো নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন। কখনো তিনি তাঁর কবিতার মাধ্যমে একজনকে আরেকজনের বিরূদ্ধে ক্রোধান্বিত করেছেন। কখনো কবিতায় তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও ব্যক্ত করেছেন।

এছাড়াও নিজের ব্যাপারে তাঁকে গৌরবগাঁথা রচনা করতে দেখা যায়। এক কবিতায় তিনি নিজের ব্যাপারে বলেন:

إني و ان نظر الانام لبهجتي كظباء مكة صيدُهن حرام
يُحسبن من لين الكلام فواحشا ويصدهن عن الخنا الإسلام

অর্থ: আমি ও সৃষ্টিকূল যদি আমার সৌন্দর্যকে দেখে
সেই মক্কার হরিণীর ন্যায় যাদের শিকার নিষিদ্ধ।
তারা গণ্য করে কথার কোমলতাকে অশ্লীলতা হিসেবে
এবং ইসলাম তাদের নাকি সুরে কথা থেকে বিরত রাখে। [৩৩১]

[৩২৯] প্রাগুক্ত, পৃ:১১৮
[৩৩০] প্রাগুক্ত, পৃ:১১৯
[৩৩১] আহমদ খলীল জামআ, *নিসাউ মিনাল আনদালুস*,(বৈরুত: আল ইয়ামামা লিত তিবা'আত ওয়ান নাশর ওয়াত তাওযী', ২০০১) পৃ: ৪৮৮

ওয়াল্লাদার কাব্য প্রতিভার বিষয়ে একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক মন্তব্য করেন:

"Wallahdah, unmarried and living to a great age excelled them all with her poetry, her reunions, her patronage of literature and art, while the historians of her day filled their works with anecdotes of her beauty and talent."[৩৩২]

"ওয়াল্লাদা, অবিবাহিতা এবং শ্রেষ্ঠ যুগে বসবাসকারী, তিনি তাঁর কবিতা, মজলিস, সাহিত্য ও কলার প্রতি অনুরাগ মিলে সবাইকে অতিক্রম করেছিলেন, এমনকি তাঁর সময়ের ইতিহাসবেত্তারা তাঁর সৌন্দর্য ও মেধা দ্বারা তাঁদের কাজ পূর্ণ করেছেন।"

[৩৩২] Sybil Fitzgerald, *In the track of Moors,* (London), pp. 113

একাদশ পরিচ্ছেদ

হাফসা বিনতুল হাজ আর-রুকুনীয়া

হাফসা বিনতুল হাজ আর রুকুনীয়া ছিলেন আনদালুসের এক প্রখ্যাত মহিলা কবি। তাঁকে সংক্ষেপে হাফসা আর রুকুনীয়া নামে অভিহিত করা হত। তাঁর জন্ম সাল নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে বলা হয়, তিনি ৫৩০ হিজরী মোতাবেক ১১৩৫ খ্রিষ্টাব্দের দিকে জন্মগ্রহণ করেন।[৩৩৩] শৈশবে তিনি তাঁর পিতার তত্বাবধানে শিক্ষালাভ শুরু করেন।

ছোটবেলা থেকেই তিনি জ্ঞান- বিজ্ঞান, সাহিত্য চর্চার পরিপূর্ণ সুযোগ- সুবিধা ও প্রাচুর্যের মধ্যে লালিত পালিত হন। এর ফলে সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মে এবং পরিণত বয়সে তিনি সাহিত্যের জগতে প্রখ্যাত কবিদের একজন হয়ে ওঠেন।

তাঁর জ্ঞান- গরিমা ও কাব্য প্রতিভার কথা যখন সমগ্র আনদালুসে ছড়িয়ে পড়ে এবং রাজ দরবার পর্যন্ত পৌঁছায় তখন আমীর আব্দুল মু'মিন তাঁকে রাজ দরবারের মহিলাদের জন্যে শিক্ষিকা ও সাহিত্যিক হিসেবে নিয়োগ দেন।[৩৩৪]

পরিণত বয়সে তিনি যখন কবিতা চর্চ শুরু করেন তখন আরেক উদীয়মান সাহিত্যিক আহমদ ইবন আব্দুল মালেক ইবন সাঈদের সাথে পরিচিত হন। তিনি সবার মাঝে আবু জাফর নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁদের দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তাঁরা পারস্পারিক কবিতা লিখতে শুরু করেন। তাঁর প্রণয়ে তিনি কবিতা রচনা করেন:

أزورُكَ أم تزورُ فإنّ قلبي إلى ما تشتهي أبدا ما يميل
و قد أُمِّنْتَ أن تظمى و تضحى إذا وافى إلىّ بك القَبول
فَعجِّلْ بالجواب فما جميلُ أناتُك عن بُثينة يا جميلُ

অর্থ: আমি তোমার সাথে সাক্ষাত করেছি, তুমি সাক্ষাত করো নি, ফলে আমার অন্তর
চিরস্থায়ী ভাবে যে দিকে আকৃষ্ট সে দিকে ঝুঁকেছে।
তুমি আশা করেছিলে আকাঙ্খা ও ত্যাগের,
যখন আমার দিকে গ্রহণ পূর্ণ করেছিলে।
ফলে দ্রুত উত্তর দাও, সুন্দর নয়

[৩৩৩] আত ত্বাহের মাক্কী, *দিরাসাতু আনদালুসীয়া ফিল আদাব ওয়াত তারীখ ওয়াল ফালসাফাহ*, (কায়রো, দারুল মা'আরিফ, ১৯৮৭), পৃ. ৮১
[৩৩৪] Zar Nigar,*The role of Woman in Arabic poetry of Andalucia,* Under Prof. Kafeel Ahmad Kasmi, Department of Arabic, Aligarh Muslim University, India, 2011, pp: 325

তোমার ধৈর্য, বুছায়না থেকে, হে জামীল। [৩৩৫]

একবার ইবন সাঈদ হাফসার সাথে তাঁর সাক্ষাতের কথা স্মরণ করে এক কবিতা লিখে প্রেরণ করেন। এতে বলেন:

رعى الله ليلا لم يرح بمذمم عشية و ارانا **بحور مؤمل**
و غرّد قمري على الدوح انثنى قضيب من الريحان من فوق جدول

অর্থ: আল্লাহ রাতের তত্ত্বাবধায়ক, সন্ধ্যার নিন্দা চলে যায়নি,
আর আমাদেরকে দেখিয়েছে আশায় পূর্ণ সাগর।
আর চাঁদ ডাল-পালার উপর দিয়ে গান গেয়েছে
নদীর উপরে সুগন্ধি গুল্মের ডাল ঝুঁকে পড়েছে ।

হাফসা এর উত্তরে বলেন:

لعمرك ما سرّ الرياض بوصلنا و لكنه ابدى لنا الغلّ و الحسد
ولا صفق النهر ارتياحا لقربنا و لا غرد القمري إلا لما وجد

অর্থ: আপনার জীবনের শপথ, আমাদের উপস্থিতিতে বাগান গোপন করেনি
তবে আমাদের হিংসা ও বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে।
আর আমাদের নৈকট্যে নদী খুশিতে হাত তালি দেয় নি
আর চাঁদও যা পেয়েছে তাতে গান গায় নি।[৩৩৬]

হাফসা ও ইবন সাঈদের মধ্যেকার প্রণয়ের বিষয়টি ওয়াল্লাদা ও ইবন যায়দুনের মত ছিল। ইবন যায়দুন ও ওয়াল্লাদার মধ্যে যেমন ইবন আব্দুস বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, একই ভাবে হাফসা ও ইবন সাঈদের মধ্যে উছমান ইবন আব্দুল মু'মিন ইবন আলী বাধা হয়ে দাঁড়ান। তিনি মুওয়াহিদীনদের আমীর ছিলেন। ইবন যায়দুনকে ইবন আব্দুস কারাদন্ড প্রদান করান, কিন্তু ইবন সাঈদকে তাঁর প্রণয়ের জন্যে আমীরের হাতে নিহত হতে হয়।

এ কারণে হাফসাকে ওয়াল্লাদার সাথে তুলনা করা হয়। এছাড়াও এ তুলনার আরো একটি কারণ যা ছিল সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে উভয়েরই অগাধ পান্ডিত্য ও দূরদর্শিতা।

[৩৩৫] আবুল হাসান আলী ইবন মূসা ইবন সাঈদ আল মাগরিবী, *আল মাগরিব ফী হালাল মাগরিব*, (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৫৫),৫ম খন্ড, পৃ: ৩৬৮
[৩৩৬] মুহাম্মদ হাসান ক্বাজ্জার, *মাহাত্তাতু আনদালুসিয়্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ:২০২

খলিফা উছমান ইবন আব্দুল মু'মিন ইবন আলীর সমীপেও তিনি কবিতা রচনা করেন। তবে এসব কবিতা ছিল শুধুই প্রশংসামূলক। একবার এক কবিতায় তিনি বলেন:

يا سيد الناس يا من يُؤَمِّل الناس رفدَه
أمْنِنْ علىّ بِطِرسٍ يكون للدهر عُدّه
تخطّ يُمناك فيه "الحمد لله وحده"

অর্থ: হে মানুষের নেতা, হে মানুষের সাহায্যের আশাদাতা,
আমাকে স্মরণ করিয়ে দিন সে কাগজের দ্বারা, যা যুগের জন্যে গণ্য হয়।
আপনার ডান হাত তাতে লিখেছে: "প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর"।[৩৩৭]

হাফসার সাথে প্রণয়ের কারণে ইবন সাঈদকে আমীর উছমান হত্যা করেন। তাঁর মৃত্যুতে শোকাগ্রস্ত হয়ে হাফসা শোকগাঁথাও রচনা করেন। তবে আমীরের ভয়ে সে কবিতাগুলো খুব একটা প্রচলিত হয়নি। তবে মাকার্‌রী তাঁর কিছু কবিতা তুলে ধরেছেন।

আনদালুসের এই স্বনামধন্য মহিলা কবি ৫৮৬ হিজরীতে মারাকেশে মৃত্যুবরণ করেন।

[৩৩৭] আল মাক্কাররী, *নাফহুত ত্বীব*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১

উপসংহার

মুসলিম স্পেন তথা আনদালুস ছিল মুসলিম ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের নাম। সভ্যতার চরম উৎকর্ষের অন্যতম এক উদাহরণ ছিল আনদালুস। তারিক বিন যিয়াদের নেতৃত্বে সংঘটিত বিজয়ের মাধ্যমে যে সোনালী দিগন্তের উন্মোচন হয়েছিল সেখানে তা প্রায় দীর্ঘ ৮০০ বছর স্থায়ী ছিল। এসময়কাল যেমন ছিল ইসলামের, মুসলিম রাজত্বের স্বর্ণযুগ, তেমনি একইভাবে শিল্প- সাহিত্যেরও স্বর্ণযুগ।

আনদালুসে যখন মুসলিম শাসনের যাত্রা শুরু হয় তখন প্রাচ্য আব্বাসী যুগের অধীনে। সাহিত্যের চরম উৎকর্ষতা সেখানে বিরাজমান। আনদালুসের সবকিছুই শুরুতে প্রাচ্যের অনুকরণে হওয়ায় সাহিত্য চর্চাতে তাদের প্রভাবই সর্বাগ্রে পতিত হয়। এমনকি অনেক কবি, সহিত্যিক, গায়কের প্রাচ্য থেকে আনদালুসে আগমন ঘটে। প্রাচ্যের অনেক মূল্যবান আরবী সাহিত্যের গ্রন্থাবলীও আনদালুসের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত হতে থাকে। ব্যাপক হারে সেখানে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা শুরু হয়।

আরবী সাহিত্যের অন্যান্য গতানুগতিক ধারার ন্যায় আনদালুসেও বক্তৃতা, পত্র সাহিত্য, মাকামা, প্রণয় কাব্য, শোকগাঁথা, প্রশংসাগাঁথা, নিন্দামূলক কাব্য, বর্ণনামূলক কাব্যের ধারা সূচিত হয়। এরই পাশাপাশি আনদালুসের কবিগণ তাঁদের নিজস্ব স্টাইলের কবিতাও আবিষ্কার করেন। এ নিজস্ব স্টাইল ছিল আল মুওয়াশশাহাত নামে পরিচিত এক বিশেষ ধরণের গীতিকবিতা।

আনদালুসের আরবী সাহিত্যের যাত্রায় যারা অবদান রাখেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইবন হানী, ইবনু আব্দি রাব্বিহ, ইবনু যায়দুন, লিসানুদ্দীন ইবনুল খতীব প্রমুখ। আনদালুসের নারীরাও সাহিত্যে প্রভূত অবদান রাখার ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকেন নি। এসমস্ত মহিলা কবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ওয়াল্লাদা বিনতুল মুসতাকফী, আল জারিয়া আল আজফা, হাসানা, হাফসা রুকুনীয়া প্রমুখ।

আনদালুসীয় সাহিত্য আরবী সাহিত্যের ভান্ডারে এক বিশাল সমাহার সংযোজন করেছে। ইবনু আব্দি রাব্বিহর "আল ইকদুল ফরীদ", ইবনু শহীদের" আত তাওয়াবে' ওয়ায যাওয়াবে' ", প্রভৃতি আরবী সাহিত্যের অমূল্য রত্ন।

আরবরা শুধু আনদালুসে মুসলিম শাসন কায়েম ও আরবী সাহিত্যের যাত্রাই সূচনা করেনি, বরং সমগ্র ইউরোপেই এর প্রভাব ব্যাপক হারে পতিত হয়। যখন আনদালুসে মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন ও

সভ্যতার চরম উৎকর্ষতা সাধিত হয় তখন সমগ্র ইউরোপ ছিল অজ্ঞতার তমসায় আচ্ছন্ন। তারা পার্শ্ববর্তী দেশ আনদালুসকে দেখে মুসলিম সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট ও প্রভাবিত হয়। তারা আরবী সাহিত্যের গ্রন্থগুলো সংগ্রহ, অনুবাদ ও সংরক্ষণের কাজ শুরু করে এবং একই সাথে জ্ঞান চর্চাও শুরু করে। তারা শুধু গ্রন্থ সংগ্রহ ও জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে নিজেদের আলোকিত করার কাজেই বসে থাকেনি, আরব ও আনদালুসের অনুকরণে সাহিত্য চর্চাও শুরু করে। আরবী সাহিত্যের প্রভাব তাদের অনেক মৌলিক সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়।

আরবী সাহিত্য এভাবে প্রাচ্য থেকে সুদূর আনদালুস সহ সমগ্র ইউরোপে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। এবং এক বিশাল মুসলিম সভ্যতার চরম উৎকর্ষতা সাধিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জীঃ

১. আল কুরআনুল কারীম
২. আল মাক্বার্‌রী : *নাফহুত ত্বীব মিন গুসনিল আনদালুস আর রতীব*, বৈরুতঃ দারু সাদির, ১৯৬৪ ১ম খন্ড,
৩. *ক্বামূসুল মা'আনী*
৪. দুযী, রাইনহার্ট (অনুবাদঃ হাসান হাবশী), *আল মুসলিমুনা ফী আসবানিয়া*, কায়রোঃ আল হাইআতুল মিসরিয়্যাতুল 'আম্মাতু লিল কিতাব, ১৯৯৪, ১ম খন্ড
৫. ড. আহমদ হাইকাল, *আল আদাবুল আনদালুসী মিনাল ফাতহি ইলা সুকূত্বিল খিলাফাহ* ,কায়রোঃ দারুল মা'আরেফ, ১৯৮৫ খ্রি.
৬. ড. শাওক্বী দ্বাইফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী 'আসরুদ দাওলাতি ওয়াল ইমারাত*, কায়রো :দারুল মা'আরিফ, ১৯৬০, ৮ম খন্ড
৯.ড. আব্দুল কাদির বুবায়া (সম্পাদনা), *তারীখু আনদালুস*, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ২০০৭
১০.ডোজি, *স্প্যানিস ইসলাম* , লন্ডনঃ ১৯১৩,
১১.ইমাম উদ্দিন, এস, এম, *পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অফ মুসলিম স্পেন* ঢাকাঃ ১৯৬৯
১২. হিট্টি, পি.কে. *হিস্ট্রি অব দ্যা অ্যারাবস*, নিউইয়র্কঃ ম্যাকমিলান
১৩.ড. রাগেব আস সিরজানী, *কিস্‌সাতুল আনদালুস মিনাল ফাতহি ইলাস সুকূত*, কায়রো : মুআস্‌সাসাতু ইকরা, ২০১১
১৪.শেরওয়ানী এইচ কে, *মুসলিম কলোনিস ইন ফ্রান্স, নর্দান ইটালী এন্ড সুইজারল্যান্ড* (ই, অনু.), লাহোরঃ ১৯৬৪
১৫.ইবনুল ফারদী, *তারীখু উলামাইল আনদালুস*, কায়রোঃ মাকতাবাতুল খানিজী, ১৯৮৮
১৬.মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আনদালুস*, কায়রোঃ মাকতাবাতুল খানিজী, ১৯৯৭, ২য় খন্ড
১৭.ইবন উযারী, *আল বায়ানুল মাগরিব*, বৈরুতঃ দারুস ছাক্বাফা, ১৯৮৩, ২য় খন্ড
১৮.ইবন খালদুন, *তারীখু ইবন খালদুন*, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৯৮৮, ৪র্থ খন্ড
১৯.নজরুল ইসলাম, *ইতিহাস বিখ্যাত মুসলিম বীরগণ*, ঢাকাঃ মদীনা পাবলিকেশন্স, ২০০০
২০. ইবনুল উযারী, *আল বায়ানুল মাগরিব*, বৈরুতঃ দারুস ছাক্বাফা, ১৯৮৩, ৩য় খন্ড,
২১.লিসানুদ্দীন ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, বৈরুতঃ দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১৯৫৬
২২.ইমাম উদ্দিন, এস. এম. *সাম অ্যাসপেক্ট অব দ্যা সোশিও ইকোনমিক এন্ড কালচারাল হিস্ট্রি অব মুসলিম স্পেন ৭১১-১৪৯২*, লেইডেনঃ ই. জে. ব্রিল, ১৯৬৫
২৩.আমীর আলী, সৈয়দ, *শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিনস*, নিউ ইয়র্কঃ দ্যা ম্যাকমিলান এন্ড কো., ১৯৬৯

২৪.ড. মুহাম্মদ আব্দুল মুন'ইম খাফাজী, *আল আদাবুল আনদলুসী তাতাউর ওয়া তাজদীদ*, বৈরুত: দারুল জীল, ১৯৯২
২৫.হান্না আল ফাখুরী, *তারীখুল আদাবিল আরব*, বৈরুত: দারুল জীল, ১৯৮৬
২৬.ড. ইহসান আব্বাস, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী আসরু সিয়াদাতি কুরতুবা*, বৈরুত: দারুস সাকাফা, ১৯৬৯
২৭. বাশারি ইবরাহীম ও ড. ফিরুজ মুসা, *আছরুল কুরআনিল কারীম ফী আদাবি ইবন যায়দুন*, মাজাল্লাতু জামেআতুল বা'ছ, খন্ড-৩৮, ২২ সংখ্যা, ২০১৬
২৮. ইবন যায়দুন, *দিওয়ানু ইবন যায়দুন*, কায়রো: দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১৯৯৪
২৯.ড: আহমদ ফাওযী আল হীব , *আল আনদালুসী: ইবন জাবের মুহাম্মদ ইবন আহমদ আদ দ্বরীর, শি'রুহু*, দামেশক: দারু সা'দুদ দ্বীন, ২০০৭
৩০. ইবন মানজুর, *লিসানুল আরব*, দারুল মাআ'রিফ, ১ম খন্ড
৩১.রিশা আব্দুল্লাহ আল খতীব ও ড. সালাহ মুহাম্মদ জার্‌রার, *আল আদাবুল আনদালুসী ফিদ দিরাসাতিল ইসতিশরাক্বিয়াতিল ব্রিতানিয়্যা*, জর্ডান: জামেয়াতুল উরদুনিয়া, কুল্লিয়াতুদ দিরাসাতিল উলয়া, ২০০৯
৩২.খাইরা শারিফী,*আত তারজামাতু ফিল আনদালুস ওয়া আছরুহা আলাল হিযারাতিল উরুব্বিয়্যাহ (৫০০ হি- ৯০০ হি)*, আলজেরিয়া: জামেআতুত ত্বাহের মাওলাই সাইদাহ
৩৩.ইনখাইল বালানছিয়া, অনুবাদ: হাসান মুনিস, *তারীখুল ফিকরিল আনদালুসি*, পোর্ট সাইদ: মাকতাবাতুস সাকাফাতিদ দ্বীনিয়্যা
৩৪.মুহাম্মদ রজব, *আল আদাবুল আনদালুসী বাইনাত তাআছ্ছুর ওয়াত তাছির*, আল মামলাকাতুল আরাবিয়্যাতুস সাউদিয়্যাহ: ইদারাতুছ ছাক্বাফা ওয়ান নাছর, ১৯৮০
৩৫.আব্দুল আযীয মুহাম্মদ ঈসা, *আল আদাবুল আরাবী ফিল আনদালুস*, কায়রো: মাতবাআতুল ইসতিকামা, ১৯৩৬
৩৬. ড. মুহাম্মদ রিদওয়ান আদ দায়িয়্যা, *ফিল আদাবিল আনদালুসিয়া*, দামেস্ক: দারুল ফিকর, ২০০০
৩৭.আহমদ ইবন ইদরীস আল কারাফী শিহাবুদ্দীন, *আয যাখীরা*, তিউনিসিয়া: দারুল গারবুল ইসলামী , ২য় খন্ড
৩৮.আল মাক্বার্‌রী, *নাফহুত ত্বীব মিন গুসনিল আনদালুস আর রতীব*, বৈরুত: দারু সাদির, ৩য় খন্ড
৩৯.ইবন হাইয়ান, *আল মুকতাবিস*, বৈরুত
৪০.আব্দুল মওদুদ, *মুসলিম মনীষা*, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৮০
৪১.রাহমা ইমরান, *বাওয়া'ইছু শি'রুত ত্বি'আতি ফিল আনদালুস ওয়া খাসাইসুহুল হাম্মা*, পাকিস্তান জার্নাল অব ইসলামিক রিসার্চ, সংখ্যা:১৫, ২০১৫
৪২.মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন 'আব্দিল মালিক আল আনসারী আল মারক্বেশী,*আয যাইলু ওয়াত তাকমিলাহ লি কিতাবিল মাওসুল ওয়াস সিলাহ*, তিউনিসিয়া: দারুল গারবুল ইসলামী, ২০১২, ৫/১
৪৩. ইবন আব্দি রাব্বিহ, *দিওয়ানু ইবন আব্দি রাব্বিহ* (তৃতীয় মুদ্রন), দামেস্ক: দারুল ফিকর
৪৪.ফাওযী ঈসা, *আশশি'রুল আনদালুসী ফী আসরিল মুওয়াহিদীন*, আলেকজান্দ্রিয়া: দারুল ওফা, ২০৭
৪৫.আল মাক্বাররী,*নাফহুত ত্বীব মিন গুসনিল আনদালুস আর রতীব*, বৈরুত: দারু সাদির ৪র্থ খন্ড
৪৬. আবুল ফাদল জামালুদ্দীন ইবন মানজুর, *লিসানুল আরব*, বৈরুত: দারু সাদির
৪৭.বুতরুস বুসতানী, *উদাবাউল আরাব ফিল আনদালুস ওয়া 'আসরিল ইনবিআস*, দারু নাজীর আবুদ

৪৮. ইবনু হানী, *দিওয়ানু ইবন হানী*
৪৯.শাওকী দ্বাইফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী 'আসরুদ দুওয়ালি ওয়াল ইমারাতিল আনদালুস* ,কায়রো :দারুল মা'আরিফ, ১৯৬০, ৮ম খন্ড
৫০.জুরজী যাইদান, *তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যা*,৩য় খন্ড, মিসর: দারুল হিলাল
৫১.ড.মুস্তফা আশ শাকআ', *আল আদাবুল আনদালুসী*, দারুল ইলম লিল মালায়িন
৫২.মুহাম্মদ হাসান ক্বাজ্জার, *মাহাত্তাতু আনদালুসিয়্যা*, দারু সাউদিয়া লিন নাশর ওয়াত তাওযী', জেদ্দা, ১৯৮৫ খ্রি.
৫৩.আহমদ খলীল জামআ, *নিসাউ মিনাল আনদালুস*,
৫৪.আত ত্বাহের মাক্কী, দিরাসাতু আনদালুসীয়া ফিল আদাব ওয়াত তারীখ ওয়াল ফালসাফাহ,
৫৫.আল মাগরিব ফী হালাল মাগরিব, ৫ম খন্ড,
৫৬.www.wikipedia.com
৫৭.Aguado Bleye, *Historia de Espana,*
৫৮.Levi Provoncal, *Espana mueulmana*
৫৯. *"Spain"*. Encarta Online Encyclopedia. 2007. Archived from *the original* on 2009-10-31
60. *"Spain - History - Pre-Roman Spain - Prehistory"*. Britannica Online Encyclopedia. 2008
৬১.*Ibn Taghribirdi*, p. 278 of French translation, and *Ibn Khallikan*, vol. 3 p. 476 of English translation
৬২. *Ibn Khallikan*, vol. 3 p. 81 of English translation
৬৩.Auchterlonie, Paul, *Collections in British Libraries on Middle Eastern and Islamic Studies.* (Ed.) (1981)
৬৪. Sybil Fitzgerald, *In the track of Moors*, London
৬৫. Zar Nigar,*The role of Woman in Arabic poetry of Andalucia, ,* Under Prof. Kafeel Ahmad Kasmi, Department of Arabic, Aligarh Muslim University, India, 2011
৬৬. http://islamstory.com/detailes.php?module=artical&slug-تاريخ-النثر-في-بلاد=الاندلس